সারেং মিঞা

বুদ্ধদেব গুহ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

জামশেদপুরের নীলডির

কল্যাণী দাশগুপ্ত কল্যাণীয়াসু

এবং

ডাঃ গৌতম দাশগুপ্ত কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের

যুযুধান

শালডুংরি

নগ্ননির্জন বাতিঘর

ভুমিকা

এ বছরের পূজো সংখ্যায় 'নবকল্লোল'এ 'সারেং মিঞা' শীর্ষক একটি বড় গল্প লিখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, পরে ঐ বীজ থেকে একটি উপন্যাস লিখব। কিন্তু বীজ হিসেবে ব্যবহার না করে ঐ বড় গল্পটির বিস্তৃতি ঘটিয়েই 'সারেং মিঞা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে, বিশেষ করে উপন্যাসের মাঝামাঝি থেকে, আমার নিজেরই যথেষ্ট অসন্তুষ্টি এবং সংশয় আছে। অনেক জায়গাতে গুরুচণ্ডালি দোষও ঘটেছে যে, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে লিখে দিতে হওয়ার কারণে এই ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেল। ছাপার ভুলও রয়ে গেল অগণ্য। পরের সংস্করণে এই সব বাবদে কিছু মেরামতির অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ভাষার জন্যে উপন্যাসের রস গ্রহণেও হয়ত বিঘ্ন দেখা দেবে এমন ভয়ও যে আমার নেই, তা নয়।

এ বিষয়ে আপনাদের মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশকের প্রযত্নে আমাকে জানালে, বাধিত হব।

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে ষাটের দশকের শেষ অবধি প্রতি বছরই সুন্দরবনে গেছি একাধিকবার। এবং গেছি, একেবারে গভীরতম বনে, 'মায়াদ্বীপে', সমুদ্রর মোহানাতে। 'সারেং মিঞা' আমার দেখা; সেই সময়কার সুন্দরবনের পটভূমিতেই লেখা।

'সারেং মিঞা'ব প্রস্তুতিতে প্রকৃত গুণী ও গবেষক শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মশায়ের 'বাংলার লৌকিক দেবতা' বইটির সাহায্য নিয়েছি। এবং সেই ঋণ অবশ্যই স্বীকার্য। আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে তা স্বীকারও করছি।

শ্রদ্ধেয় শিবশঙ্কর মিত্র'র কিছু লেখা আমার বহুবার পড়া। শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুল জব্বর সাহেবের 'বাংলার চালচিত্র' বইটিও আমাকে মুগ্ধ করেছে। অবচেতনে 'সারেং মিঞা' লেখার সময়ে তাঁদের লেখার কিছু প্রভাবও হয়ত পড়েছে আমার উপরে। তাঁদের কাছেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অগ্রিম জানিয়ে রাখছি। বিনত

ইতি

বুদ্ধদেব গুহ

হোই দূবে দেখা যেতেচে নিজেদের বিতিচি গেরাম।

এমন নাম কী কইরে হলো কে জানে। হয়তো "বিতিকিচ্ছিরি" থেকেই হইয়েচে।

গবমের দুপুরে বিলের মধ্যি মস্ত সবজে-কালো কুমীরের মতো শুয়ে আচে গ্রামটা। আম জাম কঁ্যাটাল লিচু সজনে হিজল আর সাঁই-বাবলার ছায়া বুকে কইরে। আর বিলেব মধ্যে যে এট্টু ট্যাঁক মতো, যার মদ্দি মাঝে মাঝে উচকপালি এট্টা মদনটাকি পাকি বসে বসে ঢং করে. সেটি হতিচি গাজী পীরের দরগা। ইয়া বড় বড় গাছ। বট, অশথ, নোনা, কালোজাম, কনকচাঁপা, গাব, কঁ্যাটাল, লিচু ; নেই কি তাতে—! আব তারই কোণে কোণে আছে বেতবন। চিতেরাই বলে, বেতবন। পঞ্চাকাকা দু' পাতা সংস্কৃত পড়িচে বলেই বলে, "বেতস্"। আসলে, বেত না ছাই! বেতের মতো। এ অঞ্চলে আসল বেত তিব্‌সীমানায় লাই।

এই ড্যাঙ্গাতেই ঘোর বর্ষাতে কেয়াগাছগুলোতে ফুল আসে। আরে শালা! কী গন্ধ! কী গন্ধ! চিতের মনে হয়, ঘুমিয়েই পড়ে। কিন্তু ঘুমোয়ই বা কোন্ সাহসে! কেয়াবনে যে সাপের আড্ডা! জুম্মা চুম্মা।

অপু, যার ভালো নাম অপূর্ব, সে বললো, ঢাল্ না নিতে এট্টু। পরাণ যে শুকিয়ে এলো বাপ।

ঢালতিচি, ঢালতিচি। অমন সিংগি মাছের মতো কাঁটা মারো কেন বলো তো দিকি সব সময়ে?

নিতে, হাঁড়ি থেকে কলাই-করা গেলাসে, বেলা বেড়ে যাওয়াতে এখন এট্টু হলদেটে-লালচে মেরে-যাওয়া খেজুড়ের তাড়ি ঢালতে ঢালতে বিরক্তির গলাতে বললো।

অপুর জন্ম পঞ্চাশের মাঝামাঝি। তখন সত্যজিৎ রায় মশায়ের "পথের পাঁচালি" ছবিটো সবে এইয়েচে। ভেড়ির মালিক সুধাকান্ত নস্করের ছেইলে ধনুবাবু এট্টু "আর্ট-কেল্‌চার" করতেন। তিনি নেপঁতি অর্থাৎ নেপোকে গিয়ে বললেন, "লাইপে এমন পিকচার কক্কনো দেখিসনি নেপো। আমার সঙ্গে চ বসুশ্রীতে। জীবন সার্থক হবেক।"

নেপো তখন মনোযোগ সহকারে বাবুদের ভেড়ির দাওয়াতে বইস্যে লালু কুকুরের আটালি মারতেচিলো। সে কুকুরের কুঁই-কুঁই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুঁই-কুঁই করে বললো, সিটা কী সামোগ্‌গিরি ধনুবাবু? বসুস্‌সিরি?

ফুঃ শালা। বসুশ্রী সিনেমা হল। সাউথ কেলকাটাতেই তো। চল, সিকেনেই সত্যজিৎ রায়েব "পথের প্যাঁচালি" চলতিচে। সকলেই বলতিচে বটে, ওটা না দেকলি দশটা গাঁযেব লোকে বেবাক আনকেল-চার ভাইববে। টিকিট একটা বেশি আছে, যাবি তো চল্‌। তোর চোদ্দ পুরুষ উদ্দার হইয়ে যাবে'খন ঐ একটি পিকচার তুই দেখলি'।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, যেন তার কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইয়েচে, এমন কইরে বইলেচিলো নেপো, পঁয়ত্রিশটা আটালি।

সে লালুর গায়ের আটালি গুনতে গুনতে টোটাল দিতিচিলো।

তারপর বইলেচিলো, তুমি যান গো বাবু পা চালায়ে! আমার মিথ্যা-জিৎএর কারবার। কেল্‌চার কইরে একবারটি ঘুরে যাবেন বরং আমার বাড়ি, ফেরার পথে। আপনার মুখ ঠেঙে শুনে শুনেই চালিয়ে দেবো-কানে⋯⋯

কিন্তু কেল্‌চারের লোভ বড় লোভ! শেষমেষ সে লোভ সামলাতি না পেইরে আটালি মারা ছেইড়ে নেপো চইলেই গেচিলো ধনুবাবুর সাতে। 'পথের প্যাঁচালি' দেখতি।

তা সেই নেপোর সঙ্গেই যখন পুঁটির বে হলো. ঘোষেদের ভেড়ির নাইট-গার্ড নকুল বাগদীর বড় মেয়ে নার্গিস-এর সঙ্গে, নার্গিসেরই ঘরের নাম পুঁটি; আর বিয়ের ইগারো মাস না-ঘুরতি নার্গিসের বিয়োনো ছেলের খুব জম্পেস কেল্‌চার করে নাম রাখলো নেপো অপু। সে

ব্যাটার বয়স হলো এখন চৌতিশ-পঁয়তিশ।

কী করে সময় যায়। মাইরী।

কিন্তুক নাম রেখেই কেলো হয়েছে। ভগমানের নামে নাম হলে যেমন কখনো-সখনো ভগমানে ভর করে, এই ভগমানের মতো মানুষের নামে নাম রাখাতে আর্ট-কেলচার ভর কইরলেন অপুর উপরে। মাঝে মাঝেই গম্ভীর গলায় কতা বলে সে। এমন ইঞ্জিরি বলে যে, নেপোরা কেন, পেরাইমারী ইসকুলের হরিপদ গায়েন পযযন্ত বুঝতি পারে না।

চারবার ইসকুল ফাইনালে ঢেঁইড়িয়ে পাট্টির দাদা ধরে 'বিতিচি' গেরামের ইঞ্জিরির ম্যাস্টর হইয়েচে। এখন মুকে ইঞ্জিরিও ফুটোয় খুব। তবে ওরা কেউই ইঞ্জিরিটা জানে না বইলেই সিটা যে ইঞ্জিরিই বটেক, তা লিশ্চয় করি বলতি পারে না কেউই।

বেলা বাইড়তিচে। রোদের ভাপও বাইড়তিচে। বাদার জলে রোদ চিক্‌চিক্ কইরতিচে।

হোসেন মিঞা তার ডোঙা ঠেলি গুটিগুটি এইলো। দাড়িতে মেহেন্দি লাগিয়েচে কবে। মোচলমানদের কোনো তেওহার আজ কি? কে জানে? দাড়ির খুব বাহার কিন্তুক মাতার চুল পাৎলা, এই সামান্য বয়সেই। সাদা ধবধবে হাফ-হাতা গেঞ্জি চাইপেচে গায়েতে, সবুজ আর লাল চেক চেক লুঙির উপরে।

ছোঁড়াটা ভালো। তবে কেমন খ্যাপাটে আচে। কাজকম্মে এট্টুও মন লাই। একবেঁড়ে টাইপ।

ভুস্‌স্ শব্দ করি মিঞার ডোঙাটার নাক আসি পারের দলদলি আর পাতা-পুতোয় গুঁতো মেইরেই থিতু হলো। পচা জল নিজের মনে পাঁকেদের সঙ্গি বিড়বিড় কইরতে কইরতে ইদিক-উদিক দৌড়ালো। ছুটো ব্যাঙাচি লাইপ্যে উঠলো তিড়িং তিড়িং করে।

হোসেন মিঞা ডোঙা ভিড়িয়ে বললো, একটো বিড়ি দাও অপুদা।

নিতে বললো, কলসীতে তো একনও অমৃত আছে এট্টু, আর নজ্জা করা কেনে? চইল্যে আয় হোসেন। বইস্যে যা। বইস্যে যা। হইয়েই যাক ইক গেলাস।

বিড়িটা অপুর কাছ ঠেঙে নিয়ে হোসেন মিঞা বইললো, ছ্যাকো নিতেদা, এ নিয়ে রোজ রোজ ফাইজলামো করবেনি। একদিন তোমাকে ধইরে আমি এই বাদার জলে চুইব্যে দিবো। তোমারে কত্তদিন বইলেচি যে, মদ খাওয়াতে আমাদের ধম্মোর বারণ আছে।

যাঃ শালা! কত ধম্মো মানিস!

আমি বিলক্কনই মানি। তোমরাই কেউ ধম্মো মানো না। তোমরা ছেলের অসুক হলি মন্দিরে যাও, ফসল খারাপ হলি, কী বাড়িতে ডাকাতি হলি পর সত্যিনারাণের পুজো চড়াও। তোমরা আমাদের ধম্মোর তাপ-এর কথা বুঝবেনি। চার বেলা নামাজ পড়ি আমি। আমি ধম্মো মানি না, তা কি তোমরা মানো?

হিন্দুদের "ধম্মো" বলি কি দেশে কিছু আচে একন?

কে জানে! হয়তো সত্যিই বোঝে না ও।

নিতে বললো, মনে মনে।

ধম্মো কতাটার মানেটা কি? অপু বলল, স্বগতোক্তির মতো।

তারপর অপু আর নিতে তাড়ি খেতে পেড়াপিড়ি না করে হোসেন মিঞাকে বিড়ি এগিয়ে দিলো। শঙ্খ-মার্কা বিড়ি। লম্বা। খুব কড়া। কেনিং-বাসন্তী-গোসাবা মায় তামাম সোঁদরবনের মাল-এ খাল-এ ও এ-অঞ্চলে ওই বিড়ির মোকাবিলা করনেওয়ালা অন্য কোনো বিড়ি লাই।

আগুন?

রোদে-জলে পুড়ে বাদামী-রঙা হইয়ে যাওয়া ফর্সা বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে ডান পায়ের পাতাখানি চড়িয়ে দিয়ে বিড়িটা দু'ঠোঁটের ফাঁকে গুঁইজে আগুন চাইলো হোসেন মিঞা।

নিতে দেশলাই এগিয়ে দিলো।

ফক্কাস্ করে দেশলাই বাক্সেতে কাঠি মেরে জম্পেস করে বিড়িটা ধরিয়ে মিঞা বললে, এগুই। মাছ তো প্যালাম না কিছুই। ইদিকে বাড়িতে মেহমান আসিচে। এতো বেলায় খালি হাতে যাবামাত্রই তো আব্বাজান ঘাউ ঘাউ কইরে উইঠবেক। এখন মাছ গজাই কুথায় বলো তো দিকিনি।

কে ? এসেচি কোন্ মেহমান ?

সি আমার বড় বুনের মামা-শ্বশুর। বাংলাদেশ ঠেঙে এসিচে। বেশ কদিন এসিচে। সব তো মাছেরই দেশ। আব্বাজান গেইচল্লো তো গতবছর। এখনও সিখানের মাছ খাওয়ার গল্প করে। আর এমনই পোড়াকপাল আমার তার জন্যিই একগাচা মাছ আজ পেইলাম না।

অপু বললো, আমার গলুইয়ে গোদা গোদা মাগুর রইয়েছে খ্যাক্। মেহমান যখন এইয়েচে, তখন নে যা হোসেন মিঞা। আম্মীরে বইলবি, কাঁচানঙ্কা কালোজিরে দে ঝোল বাইন্যে দিতে। আমাদের বিতিচি গেরামের ইজ্জৎ তো রাখতি হইবেক। নয় কি ?

নিতের নেশা চড়ে গেচিলো। সে ওদের কথার মধ্যে ধাঁ করে বলে দিলে, হাঁ। টিক বইলেচিস সাঙাত্। কতায়ই বলে ঃ

"দোকনো মাগুরের ঝোল আর পরের মাগ্এর কোল।"

অপু বিরক্ত হয়ে নিতের দিকে চেয়ে হোসেন মিঞাকে বললো, দেইকেচো। সাঙাতের কতা শুইনলে মিঞা ? এট্টুখানি পেটে পইড়েচে কী তো হলো !

ওদেয় চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট ভালোমানুষ হোসেন নিতের কথাতে লজ্জা পেলো।

হোসেন নিজের ডোঙার গলুই খুঁজে নিজের ডিঙ্গি থেকে জল-ছ্যাচা অ্যালমুনামের সানকিটা বেইর কইর্য়ে নিয়ে অপুর ডোঙার গলুই থেকে চারটে মাগুর তুলে নিলো। সত্যিই গোদা মাগুর।

বললো, চারটেই নিলম। বাকিগুলোন্ থাক।

নিতে উত্তেজিত হয়ে বললো, কেন ? কেন ? সে কি কতা ? মেহ্-মান এয়িচি বাড়িতে। সবগুলোই নে যা মিঞা। আমার বাড়িতে ম্যাবা-রুগী তো কেউ লাই যে মাগুর তারে খেতেই হবেক। আমাদের এই বিবির বিলেও কি মাছের অভাব পইড়েচে ? তুই মাছ পাস নি তো কি হইয়েচে ? গেরামের ইজ্জত তো মিটোতে পারিনে তা বলি।

সি বুড়ো যে এইয়েচে, সে বাংলাদেশের পাবনা জিলার চলনবিল থিক্যে এইয়েচে। তাদের সে বিল নাকি সমুদ্দুরের সমান। তাতে নাকি

হাঙর-কুমীরও বাস করেন। আর মাছের কতা তো কহতব্য লয়।

অপু-নিতের ভব্যতায় অভিভূত হয়ে বললে হোসেন মিঞা।

অপু বললো, আহারে! শুনেই পেরান জুড়িয়ে গেলো গো হোসেন। তা দেখা যায় না কি একবারটি সেই পাবনা জিলার চলনবিলের চলন?

হোসেন বললো, বিলক্কন। কুটুম বইল্যে কতা। মুখ ফুইটে একবার বললিই তো হয়। গেইলে সিখেনে কত্ত আদর-যত্নই না পাওয়া যিতো। তঁবে পাসপোর্ট? পাসপোর্ট লাগবি যে। ভিসা।

অপু বললো, ছাড় তো মিঞা। ওদিক থেইকে সকলেই যেন পাস-পোর্ট ভিসা নে আসতিচে। আর যাবার সময়ই কি অন্য নিয়ম? বর্ডারে সব সাঁট আছে গো। এ পুলিসে ও পুলিসে সাঁট। জল-পুলিসে স্থল-পুলিসে সাঁট। লুঙির গ্যাঁজে হাত দিয়ে বের করে ঠেকিয়ে দেবে এক-খানি বড় পাত্তি। ব্যসস্। ভাগাভাগি করে নেবেন তেনারা। তুমি গড়িয়ে যাবে উইপারে। এক্কেরে বেলডাঙ্গার কুমড়োর মতো।

কী বুজতিচো?

হাঃ। নইলে আর বলতিচি কি? বাঙলা ভাগ তো হইয়েছে শুদু নকসাতেই গো। দেশ একই আচে।

অপু বললো, তুমরা ভাবতিচো তাই।

বেলা বাড়তে দেখে হোসেন মিঞা টেনশানে ভুগছিলো। সে তার আব্বাজান মুনসের মিঞাকে এখনও ভারী ভয় পায়। সে বুড়োর বয়স আশী হলে কী হয়? হাতের কব্জি সোঁদরবনের বাঘের মতো। ইয়া চওড়া চওড়া। এখনও দিনে চারবার ওজু করে নামাজ অদা করে। তিনবার তো বটেই। ফজিরের, জুম্মার, মগ্‌রীবের নামাজ আর ইশার নামাজ। আল্লার কিরপাতে সাইস্তো তার এমনই আচে যে একনও এক কেজি মাংস একাই সাবড়ে দেয়। দুবেলা খাবার সময়ে দুটি করে আস্ত কাঁচা পিঁয়াজ আর দু'কোয়া করে বড় এক-কোয়ার রসুন খায়।

আদি দেশ ছেলো হোসেনদেরও ঐ পাবনাতেই। এখন বাংলা-দেশ। কিন্তুক দেশ ভাগের অনেক আগেই কী পাকে-চক্করে যে ইখানে এসে থিতু হলো, কে জানে! সামসের জ্যাটায় একদিন বইলে-

চিলো আট-আটটা খুনের মামলা ঝুলতিছেলো নাকি আব্বাজানের মাতার পরে। পাবনার ফৌজদারী আদালতে। সি কারণেই তার পাইল্যে আসা। তারপর কিন্তু আর ফিরে যাওয়া হয়নি। আব্বাজান তাই একনো বাঙাল ভাষাতেই কতা কয়। মানুষটা এই বিতিচি গেরামের বা অন্য দশটা গেরামের অন্য কোনো মানুষের মতোই লয়। এ কতাটা দশ গেরামের সকলেই জানে। যাই হোক। বহুতই মেহের-বানী। আমি তালে সবকটা মাগুরই নিতেচি। পারবর দিগারের দোয়া থাকুক তুমাদের উপরে।

হোসেন মিঞা বললো।

আরে বাস্ বাস্। বাস্ করো। বন্নু্ই তো নে যাও। মেলা কতা কিসেব আর? অত দোয়া কোতা রাকবো?

গডরেজ-এর আলমারী কিনে লিও একটা।

নিতে বললো, মাতালের গলায়।

হোসেন মিঞা চলি গেলো লগি ঠেইলে ঠেইলে বিতিচি গেরামের দিকে।

অপুর নেশা চড়ে গেচিলো। উদাস চোখে সে চেয়েচিলো বিবির বিল-এর দিকে। যে-কোনো কারণেই হোক মানুষটার মধ্যে একটু আর্ট-কেল্‌চার ঢুইক্যে রইয়েচে। এমনিতে ছুপ্‌কি দিয়ে থাকে। পেটে মাল পড়লিই অন্য মানুষটা বেইর‍্যে পড়ে।

এ বিলটা মস্ত বিল। বিবির বিল। মাঝে মাঝে হোগলার মতো জঙ্গল। ওরা বলে, হোগি। একটা কোণ গিয়ে পইড়েচে মাতলাতে। সেই মাতলা বইয়ে এগুতি পারলিই গোসাবা, সজনেখালি; সোঁদরবন।

আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই তাই জলের রঙ এখন নীলচে দেখাচ্ছে। একটা কাঁক পাকি উড়ে যাচ্চে গলা লম্বা করে। এখন গ্রীষ্মকাল। তাই বিদ্দিশি পাকিরা নেই। ইখানের বারো মাসের বাসিন্দা যেনারা, তেনারাই শুধু রইয়েচেন। কোন্ বিবির বিল ছেল এ, কে জানে? বিবির নাম কেউই জানে না। তবু সেই কবে থেকে নোকে "বিবির বিল" বইলে ডেইকে আসতিচে।

জলপিপিরা রইয়েচেন। তেনাদের গোনা-গুনতি লাই কোনো। এই বিলের আরেক নাম তেনাদেরই নামে ঃ "জলপিপির জলা"। একঝাঁক বেলে হাঁস। কুড়ি-বাইশ জোড়া পানকৌড়ি। শ'খানেক বক। সাদা বক, লালচে, কালচে ; মেছো বক। ডুব-ডুবা কয়েক ঝাঁক। ডোবে আর ওটে, ওটে আর ডোবে। আর আছে বড় একঝাঁক ডোমকুর, কালো গা, সাদা ঠোঁট। এনারাও বিদিশি। কাম পাখিও থাকে সদাসব্বোদা দুশোর মতো! ডোমকুর-এর আর কাম পাখির ইঞ্জিরি নাম, ধনুবাবুর কাছেই শুনেছে অপু "কূট" আর "পিংক হেডেড মুরুহেন।" কূটেদের বুদ্ধিও ভীষণ কূট। কূট-কাচালির রাজা। হোসেন মিঞার বাবা মুনসের মিঞারই মতো কোনো একসময়ে এনারা এয়েচিলেন। কে জানে, কোন দেশ থিক্যে? এইসে আর ফিরে যাননিকো।

একন এমন দুপুরে জলের পাকিরাও মুখ হাঁ করে মাঝে মদ্দি। মৃদু কুঁই-কুঁই করে আওয়াজ উটোয়। পেটের তলার জল গরম হয়ে গেলে দলাদলি আর ঝাঁঝির মইধ্যে চলে যায় ঠ্যাং-উপুরে পোঁদ-উপুরে কইর‍্যে। ডুব দিয়ে। তারপর উটে এসে ছায়া খোঁজে, জলেরই মদ্দে।

পাখিদের যখন তিষ্টা পায়, তখন অপুরও তিষ্টা পায়। পাখিদের পিটেরই মতো হাত-পেছলানো মসৃণ, সুনসান্, মেয়েচেলের তলপেটের কথা মনে পড়ে। হরিমতির। এই বাদার পাঁকেরই মতো সোঁদা-সোঁদা গন্ধ তার শরীলে। এই উষ্ণ উদোম দুপুরেরই মতো জোলো ঝাঁঝ।

হরিমতি তার কালো জাম আর নিম-এর ছায়াঘেরা মাটির ঘরের মেঝেতে চাটাইএর উপরে চুপটি করে শুইয়ে থাকে। সেও যেন কোনো হাজা-মজা নদীরই মতো। শান্ত, স্নিগ্ধ, জোলো গন্ধ নিয়ে টান টান পইড়্যে থাকে। নড়ে না, সমুদ্রে গিয়ে পড়ার জন্যি দৌড়োদৌড়ি করে না। তার মদ্দি জোয়ারও নেই, ভাঁটাও নেই। অপু তার যেমন খুশি সাঁইতরে যায় হরিমতির সোঁতার ভেতরে ভেতরে। বাধাও দেয় না, আবার ইন্টারিস্টও দেকায় না। কোনো তাপ-উত্তাপই লাই তার। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে দ্যালের টিকটিকি ছ্যাকে। টিকটিকির লজ্জা থাকলিও থাকতি পারে, কিন্তুক হরিমতির সি-সব বালাই লাই। অপু মজা-নদীর

উপরে শেষ বিকেলের রোদের মতো স্থির হয়ে শুয়ে থাকে হরিমতির উপুরে। বাইরে স্তব্ধ শীতের দুপরে ঘুঘু ডাকে। শান্তি। আঃ, কী শান্তি।

এমন এমন দুপুরে, এমন চুটিয়ে নেশা করার পরই হরিমতির কথা বারেবার মনে পড়ে যায় অপুর। অপু বিড়িতে একটা লম্বা টান লাগিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে। যে-গান ক'বছর আগে গোসাবাতে শুনেছেলো যাত্রাতে, দুগগোপুজোর সময়ে।

সে গান নিতে এতবার শুনেচে যে তার কোনো বিকার হয় না। সে তাড়ির গ্লাস হাতে ধইর‍্যে বিবির বিলের দিকে উদাস চোখে চেইয়ে থাক্যে। ফড়িং ওড়ে লালরঙা। পেছনের গেরাম থেইকি বকনা বাছুর ডেকে ওঠে। তার মায়ে সাড়া দেয় গম্ভীর গলায় হাম্বা-আ-আ। বিবির বিলের জলের ওপর সে ডাক হাঁকু-পাঁকু দৌইড়ে যায়। হাঁস ডাকে হঠাৎ। উঁচু গলায়। তার পেছু পেছু গাঁয়ের কুত্তা ভোকে।

নির্বিকারে অপু গান গেয়ে যায় তার নিজেরই আনন্দে।

"তুমি কার বিবিগো জানিনে তা
খোলা চুলের সোঁতা,
তোমার মদ্দি আমার বুদ্ধি
বীজতলিতে পোঁতা।
কে কী বইললো আমায়
বইললো তোমায়
কেয়ার করে কে বা,
জনম জনম পার কইরে দি
কইরে ফুলের সেবা।"

অপুর সেই গান দুপুরের নিস্তরঙ্গ রোদভাসি বিল-এর রূপোর পাত-এর মতো ঝকমকে উজ্জ্বল জলের উপর দিয়ে পিছলে পিছলে চইলে যায় দূরে দূরে। চারিয়ে যায়। জল-ঘেঁষা মাদার গাছের ডালে-বসা আধ-ঘুমন্ত গরম-ক্লান্ত পানকৌড়িরা একবার গলা লম্বা করে চায়, তারপর আবার ঝিমুতে থাকে। কালো ডোমকুরদের সাদা ঠোঁটের দুদিকের ঠিক

উপরে বসানো নাকের ফুটো দিয়ে দুপুরের গরম ভাপ ঢোকে। ঠোঁট দিয়ে বারবার জল ঠোক্‌রায়। অপুর গানের টুকরো-টাক্‌রা ছিটকে-ছট্‌কে যায় লাইপ্যো-ওটা জলকণাদের সইঙ্গে। দূরে, মেছো চিল ডাকে, ঘুরে ঘুরে। অন্ধকার ঝিম্‌-মারা গরমের দুপুর সেই ডাকে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

নিতে বলে, কিরে অপু, বাড়ি যাবিনি?

বাড়িতে কি?

বলেই, মনে মনে ভাবলো, বাড়িতে ছায়া, বাড়িতে মা, বাড়িতে দাওয়া, শেতলপাটি, বাড়িতে বৌ, পান্তা, তেঁতুল জল, শুকনো লঙ্কা পোড়া, কাগজী নেবু; শান্তি।

তারপর ওর মনে পইড়ে গেলো হরিমতির কতা। সিখানেও শান্তি। অন্য শান্তি। অন্য পেকার। কিন্তু সেই শান্তির মধ্যে বড় অশান্তিও।

হরিমতি তো ভাড়াটে মেয়েচেলে। সে তো ভালো লয়ই! কিন্তুক অপুর যে কেন এমন ভালো লাগে তাকে! তার কাছে মদন জ্যাঠা, প্যালা গড়াই, ফুচুক সাপুই—সব্বাই যায়। অপু ভালো করেই জানে। তবু এতোজনকে এতো দিয়েও, এতোরকম করে দিয়েও হরিমতির মুখের হাসি কক্কনোই মেলান হয় না। তার ভালোবাসায় কুনো খামতি পড়ে না।

কিন্তুক হরিমতিকে অপু তার পুরোপুরি নিজের কইরে চায়। ইক্কেরে তার ইকার করে! সি জন্যে যা কিছু কইরবার, সবকিছু কইরতেই রেডি হয়ে আচে সে। হরিমতির কাইচে যে একবার গেইচে, তার জীবনে অন্য কোনো মেয়েচেলেকে পচন্দ হবারই লয়!

চল্‌। নে, উঠ। বাড়ি যাই!

নিতে বললো।

তুমি এগোও। আমি যেতিচি।

তাড়ির শূন্য কলসীটা ডোঙাতে উটোতে উটোতে নিতে বললো, ধমক দিয়ে, একুনি চল্‌। ইকানে সেই জোড়া-আল-কেউটের বাস। তা জানিসনি বুঝি? নেশা করে পড়েঁ ঘুমুবি, তারপর কেউটে কাটলি

সকলি আমাকেই গালমন্দি পাড়বে। ওর মদ্দি আমি লাই। আমি জাতে মাতাল কিন্তু তালে টিক।

নেশা করে একুনি ঘরে গেলি, মা যে বকবে ভীষণ।

অপু বললো, বিবেক-দংশিত হয়ে।

তোর তো মা-ই। আমার বাবাকে তো চিনিসনি। মিস্টার নেপো বাইন! আমার ভবিষ্যতের গুষ্টি নাশ কইরে ছেইড়ে দেবে। বাপটা মরে না যে কেন, কে জানে।

মইরবে, মইরবে। আলবাৎ মইরবে। তোর চিন্তে নেই কুনো। না মরি সি যাবেটা কুতা? সক্কলের বাপকেই মরতি হয়, তোর বাপকেও হবেক। ইটাই পেরকিতির লিয়ম হে। একবার জন্মিলে, মরতি হবেকই। হুঁঃ।

ডান হাতের তর্জনি নাচিয়ে বললো অপু।

মনুষ্য কবার জন্মগোরোহন করে রে শালা? জন্মান্তর-ফন্মান্তর উসব ফুটুস। ইক্‌বার। ছিরিফ একবার। ইকানে "ফির ইক্‌বার" চলে না। বুয়েচো?

নিতে বললো।

অপু ডোঙার পঁইছাতে বসে আবার গান ধরলো···

তুমি কার বিবিগো জানি না তো

খোলা চুলের সোঁতা······

॥ ২ ॥

কার কপালে যে কোথায় মৃত্যু নেকা থাকে। বাংলাদেশ ঠেঙে এলো মানুষটা। মেহমান। আর ইকানেই ইয়াকাইকাক্ শেষ হইয়ে গেলো। হটাৎ কবার ভেদবমি আর বাহ্যি, ব্যসস্।

মহম্মদ সাগিরুদ্দিন, হোসেন মিঞার বুনএর শাওহার শাকলু মিঞার মামুজান, পাবনার চলনবিলের সব শব্দ গন্ধ নিয়ে বিতিচি গেরামে এসে ফওত্ হয়ে গেলো। মামুনীজানএর সঙ্গে দেখা হলো না বলে শেষ মুহূর্তে দুঃখ কইরেচিলেন। শেষ মুহূর্তে কুরান শরীফটি আব্বাজানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের বুকের উপরে রেখে চোখ বুজলেন।

মামুজানকে কবর দেওয়া হচ্ছিলো গোরস্থানে।

সকাল থেকেই আজ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইচে। টানজিস্টারে বইলেচে ঘূর্ণিঝড় আসতিচে। শেষমেষ হয়তো প্রতিবারের মতো কার্নিক মেরে বাংলাদেশেই গিয়ে হামলে পড়বে। এইরকমই দেকচে বচপন তেকে। কিন্তু কোনোবার তো গোঁত্তা খেয়ে পড়তেও পারে দোক্নো বাঙলাতে। ঝড়, দোক্নো এলাকা না পেরিয়ে গেলে কিছুই বিশ্বেস নেই!

ঝড়-বৃষ্টিও এসে গেলো। যেন এই ঝড়ের হাত ধরাধরি করেই। কিন্তুক আইন মোতাবেক তাঁর আসতে এখনও মাস দুয়েক দেরি। এইসেচেন বটেক কিন্তু চইলেও যাবেন। ফিরে আইসবার জন্যি। আজকাল আর আবহাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। সমস্ত পিরথিবির আবহাওয়াই বদলে গেছে।

হাজী সাহেব যখন মক্কাতে জায়রাতএ গেচিলেন, তখন তাঁর সারা দুনিয়ার মানুষদের সঙ্গেই দেখা হয়েচেলো। সারা দুনিয়ার মানুষদের খাল-খরিয়াত পুছ-পাছ করে এইসেচেন তিনি। এসেই না একথা বললেন।

ঘুটঘুটিয়ার মসজিদএর ইমাম সাহেব এসেচিলেন মামুজানএর শেষের নামাজ পড়ে দেবার জইন্যে। তিনি নামাজ পড়া শেষ করার পরই কফন গোরস্থানে আনা হয়েছে। মামুজান মানুষটা খুবই রসিক ছিলেন। খাদ্য-রসিক, জীবন-রসিক। প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন,

"গুস্তাকি ম্যায় স্রিফ করুঙ্গি ইক্‌বার
যব সব পায়দল চলেঙ্গে
ম্যায় কান্ধেপর সওয়ার।"

অর্তাৎ কি না, জীবনে অপরাধ একবারই করবো, যখন সকলেই আমায় বয়ে নিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবে, আমি তখন তাঁদের কাঁধে চড়ে যাবো।

মামুজানকে হাতে হাতে ধরে নিঃশব্দে মাটিতে নামানো হলো। তারপর মাপমতো মাটি কাটা হলো। মামুজানের চাদর ঢাকা শরীর যত্ন করে ধরাধরি করে সেখানে শুইয়ে দিলো ওরা। শব-এর একটু উপরে মাটির চারধারে খাঁজ কেটে নিয়ে সেই খাঁজ-এর মধ্যে মধ্যে এমন কাঠের তক্তা সাজানো হলো যেন চৌকো একটি বাক্স। আর সেই বাক্সের মধ্যেই গোর দেওয়া হলো মামুজান মহম্মদ সাগিরুদ্দিনকে।

মনসুর মিঞা, হোসেন মিঞার আব্বাজান এগিয়ে এসে দুহাতের পাতায় অঞ্জলি ভরে মাটি নিয়ে বইলো ঃ

"মীনহ্‌ খালেক নকুম্‌
ওফিহা নায়িদোকুম্‌
বহ নোখরে জখুম তাহরতন উখ্‌রা।"

বিভিচি গেরামের হোসেনকে কেনিংএর জনস্টন সাহেব, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বইলেছিলো ইকবার যে, তোমাদের মুসলমান ধম্মোর সঙ্গে আমাদের কেরেস্টান ধম্মের এই গোর দেওয়ার ব্যাপারে খুবই মিল আচে।

যে কথাগুলি মৌলবী সাহেব আববিরিত্তি করলেন। সেই কথাগুলো মানে হলো: "তোমাকে এই মাটি থেকেই পয়দা করা হয়েছিলো, এই মাটিতেই তোমাকে সঁপে দিলাম। সেই আখরতের দিন বিচারের সময়ে, এই মাটি থেকেই তোমাকে আবার তোলা হবে।"

"আল্লা হোম্মা সল্লে আল্লাহ, সৈয়দনা মৌল না,
মহম্মদীন, ওবারিক্ ওয়াসিল্লীম্ আলেহ।"

হোসেন মিঞা যখন ছোট ছিলো তখন আম্মীজান ওকে এই কথাগুলোর মানে সহজ বাংলাতে বুঝিয়ে দিয়েছিলো। "হে খুদাতালা, হে পরবরদিগার, তুাম তোমার নবী মহম্মদ সল্ আল্লাহ বসল্লমকে তোমার অপার দয়া বর্ষণ করেছিলে। এই মৃত আত্মার প্রতিও তুমি দয়া করো।

এর পরেই "কুল" পড়া শুরু হলো। চারবার "কুল" পড়ার পর তিনবার সুরে "ফাতিহা" পড়া হলো। তারপরও ফের দ্বিতীয় "সুরা"র আলিফ লাফ্ লিম্ পড়তে লাগলেন "জায়রীন" হাজী সাহেব। চারবার আলিফ্ লাফ্ লিম্ পড়বার পরে আবার দূরদ্ পড়লেন। তার ওপর সব শেষে মামুজানের আত্মার শান্তি কামনা, "ইসালে শবাব" করে, সকলে বাড়ি ফিরে চললো!

হোসেনের ডোঙা মস্ত কালোজাম গাছটার ছায়াতে রাখা ছিলো। মামুজানকে গোর দেওয়া হয়ে গেলেও সে বাড়ি গেলো না। সকলের পেছু পেছু গিয়ে একসময়ে ডোঙায় বসে ভেসে গেলো বিলে।

এই বৃষ্টি, সে বৃষ্টি যখনই আসুক না কেন, হোসেনকে বড়ই উতলা করে। এমনিতেই তো বর্ষাকালে ওদের তেমন কাজকর্ম নেই। বরং চাষবাস যাঁরা করেন তাঁদের কাছে কিছুটা। ওর চেয়ে বড় যে দুই দাদা, ওর ছোট যে ভাই, তারাই ওসব দেখে। কিন্তু মচ্ছিমারদের কাজ শীতকালেই বেশি। তবে হোসেনের কোনো কাজ করতেই ইচ্ছে করে না। আব্বাজান কত গালমন্দ করে। করলে কী হয়। বৃষ্টি পড়লেই হয়। সে অসময়ের বৃষ্টিই হোক আর সময়ের বৃষ্টিই হোক। গত জন্মে সে বোদয় জলের মাছ বা পোকা ছেলো। জলই তার জীবন।

হোসেনের এমনিই একা একা জলে ভেসে ভেসে নিজের সঙ্গে নিজে

কথা কইতে ইচ্ছে করে। জলের সঙ্গে, জলফড়িংএর সঙ্গে, পানকৌড়ির সঙ্গে, মাথার অনেকই উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া হাওয়াতে আঁশটে-গন্ধ-ছড়ানো বিষণ্ণ একলা কাঁক-পাখির সঙ্গে।

কখনও বা হোসেন মিঞা পীরসাহেবের দরগাতে গিয়ে সুন-সান্নাটা দুপুরে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। নানা জংলী গাছ সেখানে। নানারকম শেয়াল আছে একপাল। এই দ্বীপে বড় কেউই একটা আসে না। এক সবেবরাতের সময়ে, ফতোয়া-দোয়াজদম-এর সময়ে, ঈদুজ্জোহার সময়ে আসে মানুষে। পীরসাহেবকে "ঈদী" দিয়ে যায়। প্রদীপ জ্বালে। পীরসাহেব নইলে সারা বছরই একা। ধোবীর পা'টের শ্যাওড়া গাছের পানকৌড়িটার মতো।

হোসেন তাঁর সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কত কিছু জানেন পীর-সাহেব। সেই সব শোনে হোসেন আর কত অচেনা-অজানা দেশ-বিদেশে চলে যায় মনে মনে। পীরসাহেবের কাছে উর্দুর পাঠ নেয়। কোরান্ শরীফ পড়ে।

তবে এসবও ভালো লাগে না হোসেনের। টাকা-পয়সা, হিসাব-পত্তর, খাটা-খাটনি, ধম্মো-কম্মো এসবের কিছুই লয়। কিছুই ভালো লাগে না ওর। শুধু এমনি করেই সারাজীবন ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে। জলের সঙ্গে, জলের মাছের সঙ্গে, জলের কামটের সঙ্গে, কুমীরের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্তে।

এ-অঞ্চলে হিঁদুই বেশি, তাই আরবী মাসগুলির নাম জানলেও তেমন ব্যবহার নেই মুসলমানদের মধ্যেও। তবে বাড়িতে আব্বাজান আম্মীজান এবং ফুফা খালারা যখনই আসেন যান, তখন আরবী মাস উল্লেখ করেই কথা বলেন। মহাররম্, সফর, রজব, শাবান্, রমযান, জিলক্কাদ্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আর্ট-কেলচার করা" ধনুবাবুর ব্যাটা ফনুবাবু একদিন বলেছিলেন ওকে, হোসেন, তোর নামে একজন বিখ্যাত মাঝি আছে মানিকবাবুর উপন্যাসে।

উপন্যাসটা কি চিজ? আর মানিকবাবুটোই বা কে? পেদো-পাড়ার

মুদি, মানকে কি ?

হুসস্ শালা।

ফন্নুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন হোসেনকে।

"কেলচার" বুঝতি না পাড়ায় ফন্নুবাবু বেজায় চইট্যে গিয়ে মুখ খারাপ কইর‍্যে গাল দেইচিলেন হোসেনকে। বইলেচিলেন, তোর কিস্সু হবেনি।

বইলেচিলেন, উপন্যাস মানে, নবেল। নবেল-নাটকের নামও শুনিস্‌নি ? ফুলেল তেল, সুর্মা, জরির ফিতে, তরল আলতা! কাঁচ-পোকার টিপ! ও সরি, তোরা তো আবার মোচলমান। তোদের মেয়েরা তো আলতা ব্যাভার করে না। করে নাকি ? খড়ম পরে ? নারে ?

তা সেই নোবেলের হোসেন মিঞাটি কে ? সে দেখতি কেমন ?

বিতিচি গেরামের হোসেন ওসব মেয়েচেলের পেসঙ্গ এইড়ে গিয়ে শুধিয়েচিলো।

সি আচে মানিকবাবুর নবেলে। নবেলের নাম "পদ্মা লদীর মাঝি"। আর মাঝির নাম তোর নামে। তাইলে আর বলতিচি কি ? হোসেন মিঞা। সাদা দাড়ি! সে মাঝি মাঝে-মদ্দ্যিই হাইরে যায়, চইলে যায় হোই সাগরের মদ্দিখানের এক দ্বীপে। তোর নামটিও তো সেই মিঞারই নামে, কামখানা একটু জুতসই কর্। তবে না বুঝি!

পদ্মানদীটা আবার কোনদিকে ? শুমালএ, না জুনুবএ, না মাগরীব্‌এ ?

লাও! আরে শালা! পদ্মানদী হতিচে বাংলাদেশে। এপার ওপার দেকা যায় না। তোর ঐসব শুমাল জুনুব আরবী ফারসী আমার কাচে তড়পাস না তো!

আমাদের মাতলা, গোসাবা, বিদ্যে, হেড়োভাঙ্গার মতোই কি সি নদী।

হোসেন মিঞা শুধোলো।

ছেলেমানুষ! কীই বা জানে! কোথায়ই বা গেচে!

হুসস্ শালা! কিসের সঙ্গে ইস্রে!

হবেও বা।

হোসেন মিঞা বলে মনে মনে।

নন্নুবাবু-ফন্নুবাবুদের চার পুরুষের পয়সা। তাই সকলকেই ভালো-বেসে উনারা শালা-বাঞ্চোত বলেন। তা বলতি পারেন। বইলবার হক আচে উনাদের। ও হলো গিয়ে ভালোবাসার শালা-বাঞ্চোত। কেউই মনে করে না কিছু। মানুষ উনারা ভালোই। বিপদে-আপদে সক্কলের জন্যিই করেন। শুধু যে নিজের ভেড়ির মানুষের জন্যিই তা লয়। ঐ বাদা অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের জন্যিই। কত ছেলে যে এদেরই জন্যি কলকেতায় এই বাবুদের বাড়িতে থেকে কালেজে "নেকাপড়া" শিখে "মানুষ" হইয়ে গেরাম ত্যাগ কইরেচে বরাবরের মতো তার গোনা-গুন্‌তি লাই। এদের সুকীর্তির নেকা-জোকা লাই। না, উনারা মানুষ ভালো।

তবে খচ্চর হতিছে সামন্তরা। হাড়-খচ্চর! সাপুইদের অতবড় ভেড়িটা সিরেফ মেইরে দে নিজেদের বলে চাইলে দিলে। নিঃসন্তান গজেন সাপুইয়ের উইল ছেলো যে, তার অবত্তমানে তার ভেড়িগুলো সব ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পাবে। নদে সামন্ত ছেলো ম্যানেজার। ওমা! বুড়ো যেই চোখ মুদ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে অমনি পুরো ব্যবসাটোই কব্জা করে নিলে গো। উইল ছিঁড়ে ফেলে দিলে। লজ্জা-ফজ্জাও লাই। আর আজ সেই মেরে-লেওয়া পরের ধনেরই গরম কী! বাস্‌রে বাস্। ধরাকে সরা জ্ঞান করতিচে ইকেবারে।

অপু একটা কথা বলে পেরায়ই।

"লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতে লয়।"

হোসেন মনে মনে বলে, তা সামন্তদের গায়ের চামড়াও মনিষ্যির লয়, গণ্ডারের। রাজ্যসুদ্ধু মানুষেই জানে যে, সামন্তদের ভেড়ি, গজেন সাপুইএর সম্পত্তি "মারা", অথচ তাতে তেনাদের কোনো তাপ-উত্তাপই লাই। পয়সা আর ক্ষেমতা এমনই জিনিস যে তাকে একবার চুরি কইর্যেই হোক কী ডাকাতি কইর্যেই হোক কব্জা কইর্যে ফেলতি পারলি অন্যে জানলিও ট্যাঁ-ফোঁ করে না কেউ। আর যারই ঘরে পয়সা

আর ক্ষেমতা এসে বাস্তুসাপের মতো বাস করে তারও মনে কিছুদিন পরে এমনি পেত্যয় জম্মে যায় যে, সে সবই তার যোগ্যতা দিয়েই পেই-চিলো যেন।

ইদেশটা তো সাপেদেরই দেশ। মানুষের তো মেরুদণ্ড লাই। সাপেদের মদ্দিও সব আবার হেলে। ফণা ধরতি, মাথা উচু করি বাঁইচতে পর্যন্ত জানে না। ছিঃ ছিঃ। আর যার কাছেই পয়সা আর ক্ষেমতা তার চারপাশে কোমরে দড়ি-বাঁধা বাঁদরদের তো ঢিপ্পি পইর‍্যে যায়। কত্তা বলেন, নাচ রে বাঁদর নাচ। অমনি বাঁদর কাঁধে লাঠি, পায়ে ঘুঙুর পরে ঘুরে ঘুরে নাচে। কত্তা বলেন, রে বাঁদর! ডিগবাজি খা। বাঁদর মহানন্দে ডিগবাজি খায়। কত্তা বলেন, বাঁদর দুঃকু-দুঃকু মুক কর তো বাপ্। বাঁদর অমনি দুঃকু-দুঃকু মুক করে গালে হাত দিয়ে বসে। কত্তা ধরি আনতি বললে, কত্তার বাঁদরেরা বেঁইধে আনে। কত্তারা ফিসফিস করে কাউকে ভালো বললে, বাঁদরেরা অষ্টপ্রহর হাততালি দিতে থাকে। তার নামে পুজো চড়ায়। থামতেই চায় না। কত্তার ইচ্ছেতে ভূতকেও ভগমান বানায়। খচ্চরকে আরবী ঘোড়া।

বাঁদরেরও কত্তরকম। ধলা বাঁদর, কালো বাঁদর, বুড়ো বাঁদর, জোয়ান বাঁদর, মোটা বাঁদর, রোগা বাঁদর।

কত্তা বলেন, রে বাঁদর! আমার জুতো পালিশ কর্। অমনি বাঁদর জুতো পালিশ করে। কত্তা বলেন, বাঁদর আমার থুথু চাট্, তোর হপ্তা বাড়িয়ে দেবো, বুকে শ্লেষ্মা বসলে কী ভেদ পাইকানা হলে তোকে কেনিং নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেকাবো, লেডিকিনি খাওয়াবো। অমনি বাঁদর থুথু চাটে, হামলে পইড়্যে সামন্তদের পায়ের কাছে মুখ লামিয়ে।

হোসেন মিঞার দেকে দেকে ঘেন্না হইয়ে গেছে পয়সার উপরে আর পয়সার কিরিয়া-কাণ্ডর উপরেও। পয়সার জন্যে যদি "ইডুকিটেড আর্ট-কেল্‌চার" মানুষে এই করে, নিজেদের—কী মালিক, কী কম্মচারী এতোখানি নীচুতে নাইম্যে আনতি পারে বাঁদরের মতো, তবে সে পয়সার মালিক হবারও পেয়োজন লাই হোসেনের। আর সি পয়সার জন্তি কারও খিদ্‌মদ্‌গারী করারও পেয়োজন লাই। ভেইগ্যে পইড়বে

একদিন হোসেন মিঞা, সেই পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিঞারই মতো, সোঁদরবনের দিকে। থেইকি যাবে কোনো দ্বীপের মাঝে সবুজ-সবুজ, হাজার-রঙা সবুজের ছোপ নাগা চাপ-চাপ জঙ্গলের মদ্দি, জোঁয়ার ভাঁটা-খেলা জঙ্গলের মদ্দি; খোলা, নোনা-হাওয়ার মদ্দি, যে-হাওয়া উদোম সুমুদ্দুর থেক্যে ছুট্যে আসে। সিখানে একবার যেতি পারলি আর আসবে না ফিরি ইদিক পানে কক্‌খনো।

আব্বাজান হোসেনকে সামন্তদের ভেড়িতে ভেড়াতে চায়।

ওর মদ্দি হোসেন লাই।

ডোঙা ভাসায়ে দিলো পীরসাহেবের দরগা যেখানে, সেই মদনটাকি পাকির দ্বীপের দিকে। পাকিটার নাম আসলে মদনটাকি লয়। আসল নাম শামুকখোল। হোসেন ছেলেবেলাতে বইলতো, মদনটাকি। কেন যে বইলতো তা জানে না। বলতি বলতি শামুকখোল কী করি যে মদনটাকি হইয়ে গেচে তা বুঝতি পারে না হোসেন।

সেই মদনটাকির দ্বীপে একজন বাউলে আসে। সারেং মিঞা তার নাম। খয়েরী আর সাদা চেক চেক লুঙি তার পরনে। বাঘের মতো হাত-পায়ের গোছ। শুধু গা। কাঁধ থিইক্যে গামচা ঝোলে একখানি। বারো মাস। তার ডিঙ্গি নৌকার পাটাতনের নিচে বে-পাশী বন্দুক লুকানো থাকে। জানে হোসেন। আর থাকে কুড়োল, গাছ-কাটা; মধু-পাড়া হাঁড়ি, মৌচাকে ধুঁয়ো দেবার জন্যি ধুনো, মাছ-ধরা খেপ্‌লা জাল। লোকটার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কাঁচা-পাকা দাড়ি। বাঁ গালে একটা কালো জড়ুল। লোকটার চোখ দুটো দেখবার মতো। চোখ দুটাতে তাকালি মনি হয় যেন সুমুদ্দুরের ছায়া পইড়েচে তাতে। এই মেঘ, এই জল, এই নীল, এই সবুজ; এই যেন সাদা-রঙা নোনা-জলের পাকি উড়্যে যেতিচি ডানা ছইড়ে দে তার ভিতরে ভিতরে।

লোকটা কথা কম বলে। কিন্তুক অন্যকে ভাবনা ধরায়ে দেয়। আগে নাকি সে এঞ্জিন-বোটের সারেং ছেলো। সেই থেক্যেই সারেং মিঞা। আসল নাম ভেইস্যে গেচে জোয়ারের মুখে কুটোর মতো। মোটর-লঞ্চ সার্ভিস কোম্পানীর গোপেন বাগচীর লঞ্চ চালাতো। লঞ্চের

ছাদে "সুকান" ধরি বসি থাকতো ঐ চক্ষু দুখান মেলি দে। সোজা।

সেই চক্ষু দুখান জল জঙ্গল মেঘ তারা চাঁদ সব ফুঁড়ে দে চলি যেতো কোন অন্য গ্রহে নক্খত্রে।

ইকবার সি কইরেচেলো কী, ভরা-বাদরে মালিকের অজানতেই ছোট্ট একখান্ লঞ্চ নিয়ে কেনিংএর জেটি থেক্যে বেইর‍্যে গেসলো বনবিবির ডাক শুইনতে পেইয়ে। বনবিবি নাকি তাকে স্বপনে দেখা দিতেন। আর সেইবারেই বোট ঝড়এ ডুইব্যে যায়। ছোটবালির কাচেই সুমুদ্দুরের মুখে সারেং মিঞা কোনোক্রমে সাঁতরে উইট্যে বেঁইচে যায়।

বাগচীবাবুর বোটেরও সিখানেই সলিল-সমাধি হয়।

সারেং মিঞার জানটাও গেচিলো পেরায়, তবে যেতি যেতি থেকি যায় কোনোকেরেমে। বাঘের মুখ ঠেঙে বেঁইচে, কুমীরের মুখ ঠেঙে সাঁতরে পাইলে, কামটের দাঁত ছাইড়ে নে ফিরে আসে সারেং মিঞা তিন মাস বাদ। পৌষ মাসে!

তবে শোনা কতা; গোপেন বাগচীমশায় নাকি তেমনই মানুষ ছিলেন। ভগমানে বিশ্বাসী, দিলদার মানুষ; সোঁদরবনের পোকা।

সারেং মিঞার দুচোখে নাকি কিছুক্ষণ তাইক্যে থেক্যে বাগচীবাবু নাকি বইলেছিলেন, গল্প শুইনেচে হোসেন মিঞা, বনবিবি তোরে ডেইকে-চেলো সারেং? আমারেও ডাকে। বহুবছর হলোই ডাকে। তবে আমার যে অনেকই বন্ধন। ঘরসংসার, ছেলে-মেয়ে, এতো বড় ব্যবসা, বোট বানাবার মস্ত কারখানা। আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পইড়্যে গেছিরে এ জনমের মতো। তোর কোনো পিছুটান লাই। যা, তুই চইলে যা। তোর বিরুদ্ধে যে কেস করেছি, তাও তুলে নেবো। একখান্ বোট গেছে তো গেছে। রেফ্যুজি হয়ে এসেচিলাম একবস্ত্রে পাবনা থেকে। অনেক দিয়েছেন ভগমান। কোনো দুঃখ লাই। যা, চলে যা সারেং। তোকে মুক্তি দিলাম। তোর খুদার নাম নিয়ে চলে যা তুই বনবিবির বনে।

এতো কথা ভাবতে ভাবতেই দ্বীপের মুখে পৌছে গেলো হোসেন মিঞা। গাব গাছের কাছে ডোঙার ল্যাজ টেনে ডাঙ্গাতে উঠিয়ে রেকে সে গুটি-গুটি হেঁইটে চললো পীরের দরগার কাছে।

অনেকগুলো গো-বক বসেচেলো ঢিপি মেরে। তারা নইড়ে-চইড়ে উটে উড়ে বসলো ইদিক-ওদিক।

মৌমাছিরা চাক বেঁইধেছে গোলা-কাঁটালের বড় বড় গাছে। ঘন বন ইদিকে। জঙ্গলের গাছ লাই কিছু। সবই ঘর-গেরস্থির গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি। ক্ষেতিবাড়ি হতো ইসব জায়গাতে একসময়ে। এখন পীর বাবা দখল নেওয়াতে সবাই হাত উইটো নেছে। তবু হোসেন শুনতিছে যে, সরকার নাকি জবরদখল নিবেন এই দ্বীপের। নিয়ে পিসি-কালচার না কি বলে, তাই করবেক। ফনুবাবু বলতেছেলেন।

পিসিকালচারও লিশ্চয় অন্য ইক ধরনের আর্ট-কেলচার হবেক। হোসেন ভাবে।

সামন্তদের সঙ্গে সরকারেরও খুব দহরম-মহরম। না না ভ্যাবল সরকার লয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তেলা মাথায় তেল তো চিরদিনই পইড়েচে। মিনিস্টর, আমলা, এমনকি দিল্লীর উজীরে-আজম্-এর সঙ্গেও নাকি সামন্তদের দোস্তী আচে। পয়সাতে পয়সা আনে, ক্ষেমতাতে ক্ষেমতা আনে ; একটা বাঁদর অনেক বাঁদর আনে।

হোসেন মিঞা মনে মনে বড়ই ঘেন্না করে এই সামন্তদের। তাদের হাঁটা চলা, ওঠা-বসা, চাল-চালিয়াতি, খাওয়া-দাওয়া, তাদের ইয়ার-দোস্ত সবকিছুকেই।

কিন্তু হোসেন কি কইরতে পারে! যাকে বা যাদের দিল্ থেকে পেয়ার না করতে পারে, যাদের "লিয়াকত"কে "সাহী" বলে না মানতে পারে তাদের জন্যে পেয়ার ইজ্জৎ তো দূরস্থান, তাদের উপরে এক ধরনের "ভড়াস্"ই জন্মে যায় আস্তে আস্তে নিজের অজানিতে। যেমন সামন্তদের উপরেও জন্মেছে।

দূর থেকেই দেখতে পায় হোসেন মিঞা যে, সারেং মিঞা বসে আছে পীরসাহেবের কাছে। "মাজার"এর পাশে। ডিঙ্গি নিশ্চয়ই উল্টোদিকে বেঁইধেচে, নইলে দেকা যেত।

বহুদিন পরে দেখা হবে সারেং মিঞার সঙ্গে। শেষ দেখা হয়েছিলো গত চৈত্রে। সোঁদরবনের দিকে রওয়ানা হতেচিলো সে। একন তাকে

দেখামাত্রই উত্তেজিত বোধ করছে হোসেন। বুকের মদ্দি ম্যাদা মেরে থাকা রক্ত ধড়াস-ধড়াস করে উথাল-পাথাল করতিচে বুককে। মনে হতিচে কিচু একটা ঘইটবেক আজ।

এই সারেং মিঞাই একদিন বইলেচেলো হোসেনকে যে, ইনসান্ "মোতাকাব্বের" অর্থাৎ অহংকারী হলে তাকে এড়িয়ে চলবে। "ঘামণ্ড" বা গর্ব যার মধ্যে এইসে গেচে, তার পতন অনিবার্য।

এতো কতা সামন্তদের সম্বন্ধে হোসেনের মনে যে হচ্ছে তার কারণও আচে। কারণটা এমন কিছু নয় যে সে ব্যাখ্যা করি বলতি পারে। কিন্তু কারণ অবশ্যই আচে। সে কোনদিনই সামন্তদের ভেড়িতে চাকরি করেনি, এটা ঠিক। কোনরকম মদতই নিতে চায়নি তাদের কাছে। তবে একবার তাদের ভেড়ির ঝাঁঝি পরিষ্কার করার জন্যে অনেকের সঙ্গে সে-ও দিন দশেক দিন-মজুরী কইরেচেলো। তখনই দেইকেচেলো সামন্তদের খুবই কাছ থেইকে।

হোসেনকে যা ব্যথা দিয়েছে, তাজ্জুব করেছে, তা সামন্তদের বেওয়াকুফী। বাঁদরের মতো স্বার্থপরায়ণ কতগুলো "না-কাবিলে-এহ্‌তেরাম্" মানুষের হাতের খেলনা হয়ে রয়েছে নদে সামন্ত আর ফদে সামন্ত, তাদের "গালত্ ইলম্" এরই জন্যে। তাদের মোসাহেবরাই তাদের চোখ, তাদের নাক, তাদের কান। তাদের নিজস্বতা পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলেছে তারা পয়সা আর ক্ষমতার "তামার" শিকার হয়ে। প্রতিদিন মাছ কত বিক্রি হলো আর কত টাকা ঢুকলো ঘরে তারই হিসেব কষে আর খুশিতে ডগমগ থাকে তারা। মাঝে মাঝে ভেড়ির পর ভেড়ির জলের দিকে চেয়ে থাকে উদাস চোখে। ভাবে, জলের তলায় কত মাছ খেলে বেড়াচ্চে। সেও তো টাকাই। ড্যাঙ্গায় তুললেই টাকা। জীবন্ত টাকা।

সারেং মিঞাই বইলেচেলো একদিন হোসেনকে, "কোঈ ইনসান্ কী গোলামী মাত্ করনা। আল্লাহ্ হর চীজ কা মালিক হ্যায়। আল্লাহ্ তামাম সিকত্‌কা মালিক হ্যায়।"

মানে, কোন মানুষেরই দাসত্ব কোরো না কখনওই। গোলামীই যদি

করতে হয় তো আল্লাহ্‌রই গোলামী করবে। কারণ, আল্লাহ্‌ই সমস্ত গুণের মালিক, আল্লাহ্‌ই প্রতিটি জিনিসের মালিক। আর সব সময়েই মনে রাখবে যে, "কায়েনাত্‌ মেঁ এক নেয়াম হ্যায়।" বিশ্বভুবনে একই শৃঙ্খলা বর্তমান বা বিদ্যমান আছে। কোনো মানুষের সাইধ্য কি যে তা ভাঙে! সে বা তারা যত বড় ক্ষেমতাধরই হোক না কেন!

পীরসাহেবের ডেরায় পৌঁছে হোসেন সালাম করে বললো, আস-সালামো আলায়কুম।

সারেং মিঞা ফিসফিস করি বললো, ওয়া আলায়কুম আস-সালাম।

আচেন ভালো তো মিঞা সাহেব?

হ্যাঁ। আল্লার ফযল্‌এ ভালোই আছি।

বহুদিন তো দেকা নাই। আপনার কতো গল্পই যে পীরসাহেবের কাচে শুনি। আমারে নিয়ে যাবেন কি এবার আপনার সঙ্গে সারেং মিঞা?

হোসেন মিঞা একথা বলতেই পীরসাহেব সারেং মিঞার চোখের দিকে তাকালেন।

আশ্চর্য এক হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে।

কী হইয়েচে?

হোসেন শুধোলো।

পীরসাহেব গলা খাঁকরে বললেন, না, এই একটু আগেই সারেং মিঞা বইলতেচেলেন যে একেবারে একা নির্জন পেরকিতির মদ্দি মাসের পর মাস বছরের পর বছর থাকতি থাকতি মাঝে মদ্দি পাগল পাগল লাগে। আল্লাহ্‌ সবসময়ই সঙ্গে থাকেন যদিও। তবু, সে নিজে তো মানুষ। সময়ে বিয়ে করলে তার লড়কা এতোদিনে জওয়ান হয়ে যেতো, পেরায় তোমারই মতো বয়সী হতো। একজন সঙ্গীর তার দরকার। সময়ে কী বা অসময়ে কী সারেং মিঞা তো বিয়েই করলো না। এবং···

এবং কি?

এবং এও বইলতেচেলো সারেং মিঞা যে আজই সেই সঙ্গী আসবে। সে সঙ্গীকে সঙ্গে করে নে যাবার জন্যেই এবারে হেড়োভাঙ্গা হয়ে,

গোসাবা হয়ে, নওবাঁকির খাল পেরিয়ে, মাতলা বেয়ে, নালা দিয়ে, বাদা বেয়ে এখানে এসে পৌঁচেছে সারেং।

হোসেন মিঞা চুপ করে চেয়ে রইলো সারেং মিঞার দুচোখের দিকে।

কিন্তু সারেং মিঞা নির্বাক। কোন বাক্যি নেই মুকে। সেই দুটি চোখ। দু চোখে একবার সকাল, একবার রাত, একবার মেঘ, একবার রোদ্দুর। সামুদ্রিক সাদা পাকি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই দুটি চোখের মদ্দি। তাদের গায়ে নোনা গন্ধ। সেই পাকিদের ডানার উজ্জ্বল সাদা পাল সরে যেতেই এবারে কালো ছায়া নেমে এলো। পানকৌড়ি উড়ছে। চোখের মণির ভিতরে বাদার-বিলের পানকৌড়ি। কালো।

বাড়িতে বলে আসবো ইকবার?

হোসেন মিঞা বললো।

সারেং মিঞা হাসলো। তাও আধফোঁটা হাসি। ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো না। শব্দও হলো না কোনো।

হোসেন বললো, জামা-কাপড় নিতে হবে তো কিছু। অন্ততঃ আরেকটা লুঙি। গামছা একটা?

সারেং মিঞা তার মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে আইসতা আইসতা বললো, যে সংসার ছাড়ে, সে চিরদিন এক কাপড়েই ছেইড়েছে। লুঙি-গামছা গুছিয়ে নিতে যারা ঘরে গেছে তাদের পথে বেরুনো আর হয়নি কোনোদিনই।

বলেই বললো, তুমি তো ছেলেমানুষ হোসেন মিঞা! তুমি আমার সঙ্গে যাবে কেন? গেলে যে ফিরতে পারবেই তেমন কোনো স্থিরতা কিন্তু নাই। এ কতা পরিষ্কার করে তোমাকে বইলে দেওয়া দরকার।

হোসেন বললো, সেই ছেলেবেলা থেইকেই আমি বুইজতে পারি যে, আমি পথেরই; সংসারের নয়। সঙ্গে আল্লাহ্ থাকলেই হলো, আর আপনি।

আপনি বলো না, বলো তুমি। আমরা বন্ধু। তারা, চাঁদ, সূর্য, সমুদ্রর বন্ধু। আল্লাহ্র সেবক।

একটু থেমে সারেং মিঞা পীরসাহেবকে বললো, তবে যাই পীর-সাহেব ? ইযাযত্ দিন।

হোসেনকে বললো, ঘাড় ঘুরিয়ে, আরেকবার ভেবে দেকো। পরে আমাকে দুষো না। আমার সঙ্গে গেলে, মানে আমি যেখানে যাবো, সেখান থেকে একা ফেরৎ আসতি পারারও কোনো সম্ভাবনা লাই। মনে থাকে যেন। ফেরৎ যে আসবেই তারও কোনো ওয়াদা দিতে পারি না।

তারপর কী মনে করে বললো, আচ্ছা, যাও তুমি। তোমার রিস্তা-দারদের সঙ্গে একবার দেখা কইরেই এসো। আব্বাজানের সঙ্গেও। লুঙি-গামছা, জামা-চিরুনি নিতে চাও, তো তাও নিয়ে নিও। এই রাতটা তোমাকে দিলাম। সংসার তোমাকে রাকে, না তুমি আমার সঙ্গেই যাও, তা আল্লাহ্ই ঠিক করবেন। তুমি আমার সঙ্গেই যাবে, ইন্‌শাআল্লা। যাও।

খুদাহ্ হাফিজ্।

হোসেন মিঞা যখন বাড়ি ফিরলো, তখন পশ্চিমে সূর্য হেলেছে। আব্বাজান দাওয়াতে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। মামুজানএর হঠাৎ মৃত্যুটা তাঁকে বড় লেগেছে।

আম্মী!

কে রে ? হোসেন ? আমি চমকে গেছিলাম। এ কী! তোর চোখ-মুখ এরকম হয়েছে কেন ? মোতাহার বলছিলো গোরস্তানেই তোকে এরকম দেখাচ্ছিলো শুনলাম। কোথায় গেছিলি ?

পীরসাহেবের কাছে।

কেন ?

এমনি।

আম্মীর হোসেনকে নিয়ে চিরদিনই দুর্ভাবনা ছিলো। এই ছেলেটা বড় হলে কী হয় কে জানে! সংসারের পক্ষে এ একেবারেই বেমানান। বড় দু ছেলে তো সেয়ানা হয়েছে। পাশেই আলাদা আলাদা বাড়ি করে

বিবি-বাচ্চা মোরগা-আণ্ডা নিয়ে থাকে। আর হোসেনের ছোট যে ভাই সকলেরই ছোট, সেই মোতাহারকেও বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কুড়ি বছর বয়সেই। দুলহীনএর নাম সিতারা। দুরছির্‌পাড়ার রমজান আলি হেকিমের মেয়ে। হুরী-পরী।

হোসেনের বয়স পঁচিশ হলো। এখনও দলিল-দস্তাবেজ, দাগ, খতেনএর নম্বর, চাষবাসের হিসেব, কী মাছ ধরার কায়দাও রপ্ত করতে পারলো না। নিজের মনে ঘোরে ফেরে গান গায়। আর যত বখা আদমীর সঙ্গে দোস্তী। অপু আর নিতে। মোদো-মাতাল। ওদের অন্য দোষও আছে। এই গেরাম-গঞ্জর বড়লোকের ব্যাটা সব। মনসুর মিঞা তো আর বড়লোক নয়। চলে যায় এই আর কী!

হোসেনকে খরচের খাতাতেই ধইরে রেখেছে মনসুর মিঞা। মোতাহারের চোখে-মুখে বুদ্ধি। বিষয়ী খুবই সে। কত সারে, কত বীজে কোন্‌ ফসল কীভাবে তুলবে? কত বিঘা ভেড়িতে কত মাছের চারা কোন সময়ে ছেড়ে কোন সময়ে ধরবে? গরু-বলদের লক্ষণ চিনে তাদের কেনা-বেচা। ওয়ালেদায়েনের দেখাশুনো করা, তাঁদের এহ্‌তেরাম করা—সবকিছুই সে করে। লায়েক হয়েছে সেই, যদিও বয়সে ছোট। হোসেনের উপরে, তার খামখেয়ালিপনা, তার "জুনুন" মানে পাগলামি আর সাংসারিক—জাগতিক কোনো ব্যাপারেই মন নেই বলে, মনসুর মিঞা অত্যন্তই অসন্তুষ্ট।

সেই অসন্তুষ্টি দিনে দিনে বাড়ছেই।

একথা আম্মীজানও জানে। জানে বলেই, হোসেনকে বেশি করে ভালোবাসে। আগলে আগলে রাকে।

হোসেনও জানে এ কথা।

মোতাহার এখন থেকেই বলতে আরম্ভ করেছে যে, অযোগ্য ছেলেই মা-বাবার আদর বেশি পায়।

আম্মীজান একই সঙ্গে আরও অনেক অনুযোগের কথা বলতে শুরু করে। কোনো কারণে, তার মেজাজও খুবই খারাপ ছিলো।

হোসেন আর কতা বাড়ায় না। সারাদিনে খায়নি কিছু। পুকুরে ডুব

দিয়ে আসবে বলে লুঙি-গামছা নিয়ে এগোয়। মামুজান এই দাওয়াতে এই সময়ে গতকালও বসে হুঁকো খেইতেচেলো। আজ সে লাই। এই হচ্ছে আল্লার দুনিয়া।

হাঁসগুলো প্যাক প্যাক কইরতে কইরতে তখন হেলতে দুলতে বাড়িতে ফিরচিলো। ছোট বোন আয়েষা হাঁসেদের, তাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সূর্য মগ্‌রীবে ডুবে যাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বলেছে। শাঁখ বাজছে। মাদার গাছের ডাল থেকে এক-জোড়া বড় ঘুঘু উড়ে গেলো। নিমগাছে ফুল এসেছে। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে পাতাগুলো। হোসেন পুকুরের জলে নেমে কান অবধি ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। বসন্ত-বৌরি ডাকছে উমের মিঞাদের বাড়ির কনকচাঁপা গাছ থেকে।

একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। কালকে সকালে মাশরিক্‌এর আকাশ লাল করে যে সুরাজ উটবে, যে দিনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে, সে অন্য এক দিন। হিঁদুর বামুনদের মতো হোসেনেরও পুনর্জন্ম হবে।

হোসেন ভাবচিলো, ঘর ছেইড়ে গেলে, আম্মীজানের সরল, পবিত্র, চিন্তিত মুখটির কথাই মনে পড়বে বারবার। আর কারো জন্যে কোনো দুঃখ নেই হোসেনের। আম্মীজানকে নিজের রোজগারে একটি শাড়িও কোনোদিন কিনে দিতে পারেনি যে, এই তার একমাত্র দুঃখ।

বোন আয়েষাও তাকে ভালোবাসে না।

ভালোবাসা পায়নি, ভালোবাসার জন্যে কোনো কাঙালপনাও নেই তার। ছিলোও না কোনোদিন। কিন্তু আকাশ বাতাস জল বিল চাঁদ সূর্য তারা, অন্ধকার, আলো এসবের মধ্যেই একধরনের আশ্চর্য ভালো-বাসার স্বাদ পায় হোসেন। সেই ভালোবাসাটা ঠিক যে কী, তা সে বোঝে না। কিন্তু তার স্বাদ বড়ই গভীর। সেই ভালোবাসাতে মজেই তো ঘর ছেড়ে সে বাইরে ছুইটেচে। কাল ফজিরের আজানএর সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে যাবে। মাশরিক্‌এর আকাশ যখন লাল হয়ে উঠবে, ও তখন উটকপালি মদনটাকির দ্বীপে।

॥ ৩ ॥

সন্দের মুকে মুকে ওরা যকন ডিঙ্গি বেঁইধেচে বাসন্তীর ঘাটে, দেকা হয়ে গেলো তখন চার দাঁড়ি এক হাল্‌এ বাওয়া এককানি ফাস-কেলাস চাপা বজরার সঙ্গে।

হঠাৎই ছই-এব নিচ থেকে বেরুলো সামন্তদের বড় তরফের একমাত্র ছেলে নেমাই সামন্ত। ধবধবে পাজামা আর ছিল্কের পাঞ্জাবী পরনে। মাতায় জব্‌জব্‌এ করে গন্দ তেল মেইকেচে। গলায় সোনার হার ঝুলতিচে। হাতে সোনার হাতঘড়ি। দামী ছিগরেটের পেকেট। ঝিং-চ্যাক লাইটার।

নেমাই নিজে একটা ছাগল। পয়সা আচে। তাই কোন্‌ভেণ্ট ইস্‌কুলএর ইঞ্জিরি-জানা মেম-সাহেব মেম-সাহেব ভাবের মেয়ে বিয়ে করে নিজেও সাহেব হইয়ে উইটেচে। মানে বুজুক আর নাই বুজুক, সব্বোসময়ে হাতে থাকে ইঞ্জিরি নবেল। ইঞ্জিরি ছাইনবোড পড়তেই যার দাঁত ভেইঙ্গে যেতো সিই একন ছায়েব হইয়েচে। টাকা আর ক্ষ্যামতা থাকলি দুনিয়াতে সকলকেই ডণ্টু-কেয়ার করা যায়।

বাবু, বেরুতে না-বেরুতেই বাবুদের দুটো বাঁদরও বেইরে এলো ছইয়ের নিচে থেইকে। যেন বাকুলএ এসে উঠলো খোঁয়াড় থেইকে। সামন্তবাবুদের বড়ই বদব্বেস হইয়ে গেচে। বাঁদরদের ছেইড়ে কুতাও এক পাও নড়তি পারেন না তাঁরা। মোসায়েবির বড়ই ভক্ত হইয়ে পইড়েচেন। একটা বাঁদর বেঁটে ও মোটা। চেহারাতেই মালুম দেয় যে ইটিই হচ্ছেন গিয়ে—প্যালের গোদা। যত বদবুদ্ধির গোড়া। নীচ, ইতরজনেদের চাঁই।

ইদিকে মুক দেকলি মনি হয় যেন ভাজা মাছটি উলটি খেইতেও জানেন না। মোটা বাঁদরের সঙ্গে একটি রোগা বাঁদর। লম্বা। ফ্যাকাসে। চোর-চোর চেহারা।

পেরকিতো বাঁদরদের তবু কিছু আত্মসম্মান থাকে। এই দুপেয়ে-গুলোর সি সব বালাই নাই। চেহারাতেই শুধু মানুষ। সি সবসময়ই মালিকের সামনে হাত জোড় করি বসি থাকে। আর মালিকের পেতিটি বাক্যির পর হাঁ স্যার হাঁ স্যার, স্যার স্যার কইরে যায় সমানে। ভেড়িতেও দেইকেচে এদের হোসেন মিঞা। এরা সব ঘাঘু মাল হতিচেন। বাবুদের মোসাহেব। ছেলে বেইরেচে, দেচেন তার সঙ্গে ফিট্ করে।

হঠাৎ নেমাই সামন্ত হোসেনকে চিনতে পেরে বলে উঠলো, কে ওটা? আরে, এ মনসুর মিঞার পো লয়? ইকানে যে! সকলিরই ইড্ভিঞ্চারের সক হলো দিকি!

হোসেন মুখ তুলে চাইলো বটে বাবুর দিকে। তবে কতা বললো না। কী-ই বা বলবে! সি কুনো বাবুরই চাকর লয়।

নেমাই সামন্ত হাসলো। বাবুদের ধন্যি-করা হাসি। টিপেকাল।

মোটা বাঁদর বললো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তাই তো দেক্তিচি।

খুবই গুমোর দেক্চি যে গো। আমি কত্তা হইয়ে কতা বইললাম যেইচে। জবাবে কতাই কয় না দিকি!

রোগা বাঁদর বললো, তাই তো! তাই তো! দিমাক হইয়েচে। বিস্তর দিমাক।

বলেই গলা তুলে বললো, এই যে! মনসুর মিঞার পো, তোমার নাম হোসেন লয়? কতা বইলতেচো না কেনে? দেইকতিচো না, ছোটবাবু তোমাকে চিইনেচেন?

আমিও চিইনেচি তেনারে। কিন্তুক কতাটা বলার কি আচে? কী বইলব?

পেন্নাম কর হারামজাদা। বেশি প্যাট-প্যাট করবিনি।

বাবু, জিভ তালুতে ঠেইকিয়ে টাক্ কইরে একটা শব্দ কইরে বললেন, আঃ। মুখ খারাব করা কেন? অ্যাঁ?

হোসেন ভাবলো, আসল হারামজাদা যারা তারা কক্‌খনো মুখ খারাব করে না। তারা হাইসতে হাইসতে চইলে যায়। তারপর পেছন থেইকে অন্ধকারে ছুরি মারে।

এবারে সারেং মিঞা মাথা উঁচু করে, ঘাড় সোজা করে বললো, যারে তারে পেন্নাম করি না আমরা। খুদাহ্‌ ছাড়া কাউকেই সালাম করি না। অন্য কারো খিদ্‌মদগারী করি না।

বাবাঃ। এ কে রে? বড় গরম দেকি।

যাকে তাকে! যাকে তাকে! যাকে তাকে?

মোটা-বেঁটে বাঁদর বললো।

রোগা বাঁদর চিঁ-চিঁ করে বলে উঠলো, তাই তো। তাই তো। টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌। যাকে তাকে?

নিমাই সামন্ত বললো, এ ছোকবা দেখি মানুষের মর্ম বোঝে না। আমার কি দায় পইড়েচে 'ওর সঙ্গে কথা বলতি। চেনা-চেনা ঠেকলো, ভাবনু, এক গেরামের মানুষ। কোন দরকার-টরকার যদি থাকে তো।

সারেং মিঞা বললো, আমাদের আপনাদের সঙ্গে কোনোই দরকার লাই বাবু। কিছুমাত্র চাওয়ারও লাই। আপনারা যে বাঁদরের চাষ কইর-তিচেন, মাছের চাষের সঙ্গি, সেই বাঁদরদের দুধে-ভাতে রাখলিই আপনাদের মান বাড়বে। গুমোর বাড়বে। সুদুমুদু আমাদের জন্যে কিছু করতে যাবেন কেন? চাওয়ার যেমন লাই আপনাদের কাছে কিছু দেওয়ারও লাই।

তারপর বললো, বাবুদের যাওয়াটা হচ্ছে কোতা?

সারেং মিঞার কতা-বারতা নেতাই সামন্তর বিশেষ ভালো ঠেকলো না। ভেড়ির খচ্চর উনিয়ন-লিডারের মতো কতা কয় মনে হয়। মানুষটার অতীত নিয়ে একটু খোঁজ লাগাতে হবে।

এই! একটু ইড্‌ভিঞ্চার করতি। সোঁদরবনের বাঘেদের ছবি তুলবো।

বাবু বইললেন।

তা বাবুদের লঞ্চে করেই যান না। আপনারা বড়নোক। তেনাদের

সঙ্গে জানাশুনো থাকবে নিশ্চয়।

না। আমার এমন আস্তে আস্তে যেতেই ভালো নাগে।

ভেতরে গেলে তো বাঘে খাবে আপনাদের।

বাঁদরেরা বললো, বাঘ? বাঘের ঘাড়ে কটা মাতা? সামন্ত কোম্পানীর বড় শরিকের একমাত্র পুইত্রকে খেয়ে কি শেষে হজম করতি পারবে? বদহজম হইয়ে মরবে যে।

বাঘ!

মোটা বাঁদর বললো।

হাঁ। বাঘ।

রোগা বাঁদর বললো।

হিঃ।

আমার কাছে কুড়ি হাজারী বন্দুক আচে। ইস্‌প্যানিশ।

বাবু বইললেন।

প্রথমতঃ বন্দুক নিয়ে যেতেই দেবে না। দ্বিতীয়তঃ বাঘ তো বন্দুকের দাম জানে না। আর বন্দুক থাকলিই তো হয় না, চোট করতেও জানা চাই। বন্দুক নিয়ে যেতেই দেবে না আপনাকে। পারমিট আছে কি?

বড় বাঁদর বললো, বাবু জানেন না? বন্দুক চালাতে? কী জানেন না বাবু? তোরা কী ভেইবেচিস আমাদের বাবুকে?

ছোট বাঁদরও বললো, বাবু জানেন না এমন কি আচে পিরথিবীতে? কী থাকতে পারে? অ্যাঁ?

দেকাই যাক।

বাবু বইললেন।

দেকুন।

বললো, সারেং মিঞা। তারপর ঘাট থেকে নৌকো খুলে নিয়ে বাবুদের নৌকো থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ভিড়ালো।

হোসেন শুধোলো, নৌকো খুইলে চইলে এলে কেন সারেং?

ওরা মানুষ ভালো নয়।

কী কইরে বুঝলে ?

খারাপ মানুষ নিকটে এলেই আমার নিশ্বাসের কষ্ট হয়। কোনো একটা ব্যাপার ঘইটে যায় ভিতরে ভিতরে হোসেন। তরঙ্গ ওটে হয়তো হাওয়াতে। বুকের মধ্যি চাপ, কষ্ট বোধ করি আমি।

যেসব মানুষ মানুষের মতো দেখতি অথচ মানুষের স্বভাব যাদের লয়, তাদের ঠেঙ্গে দূরে থাকাই ভালো। বাবুটা মানুষ খারাপ লয়। তবে বোকা। একেবারেই বোকা। পয়সার গরমে জন্মান্ধ। বাবুকে তাও সহ্য করা যায়। কিন্তু একেবারেই অসহ্য ঐ বদ্ ইতর খল বাঁদর দুটো। মানুষের রাজ্য ক্রমে ক্রমে বাঁদরে ছেয়ে ফেইললে গা।

হোসেন বইললো, এ কী পুলিটিকাল পার্টিগুলানের বাড়বাড়ন্তের জইন্যেই হলো।

হো হো করে হেসে উঠলো সারেং মিঞা।

বইললো, আমাকে বইলেচো বইলেচো, অন্য কাউকে বইলো না মিঞা। তোমাকে যা-তা বলবে। এমন গাধাব মতো কথা কক্‌কোনো বইলো না। বোকা মানুষ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তবে অবশ্য তারা পাজী মানুষের চেয়ে ভালো।

এট্টুখন চুপ মেইরে থেইক্যে সারেং মিঞা বইললো, এই বাবুর মতো মানুষ আর তাব চাকবেরা কোনোদিনও আল্লার দোয়া পাবে না। এদের দোজখ্‌এ পচতে হবে। এ দুনিয়াই যে একমাত্র দুনিয়া নয়, জিন্নতও আছে, জহান্নমও আছে একতা বোধহয় এরা জানে না! আল্লার কাছে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান নেই। ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ আর অবিশ্বাসী মানুষ এই দুই ভাগ। যে-বড়লোক সৎ-অসৎএর বিচার করে না, যে-মালিক যোগ্যতার বিচার করে না, নিজের মোসাহেবী করার জন্যে বাঁদরদের কাছে টানে আর মানুষদের দূরে ঠেলে, তারা নিজেদের কাঁচের স্বর্গেই একদিন ছাদ চাপা পড়ে মরে। নিজেরা মরবার আগেই সবকটা বাঁদরই ছেড়ে চলে যাবে এমন মালিককে। আখ্‌রতের দিনে সবই বুঝতে পারে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে তখন। জান যখন বেরুবে, তখন মুখে পানি দেওয়ার একজনও রইবে না

কাছে।

হোসেন বইললো, ছাড়ো মিঞা। ওদের কতা ছাড়ো। অন্য কতা বলো। আল্লার ছুনিয়াতে "যেইসি কর্‌নি, ঐসি ভর্‌নী"। ওরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে, আমি তুমি ঠেকাবো কি করে। ইস্তেফা-কান একদিন সবই বুইজবে! সবই পরিষ্কার হবে তাদের চোখের সামনি। তবে হয়তো অনেকই দেরি হইয়ে যাবে তকন।

হোসেন পাটাতনের উপর গামছা পেতে ঈশার নামাজ পড়ে নিয়ে-ছিলো। ভাত আর ডাল আর একটু আলুর তরকারি দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলো ওরা। সারেং মিঞা নামাজ পড়ে না। কেন পড়ে না তা জিজ্ঞেস করলে বলে, তোমরা তো অনেকবারই পড়ো দিনে রাতে, আমি পড়ি হরওয়াক্ত্‌।

নামাজ না পড়লি আল্লা গুস্‌সা হবেন না?

না। আমার উপর হবেন না।

সারেং মিঞা যখন কোনো কতা বলে তখন তার ছুটি চোখকে আত্মবিশ্বাস উজলা করে তোলে। তার চোখে চেয়ে তার কথার উত্তরে কোনো কথাই বলা যায় না। সারেং মিঞা সাধারণ মানুষ যে নয়, তা বোঝে হোসেন! সাধারণ মানুষ হলি তার আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরো-নোও সম্ভব হতো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লো পাটাতনের একদিকে সারেং মিঞা, অন্যদিকে হোসেন। কৃষ্ণপক্ষটা সবে শুরু হয়েছে। চাঁদ ওঠে। তবে দেরিতে। রোজই একটু একটু করে দেরি বাড়বে। তারপর অমাবস্যাতে পৌঁছে আর সে রাতে উঠবেই না।

ফর্সা হবার আগেই ফজিরের নামাজ পড়ে একটু মুড়ি আর গুড় দিয়ে নাস্তা করে ওরা বেরিয়ে পড়লো। গোণ-বেগোণ দেখে দাঁড় টেনে টেনে কখনও বা পাল তুলে দিয়ে হাওয়ার তোড়ে ডিঙ্গি ভাসিয়ে এগিয়ে যাবে। বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্যর দিকে তাকিয়ে বেলা বুঝবে ওরা, নদীপারের কোনো বড় গাছের ছায়াতে নৌকো নোঙর করে রান্নার বন্দোবস্ত করবে। সারেং বলছিলো সোঁদরবনের ভিতরে পৌঁছে নানা-

রকম মাছ, কাঁকড়া, কাছিম ধরে খাবে। যতক্ষণ বাইরে বাইরে আছে, জেলে-নৌকোর কাছ থেকে মাছ পেলে মুঠিভর মাছ কিনে নেবে। এরপর একবেলা খিচুড়ি। অন্যবেলা উপোস, নয়তো একটু মুড়ি-চিঁড়ে।

নৌকোতে এক বস্তা মোটা লাল চাল নিয়েচে সারেং মিঞা। নুন, তেল, হলুদ, লংকা, পেঁয়াজ, রসুন। ডাল নিয়েছে মসুর আর মটর। আলু নিয়েছে। আলু প্যাজই সব। "খাদ্য-খাদকের ইকিনে বড়ই অভাব।"

বন্দুকটা তুমি পার করবে কি কইরে সারেং ভাই ?

দেখবে, দেখবে। নৌকো নিয়েও কাউকে ভেতরে যেতে দেয় না। চেকপোস্ট আছে। পিটেল বোট আছে। তবে আমরা এমন এমন নালায় আর খালে আর ট্যাঁকে, বালিতে পাল খালে, শিষ খালে বা সুঁতি খালে থাকবো যে ফরেস্ট ডিপার্টের বাবাও ধরতি পারবে না। তাছাড়া···

এট্টু থেমে সারেং বললো, আমাদের ধরবে কি করে ? আমরা যে আল্লার খিদ্‌মদগার। এমন রাতের আঁধারে ঢুকে যাবো ভিতরে, যে বুঝতেই পারবে না কেউ। তারপর একটু এগিয়ে ঢুকে পড়বো শিষ-খালে। সেই সব খালে পিটেল বোট যাবেই না। আর যদি ডিপার্টের লোক ছোট বোট নে ঢুকবার চেষ্টা করে তবে তো নির্ঘাৎ মরবে বাঘের পেটে। বাঘেরাই আমাদের পাহারাদার কুকুর হবে।

আমাদের বাঘে খাবে না ! খাবে না কেন ?

আরে বনবিবি যাদের সহায়, সহায় বাবা দক্ষিণ রায়, তাদের বাঘে খাবে কি ? দেখবে দোস্ত, দেখবে, সেইসব লীলাখেলা। জয় বনবিবির জয় ! বড়খাঁ গাজীর জয় !

সোঁদরবনের ভিতরে একন আমরা একাই থাইকবো নাকি ?

এখন একা লয়। এখনও তো নৌকো ঢুকছেই। পারমিট নিয়েই ঢুকছে। শিকার করার পারমিট লয় ! মাছ ধরার, কাঠ কাটার, মধু পাড়ার। সজনেখালি থেকে পাস নিতে হয় ওদের। বর্ষা নামতে এখনও ঢের দিন বাকি। এই গরমের সময়েই তো সোঁদরবন একেবারে গম্‌গম্‌ করে নৌকোতে আর মাঝিতে। বড় বড় গয়নার নৌকো করে কাঠ

কাটতে আসে মেদিনীপুর এবং অন্যান্য জিলার মানুষে। শীতেও অবশ্য আসে। আর বড় মিঞারা তখন জিভ দিয়ে গোঁফ চাটে।

কি কাট কাইটে সারেং ভাই?

কী নয়, তাই বলো।

সুন্দরী গাছ আচে সুন্দরবনে, তাই নয়?

আচে। তবে বেশি নাই। আসল সুন্দরবন তো পইড়েচে বাংলাদেশে। খুলনে আর বাখরগঞ্জ সাবডিভিশানে। সিখানেই সুন্দ্রী বেশি।

ইদিকি কি গাছ আচে?

কত গাছ। কত্তরকম গাছ। চেনাবো তোমাকে। সব চিনিয়ে দেবো। গরাণ, হ্যাঁতাল, সাদাবানি, কেওড়া, গোলপাতা, বাইন, আরও কত্ত। কত পাতা, কত লতা, কত মাছ, কত স্যালামাণ্ডার, কত সাপ, কত কীড়ে-মাকড়ে।

আচ্ছা সারেং মিঞা, তুমি কতায় কতায় এমন সব উর্দু শব্দ ব্যবহার করো, যার মানে বুঝি না আমি। কই? আমরা বিতিচি গেরামের কোনো মুসলমানই তো অমন করি না। এমনকি ঘুটিয়ারি শরীফেও গিয়ে দেকিচি সেখানেও করে না। হাড়োয়া, মসলন্দপুর, কোতাও নয়।

উর্দুটা দেইখলে কোতায়? স্যালামাণ্ডার তো ইংরিজি কথা।

তাই? মানে কি সেই ইঞ্জিরি কথার?

ছোট ছোট মাছের মতো। উভচর প্রাণী। ভাঁটা যখন দেয় তখন প্যাচ্‌প্যাচে কাদার মধ্যে চলে। আর যখন জোয়ার আসে, জলে পড়ে হাইর্যে যায়।

তাই?

হোসেন মিঞার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে ওঠে ঔৎসুক্যে।

আরে মিঞা, আমি যে বিহারেই কাটিয়ে দিয়েচি জীবনের তিন ভাগের দুভাগ। নামেই আমি বাঙালী।

হোসেন বলে, আমরা তো বিলে-বাদাতেই ডোঙা চালাই। তাও তালের ডোঙা। তুমি বড় নদীতে ডিঙ্গি নৌকো চালাতে শিকলে কি

কইরে? পাল টাঙাতে, গুণ টানতে, এই ভীষণ স্রোতের মধ্যে হাল ধইরতে?

আরে আমি যে পাটনাতে ছিলাম। কত বড় গঙ্গা সেখানে। কোম্পানীর মস্ত স্টিমার এপার ওপার করাত যাত্রীদের। মস্ত চর ঘুরে। আর আমি পারাপার করতাম আমার ডিঙ্গি নৌকোতে। বর্ষার সেই গঙ্গার রূপই আলাদা। উত্তরের বিহার আর দক্ষিণের বিহারের মধ্যে ঐ নদী পড়ে। এখন অবশ্য ব্রিজ হইয়ে গেচে।

কী করতে তুমি সিখানে? হোসেন উৎসুক গলায় শুধালো।

স্টিমার-ঘাটায় ধুলিয়ানের বাচ্চা বাবু ছিলো। টকটকে সাহেবের মতো রঙ গায়ের। তাঁর দু-দুটো স্টিমারও ছিল সেকানে। তাঁরই কাছে কাজ করতাম। স্টিমারেও কাজ করেচি। বাষ্পে চলে সেই স্টিমার। ইয়া পেল্লায় কয়লার উনুন। তার উপরে আরো পেল্লায় কেতলির মত বয়লার-এ জল গরম হয়। আর সেই বয়লার থেকে বাষ্প বেরোয়। সেই বাষ্পই ঘোরায় স্টিমারের কাঠের চাকা।

পুরোনো জীবন ছেইড়ে দে' নতুন জীবনে এলেই না নতুন নতুন জিনিস শিকতি পারবে।

বলেই, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সারেং বললো, তুমি ককনও সার্কাসের খেলা দেকেছো হোসেন ভাই?

হ্যাঁ। দেইকিচি।

তবে তো দেকেইচো। ট্রাপিজের খেলাতে দেকেচো ঐ উঁচুতে কেমন করে একটি দোলনা ছেড়ে দিয়ে এক লাপ দে অন্য দোলনাতে চইলে আসে খেলোয়াড়েরা কিংবা একজনের হাত ছেড়ে অন্যজনের দুহাতে নিজের শরীরের সব ভার সঁইপে দেয়? দেকোনি?

দেকিচি।

অমনি করেই এক জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে চলে আসতি হয় রে ভাই। তবে না মজা।

যদি পইড়ো যাই? শূন্যে? তবে কি আর বাঁইচবো?

হো হো করে হেসে ওঠে সারেং মিঞা। বলে, মিঞাভাই, যিখানে

মরার ভয় নাই, সবকিছু হারাবার ভয়ই নাই, সিখানে নতুন জীবনে ঢুইকে মজাটা কি? আরে মওত্ তো আছেই! দুনিয়ার নেয়ামতে মানুষের ইন্তেকাল তো হবেই। কিন্তু জিন্দগীটা এমন করেই বিতানো উচিত হয় ইনসানএর যাতে ইনসানিয়াৎ জবরদস্ত হয়। নইলে, বেঁচে থেকে লাভ কি বলো হোসেন? আদমী কথাটাই এসেছে "আদম্" থেকি। আদমের জীবন থেকি নিজের জীবন যদি এট্টু অন্যরকমই করতি না পারলে তবে ইন্সান্এর জীবন নিয়ে জন্মে লাভ কি?

গঙ্গা নদী তোমার ভালো লাগতো সারেং ভাই?

লাগতো না? সব নদীই ভালো। আল্লার দোয়ায় এই পৃথিবীতে কত কী কিস্তি চিজই না আচে। গঙ্গার রূপ, হিন্দুরা বলে "গঙ্গা মাঈ", বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জায়গাতেই আলাদা আলাদা। ঐ গঙ্গা আমাদের ডায়মণ্ড-হাবড়াতে একরকম, পাটনাতে একরকম, বানারস্-এ একরকম আবার হরদোয়ারএ অন্যরকম। গ্রীষ্মে তার রূপ বিবাগী, পীরের মতো তার রাহান-সাহান। আহা! নদী যেন রমজানের রোজা রেকিচে—কী শুখা-ভূখা কিন্তু উজলা রূপ তখন তার। আবার গ্রীষ্মের পর বর্ষা যেই এলো অমনি যেন ইফ্তার খোলা হলো, রোজা খুললো নদী। কী সে জওয়ানী, কী সে জওয়ানীর খুশবু। কত শত ঈত্বরের গন্ধ সে আও-রাতএর যিসম্-এ। ঈত্বর-ঈ-গিলএর সঙ্গে রাত-কী রাণী, রাত-কী রাণীর সঙ্গে ফিরদৌস, ফিরদৌস-এর সঙ্গে হিন্না। আঃ, ভাবলেও বুঁদ হইয়ে যাই।

তারপর বর্ষার পরে শরৎ। হিঁদুদের পূজোর আগেই তার কী নূপ। যেন, নিকাহ'র পরের সপ্তাহের দুল্হীন।

ডিঙ্গি-নৌকো ভাসানো হয়েচেলো ভাঁটিতে। ওরা সমুদ্রমুখী চলেছে। এখনও অনেক নদীনালা বেয়ে সমুদ্রর কাছে পৌঁচতে হবে। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের কোনো কাজ নাই। সমুদ্রেরও কোনো কাজ নাই ওদের সঙ্গে। তবে সমুদ্র দেকেনি কখনও হোসেন। ইচ্ছা আচে ইকবার দেখার তবে, সারেংকে সে কিছুই বলে না। সে লোকটা বড় মত্লবী। মানে, নিজের মতলবে-চলা মানুষ। সেই মতলব-এর সঙ্গে কোনো ফান্দা-

ফিকির বা কু-ধান্দা থাকে না। চরিত্রটাই হতিচে অমনিই। যখন যা মতলব হয় তখন তাই করে।

কথা যখন বলে নিজেই বলে। তাকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করতে গেলেই গুম মেইরে যায়। তখন বড় ভয় করে। অদ্ভুত লোকটা।

রোদের তাপ বেড়েচে। দাঁড় টেনে টেনে এই তিন দিনেই হাত পায়ের পেশী সব শক্ত হয়ে গেছে। প্রথম দিন গায়ে হাতে পায়ে কোমরে বড় ব্যথা হইয়েচিলো। এতো আর বিবির বিলএ লগি মেইরে তালের ডোঙা চালানো লয় যে, একবার লগি মারলে আর নিস্তরঙ্গ জলে ভুসভুস করে ডোঙার মাথাটা চলি গেলো অনেক দূর জলের উপর। এ যে ঘোরা নদী হে! অথৈ জল। জলে স্রোতও বড় কম লয়।

দূরে দেকা যাচ্ছে একটি গেরাম মতো। বড় বড় গাছে ঝুপড়ি হইয়ে আছে দুদিক। এই নদীর বাদা অঞ্চলের দুপাশ বড় রুখু। গাচ-গাচালি নাই-ই বলতি গেলে। চাষবাসও তেমনি হয় বলি তো মনে হয় না। মনে হয় মাটিতে লবণ আচে। নদীর দুপাশ যদি ন্যাড়া থাকি, জমিতে ফসল না থাকি কোনরকম, তাইলে মন বড় খারাপ লাগে। এইকেনে যে আদৌ গাছ-গাছালি আচে সেইটিই অবশ্য চিত্তির!

ডিঙি আস্তে আস্তে আগু যাইতিচে। জলের মধ্যি ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ করে আওয়াজ উঠচে। কখনও দুজনেই দাঁড় বায়। কখনও একজনে দাঁড় বায়, অন্যজন হাল ধরি বসি থাকে।

কী গাছ হে উটা? কক্‌খনো তো দেকিনি আগে।

হোসেন বললো।

ইখানে যি সব গাছ দেখবে তা অন্য কোথাওই ককোনো আগে দেকোনি। এ হলো নোনা জলের নোনা মাটির গাছ। সোঁদরবনে জোয়ারের সময়ে জল পনেরো থেকে কুড়ি ফিট উঁচা হয়ে উঠে। জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে জল চলি যায়। নদীর পাশের গাছ, লতা, ঝোপঝাড়ের আদ্দেকটা ডুবে যায়। কারো কারো বা ডোবে তিনের দুই ভাগ। তখন মনে হয়, পুরো সোঁদরবনই বুজ্জি একটো ভাসানো বাগান। আহা! তার কী সুপ গো!

জানোয়ারেরাও কি ডুইবে যায় নাকি ?

সারেং মিঞা হেসে ওঠে হোসেনের প্রশ্নর ভঙ্গীতে।

লোকটা যখন হাসে, তখন ভারী সুন্দর দেকায় ওকে। মুখের মধ্যে ঠোঁট আর চিবুকটি ভারী সোন্দর। দাঁতগুলানও। লোকটা যে কত বড় সুপুরুষ তা হাসলেই শুধু বোঝা যায়!

কই, দোস্ত কিচু বইলচো না যে!

জানোয়ারেরা ডুবে যায় না। জঙ্গলের মধ্যি মধ্যি উঁচু ডাঙ্গা জমি থাকে। তাদের বলে ট্যাঁক। অন্য নামেও ডাকে, জায়গা-ভেদে, মানুষের আবাস ভেদে। জোয়ারের সময় জানোয়ারেরা ঐ সব ট্যাঁকে গিয়ে জোটে। তাছাড়া এমনও অনেক ডাঙ্গা আছে, যিখানে জোয়ারের জল মোটে পৌঁচয়ই না। আল্লার দুনিয়ায় ইন্‌সান আর জানোয়ার যখনই পয়দা হয় তখনই তাদের রিযক্‌এর ইন্তেজামও ঠিক হয়েই থাকে। রিযক কা মালিক আল্লাহ্ হ্যায়।

ডিঙ্গিটা এবাব গাছগুলির কাছাকাছি চইল্যে এলো।

হোসেন বিস্ময়ে স্বগতোক্তি করলো, আরে এমন গাচ তো দেখিনি আগে!

হাঁ দোস্ত। কোলকাতায় হিঁদুদের মড়া পোড়াবার শ্মশান আছে একটা। নাম কেওড়াতলা। নাম শুইনচো ককনও ?

না। আমি শুনিনি।

স্টিমার কোম্পানীতে আমাদের মেট ছিলো লক্ষমন পাঁড়ে। ব্রাহ্মণ। ভারী ভালো মানুষ ছেলো। দিনরাত পূজা-পাঠ করতো। দেখা হলেই বলতো, জয় রামজী কি। আমি বলতাম ওয়াস্‌সালাম ওয়ালেকুম্। পাঁড়েজী খুব হাসতো।

সেই পাঁড়েজী, রামখেলাওন পাঁড়ে, একবার কালীঘাটে পুজো দেবে বলে খুব ধইরলো। আর নিজে শুদ্ধাচারী কট্টর ব্রাহ্মণ হলি কী হয়, ধরলো এই মোচলমানের পো, আমাকেই।

বললো, তুমি মিঞা তো তামাম দেশে ঘুরেচো। আমাকে চলো সঙ্গে নে।

ভাইবলাম, নাখুদা মসজিদে আমিও নামাজ অদা করিনি বহুদিন। নামাজ অদা করে রয়্যাল হোটেলে বিরিয়ানি খেয়ে, একটু সুর্মা, ঈত্বর কিনে ফিরবো।

তখন আমি পাটনা ছেড়ে দিয়েচি। বাচ্চা বাবুর কাজ করি সকরিকলি ঘাটে। পাঁড়েজীও সিকানেই ছেলো। দার্জিলিংএর ট্রেন, উত্তর বাংলার আসামের ট্রেন, বিহারের সুমাল এলাকার সব জায়গা, মানে গঙ্গা কি উস্‌পার ; মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মুজাফ্‌ফারপুর ইত্যাদি ইত্যাদি পেত্যেক জায়গা থেকিই সকরিকলিঘাটে, নয়তো পাটনাতে গঙ্গা পেরুতে হতো। পাটনাতে থাকতে তো ঈত্বর, সুর্মা, তিলের রেউড়ি, বাখ্‌খরখানি রোটির কম্মী ছিলো না কোনো। কিন্তু ঐ সকরিকলিতে এসিই একটু সান্নাটা জীবন হলো। ধু-ধু বালির মধ্যে ডেরা। নয়তো স্টিমারে থাকা। সেও জব্বর এক জীবন। বিলকুল দুসরা কিসিম্‌কি জিন্দাগী।

শীতকালে দূর দূর দেশ থেকে রঙ-বেরঙের বত্তক আসতো নদীতে। আর তখন শিকারে আসতেন কলকাতা থেকে বড় বড় রহিস্ সব বাবুরা।

আমাদের নস্করবাবুদের মত রহিস্? হোকেন বইললো।

আরে! বাঘের সঙ্গে চুহার তুলনা। এরা কী আর তাঁরা কী। তোমাদির গোটা পঞ্চাশ নস্করদের ওঁরা একেকজন চাকর রাকতি পারেন।

তাপ্পর ?

তাপ্পর খানা-পিনা-ফালানা-ঢাম্‌কানা বড়া ঝুম্ চলতো বেশ কয়েক-দিন। বাচ্চা বাবু আমার হিফাজতে দিয়ে দিতেন শিকারীদের! অন্য সব কাজ থেকে ছুটি হয়ে যেতো সি ক'দিন। মজাসে খেতাম-দেতাম, শিকার খেলাতাম। কুমীরও দেকা যেতো মাঝে-মাঝে। নদীর চরে রোদ পোয়াচ্ছে।

মাঝে-মধ্যি কলকাতার রহিস ব্যারিস্টার মিত্তির সাহেব আসতেন। বহত্‌ বড়া-দিলএর মানুষ। তার উপর যেমন এত্‌লাখ তেমনই তমদ্দুন।

সাহেবের নওজওয়ান লেড়কা তো একবার এক বিরাট কুমীরকে দিলো গুলি করে। তাপ্পর নওজোয়ানী উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে দৌড়ে

নেমে গেলো নৌকো থেকি বালির চড়ায়। আমি তো নৌকোর গলুইতে মিষ্টি মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে হুঁকো খাচ্ছি আরামসে। ভারী ভালো তামাক আনাতাম পাটনা থেকে। আমার এক দোস্ত্ পাঠিয়ে দিতো। কুমীর তখন গুলি খেয়ে এঁকেবেঁকে জলে নেমে যাবার কওশিস করচেলো। এমন সময়েই এক দিল্-তোড় চিৎকার। একেবারে ইয়াকাইকাক্! চমকে চেয়ে দেখি, কুমীরের ল্যাজএর বাড়ি খেয়ে ব্যারিস্টার সাহেবের লেড়কা তো দশ ফিট উপরে ছিট্‌কে উটেচেন হাত-পা চারদিকে ছিটিয়ে। দেখি, ছিটকে পড়েছে তাঁর বন্দুকও। দূরে। আর উনিও উপর থেকে এসে নীচে ধপ্পাস করে পড়লেন চরের উপরের বালিতে। দু-হাত দূরেই জল। এদিকে কুমীর জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে, মতলবখানা, চোট খেয়েছি খেয়েছি, দুশমনকে মুখে করেই লামবো। টেনে নে যাবো জলের নিচে।

গুলিটা লেগেওছিলো বে-জায়গাতে। বে-জায়গাতে গুলি লাগলে কুমীর কখনওই মরে না। তাকে বা-কায়দা বা-ইযযাত্ গুলি ঠুকতে হবে। কুমীরের শরীরের গড়ন সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই।

তাপ্পর? তুমি কি কইরলে সারেং ভাই?

হোসেন উৎসুক গলাতে শুদোলো।

কী কইরবো! দৌড়োলাম লাপ মেরে নৌকো থেকে নেমে এক নিঃশ্বাসে। প্রথমে বন্দুকটার দিকে দৌড়ে গেলাম। বন্দুকটা তুলে নে দু লাপে কুমীরটার কাচে পৌঁচলাম। কুমীর আর শিকারীর মধ্যে ফাঁক তখন চার কদমের। বন্দুকটা প্রায় কুমীরের ঘাড় আর গলার নরম জায়-গাতে ঠেকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে দিলাম টেনে ট্রিগার। ট্রিগার টেনেই আর এক হ্যাঁচকা টানে তো শিকারীকে কুমীরের মুকের সামনে থেকিও সরালাম।

গুলি খেয়েও কুমীর থামলো না। বিরাট কুমীর! সে তার রক্তে শীতের গঙ্গার জল লাল করে নেইমে গেলো নদীতে।

তাপ্পর? দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিলে? পেইলে না কুমীরটাকে আর?

সেই কুমীর পরের দিনের সকালে ঢেউয়ে ফিরে এইলো ভাসতি ভাসতি। সকরিগলিতে।

কুমীর পেয়ে তো শিকারী আর তার বাবা ব্যারিস্টার সাহেবের খুশি ধরে না। আমাকে বা-কায়দা বা ইযযাত বহুতই পেয়ার-তুল্হার করে এক হাজার টাকা দিয়েচিলেন। আর একটি বন্দুকও। ইনাম। উনিই লাইসেন্সও করে দেচিলেন। লাইসেন্স বিহারেরই ছেল। ইকস্পায়ার করি গেচে সে কবে। এখন বে-পাশী বন্দুক। সেই থেকেই আমি বন্দুকবাজ। শিকারী। টুকটাক শিকার করি। তবে শিকার করতি আমার ককনওই ভালো লাগে নি।

কেন?

কে জানে কেন? বন্দুকটা সঙ্গে থাকলি ভরসা পাই এই পর্যন্ত।

ওদের নৌকোর গতি এবার কমে এলো। কারণ হোসেন জল থেকি দাঁড় তুলে নেচিলো। সারেং মিঞা এবারে হালে বসি ডাঙ্গার দিকে মুখ কইরলো নৌকোর।

হোসেন বললো, কোথা থেকে কোথায় এলে মিঞা? হাল বুঝি ছেইড়ে দেচিলে?

সারেং হেসে বললো, কুতায় এলাম। এই গাছতলাতেই তো নোঙর করবো। রাঁধবো-বাড়বো। খাবো। তাপ্পর বিকেলে ভাঁটি দিলে নৌকো ভাসাবো। এখন উজোনে যেতি কষ্ট হচ্ছি বেজায়। রোদও তো চড়া হলো।

হোসেন বইললো, তারপর বলো, পাঁড়েজীকে কালীঘাটে ফেইল্যে তুমি তো ফের সকরিগলিতেই চইলে এলে? পাঁড়েজীর কি হলো? আর কেওড়াতলার?

সারেং মিঞা হাসলো।

বললো, ঠিক বইলেচো।

তা পাঁড়েজী তো কালীঘাটে পুজো দিতে এইসে কলেরা হয়ে কালীঘাটেই মারা গেলো। কোনো হোটেলে চিংড়িমাছ খেয়েছিলো লুকিয়ে। এদিকে চিরদিনের নিরামিষাশী। তার পেটে কি সয়? তাও

আবার পাপ-খাওয়া! গরমের দিন ছেলো। তার আত্মীয়-স্বজনদের ভবানীপুরে খবর দিয়ে এলাম। তাকি পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েচিলো কেওড়াতলাতে।

তার সঙ্গে ই গাচটির সম্পক্কটা কি?

হোসেন বললো, অধৈর্য গলাতে।

আরে দোস্ত্‌! এই গাছটাও তো কেওড়া গাছই। না কি? তার মানে, এক সময়ে এই কলকেতা শহরটাও সোঁদরবনের মধ্যিই ছেল। নইলে শ্মশানের নাম কেওড়াতলা হবে কেন? দখিনে কেওড়াতলা আর উত্তরে নিমতলা।

হোসেন কিছু বললো না। সারেঙের কথার সত্য-মিথ্যে যাচাই করার জ্ঞান তার বা তার জানাশোনা অন্য কারোরই ছিলো না।

এগুলো কি? মাটি ফুঁইড়্যে উঁচু উঁচু হইয়ে আচে? আওরেঙজেবের তরোয়ালের মত?

হোসেন শুধোল সারেং মিঞাকে।

সারেঙ হেসে ফেললো হোসেনের কথা শুনে।

বললো, আরে দোস্ত, এগুলোকে বলে শূলো। শিকড় আসলে। এরা মাটি ফুঁড়ে এমন তরোয়ালের মতো উঠে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নেয়। অক্সিজেন বোজো তো?

না। সিটা আবার কি?

আরে, ঐ হাওয়ার মধ্যির প্রাণ। অক্সিজেন না হলি আমরা বাঁচিই না। খুবই জরুরী জিনিস বুঝেছো?

ইদিকে ই গাচ তো আর দিকতিচি না। কোনো গাচই তো আর নাই। ঐ কেওড়া না কী নাম বললে যার?

না, নেই। ঐ ছ্যাকো, নদীর পাশে কত বড় ফাটল। ঐ ফাটল দে জল জোয়ারের সময় ঢোকে। আবার ভাঁটার সময় বেইরে যায়। এই গাছের এই শূলোরা জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়। গাছের গুঁড়িও ডুবে যায়। এইকানে নোনা জল ঢোকে বলেই কটা গাচ হয়েচে।

কী আশ্চর্যি!

হোসেন বললো।

আশ্চর্যির তো এই শুরু হোসেন ভাই। আম্মীজানের বা বিবির আঁচলের নিচে শুয়ি থাকলি কি মরদের চলে? আল্লা এতোবড় ছুনিয়া দেছেন আমাদের। ঘুরে বেড়াতে হবে বৈকি। দেশ বেড়ানোর মতো আর কি শিক্ষা আচে? তবে হ্যাঁ। চোখটিও থাকা চাই। দেখতি জানা চাই, শুনতে জানা চাই, আর চাই দিল্। শুধু দিল্ থাকলিই হবে না, সেই দিল্ পুরোপুরি ভরে থাকা চাই ইযযাত, এহতেরাম আর মোহাব্বতে। তবে না হবে! তুমারও হবে। হবে। হবে। হবে, ইন্শাআল্লা।

সারেং মিঞা কেওড়া গাছের ছায়াতে নৌকো লাগিয়ে গাছের ডালে নৌকোর দড়ি বাঁধলো। দেখলো, আরো দু-তিনটি নৌকো বাঁধা আছে সিকানে।

সারেং বললো, আপনারা কতদূরের যাত্রী?

আমরা যাচ্ছি চাম্টাতে কাঠ কাটতে।

কোন্ চামটা? বড় না ছোট?

বড়।

এতো দেরি করে? সকলে তো গরম পড়তে পড়তেই যায়।

তা যায়। আমাদের দেরি হয়ি গেলো। তবে যা সব শুনতেচি তাতে এবার না বেইরোলেই বোদয় ছেলো ভালো।

কেন? কি শুইনলেন আবার?

বড় চামটায় নাকি এমনই উপদ্রব বাঘের যে, সব জেলে-মৌলে-কাটুরেরাই পাট গুটায়ে নে যে যার গেরামের দিকে পাইলেচেন।

তবে? এসব শুনিও আপনারা যেতিচেন কেন?

হায়? খাবো কি? ঘরে যে কিছুই লাই। যে-কাজ জানি, যে-কাজ এতো বছর ধরে পুরুষের পর পুরুষ কইরে আসতিচি তা না কইরে আর করি কি? বর্ষা এইলে তো সবই গেলো। তখন ঘরেই বইসে বইসে খেতি নাগব। একনও না বেইরোলে তো বাল-বাচ্চা নে উপোস যেতি হবে।

তোমার নাম কিগো মাঝি?

কলিমুদ্দি। আমরা ই অঞ্চলে লতুন।

আগে কোতা যেইতে ?

সপ্তমুখী।

অ। আর তোমার নাম কি মিঞা ?

আমার নাম কালু মিঞা।

আপনার নামটা কি ?

আবার আপনি এঁজ্ঞে কেন ? তুমি করেই বলা ভালো।

ঐ ছেলেটির নাম কি ?

ওর নাম হোসেন।

আর তোমার নাম ?

আমার নাম সারেং।

সকলে হেসে উঠলো। বললো, সারেং হইয়ে ডিঙ্গি চালাতিচো কেমন ?

ঐ। যার যেমন তকদির।

সারেং বললো।

তাই ? তাড়াতাড়ি ভাত বসিয়ে দাও সারেং। হাওয়া কেরমোশে। জোর হতিচি। এরপর আগুন করা মুশকিল হবে।

হুঁ।

সারেং বললো।

॥ ৪ ॥

উজোন—ভাঁটি গোণ-বেগোণ বুঝে শুনে, রয়ে-সয়ে চলেচে সারেং আর হোসেন মিঞা। কলিমুদ্দি আর কালু মিঞাদের ডিঙিও চলেছে একই সঙ্গে। আকাশে এট্টু এট্টু মেঘ কইরেচে। এই মেঘ, এই রোদদুর। নদীর দু'পাশের জঙ্গল কের্‌মে কের্‌মেই ঘন হতিচে। গাছেরও নেকাজোকা লাই। পাল টাঙায়ে দেচে সারেং মিঞা। হালে বসিচে হোসেন। হুঁকো টানতিচে হুড়ুক হুড়ুক করি সারেং মিঞা। তামাকের মিঠা গন্ধ ভাইস্তে যাত্তিচে হোসেনের নাকির সামনে দে'।

থাকি-থাকিই হোসেন শুধোয়, সারেং মিঞাকে, ইটা কি গাছ? উটা কি গাছ?

হুঁকোয় টান থাইমে সারেঙ গাছের নাম বলে। তাদের "হিসটরী-জিওগ্রাফীও"। এই "হিসটরী-জিওগ্রাফী" কথাটা নতুন শেখা হোসেনের। বাংলাদেশের সেই রিস্তাদারের কাছ থেকে; মামুজান। কত্ত যে গাছ!

নারকেল পাতার মতো দেখতো অথচ ছোট ছোট গোলপাতা গাছ। ঘন। তার মধ্যি বাঘ শুয়ে থাকলি বোঝার জোটি লাই। আর আছে হ্যাঁতাল। তার লালচে হলুদ-রঙা ঝোপের আড়ালেও বাঘের সগ্‌গ। বাইন্, সাদাবনী, সুন্দরী, কেওড়া, বান, কাকড়াগাছ, হেঁতাল, গর্জন, বলাসুন্দরী, গিলেলতা, গোলপাতা—আরো কত শত গাছ। যেন বটানিকালি গার্ডিনেই এইস্তে পড়িচে সে। চোখ বড় বড় করি দেকতিচে চারধারে হোসেন মিঞা।

শক্ত বলিষ্ঠ পেশল ডান হাতখানি শিমুলের ডালের মতো বাঁদিকে ডানদিকে ছড়ায়ে দে পা-জোড় করি বসি লুঙি আর হাতকাটা গেঞ্জী পরা সুপুরুষ তেজস্বী সারেং মিঞা গাছ চেনায় হোসেনকে।

বলে, ভালো করি শিকে লাও বটে দোস্ত। এও ইক পাঠশালা, ইস্‌কুল, কলেজ যা বলো। বনের বিদ্যাও বড় বিদ্যা। এই ইম্‌তেহান্ পাশ করলি ছার্টিফিকেট মেলে না বটেক কিন্তুক এই সোঁদরবনকে ভালো কইরি না চিনে নেলে যে এ বনির মধ্যি আসি সেঁধোয় তার পক্ষে ফেরা কটিন হইয়ে পড়ে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যিই এ বিদ্যে শিক্ষের দরকার। এর মায়া ভারী ভীষণ। এ সুন্দরী যাদু জানে। এর যাদুতে যারা মইজেছে, তারাই জানে এই কথার সারমর্ম।

সারেং মিঞা ঘোর-লাগা মানুষের মতো বলে, মায়াদ্বীপও আছে সমুন্দরের মাঝে। সত্যিকারের নাম হলো। বুইয়েচো। লোথিয়ান্ সায়েবের নামে আচে লোথিয়ান দ্বীপ। ভাঙ্গাডুনি দ্বীপ। এক পাশ পশ্চিমবাংলা অন্য পাশ বাংলাদেশ। আর দুইদিকে পড়তিচে বাংলাদেশের খুলনে আর বাখরগঞ্জো সাব-ডিভিশান।

হোসেন সারেং মিঞার বাড়ানো হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বলে ওঠে, জীবনেব তো বাকি আছে একনও অনেক মিঞা। একনই দরজা-জানলা বন্ধ করো কেন?

ভা করি না। তবে এই নোনা হাওয়ার গন্ধে বুঝি আমি। সমুদ্রের গায়ের গন্ধ ঠাহর কইরতে পাই, কত্তদূর দৌড় আমার। তাছাড়া, কথাটা কি জানো দোস্ত, একটা বয়সি পৌঁছে পেত্যেক বুদ্ধিমান মানুষই বুইজতে পেরে যায় যে, একই জীবনে, একই নৌকোর হালে বসি, অথবা দুখানি পায়ে, কী মোটরের চারখানা চাকা নে মানুষ এই বিপুল দুনিয়ার কতটুকুই বা দেখতি পারে? ক'টি জায়গাতেই বা যেতি পারে? একটা বয়সির পর তাই থম্ মেরি বসি যেতি হয়। নিজের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির নক্‌সীকাঁথা মুড়ি দে বসি বসি ভাবতি হয়। কী কী দেখা হইলো এই জীবনে সি সব কতা। সেই বুনোট জালের মধ্যে কল্পনার রসও মিলিয়ে দিতে হয় রঙেরই মতো। দৌড়ে বেইড়ানো, সব্বোসময় উজোন-

ভাঁটিতে ভেসে বেড়ানো আর মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা যে একই বাক্যি লয়, সি কথা পরানের মধ্যে বোঝার মতো শক্তি যখন আসে তখন মানুষ ইকেবারে শান্ত হইয়ে যায় গো। ক্লান্ত হইয়ে পড়ে। ছট্‌ফটানি কইমে যায় তার বুকের ভিত্‌রে। সে যে মানুষ, সে যে পাখি লয়, বাঘ লয়, কুমীর লয়; সি যে লদী লয়, আকাশও লয়, বাতাস লয়, সি কথাটার বুকের ভেতরে যে শান্ত সত্য আছে, যা চিরদিনের সত্য, তাকে তকন সেই মানুষে তার সুনসান্‌ বুকের ইক্কেরে মদ্দ্যিখানটিতে বুইজতে পারে।

হোসেন মিঞা হুঁকোটা সারেং মিঞার হাতে ফেরত দিয়ে বলে, তুমি যে কী বলো, আমি বুঝি না কিছু সারেং মিঞা। অত ভারী ভারী কথা হজম হয় না আমার। একটু জোলো কইরে, হালকা কইরে বলো।

সারেং মিঞা হাসে হোসেনের কথা শুনে।

তাপ্পর দুজনে চুপচাপ। এ ওর কথা ভাবে; সে, তার কথা। জলের মধ্যে গানের শব্দ হয়। নিরবধিকাল ধরি জল চলে। রোদে পড়ে চকচক করে জল। আলো প্রতিসরিত হয় বনের পাতা-লতায়, পাল-খালের নরম পলিতে, সুঁতি খালে। ভারী ভাল লাগে হোসেনের। হাসে আর বলে, হবে হবে। সময়ে সব হবে গো। সব হবে। ভাবী-জীবনের লোভেই না দোস্ত জলপিপির জলার, তোমার গেরামের পাশের বাদার, ডিঙ্গি-বাওয়া হালকা জীবনের হাত ছাইড়্যে আমার সঙ্গে ভেসি পড়লে। ভারী জিনিসের এক্তিয়ারে এসি পৌঁচতে, ভারী জীবনের দরিয়াতে নাও বাইতে সময় লাগেই। খুদাতাল্লার ইচ্ছা তেমনই! তবে কথা কি জানো দোস্ত? এ পথে বাধা অনেক। বাধাটা সাপের বা কুমীরের বা মানুষখেকো বাঘের বা তুফানেরও লয়।

কোন্‌ বাধার কথা কতিচো তাতো বুঝি না মিঞা।

বুইজবে বেটা বুইজবে। সময় হইলেঁই বুইজবে। এ বাধা অন্য বাধা। খুদার নাম করি তো আজান পড়া হয় সব মসজিদেই, সব মোল্লাই তো খুদাহর খিদ্‌মদ্‌গার, ফজির থেকে ঈশার নামাজ তো আমরা সবাই পড়িও কিন্তু খুদাতাল্লাকে সত্যি সত্যি আমরা কজন জানি বলো? কজন

জাইনতে পাই। এ পথে বাধা অনেক, অনেকই শত্রুতা। জানবার জন্যিই তো এতো হন্যি হয়ে খোঁজাখুঁজি। না কি বল? তবে কথাতে বলে না?

"মুদ্দয়ী লাখ বুঢ়া চাহে তো কেয়া হোতা হ্যায়
যো মঞ্জুরে খুদাহ্ হোতা হ্যায় ওহি হোতা হ্যায়।"

মানে কি হলো?

আরে মানেটা হতিছে, হর-ইন্সানের দিল্এর মধ্যে ভালো করে বুইঝবার। খুদাহ্র প্রতি যার ঠিকঠাক বিশ্বাস আছে, যে মানুষ আল্লাকে নিজের কইলজেতে ঠিকঠাক আসন করে দিতে পেইরেছে সেই জানে যে, তার জীবনের পথে, তার নিশানাতে পৌঁছতে লক্ষ বাধা আসবে, লক্ষ শত্রু শত্রুতা করবে, কিন্তু লক্ষ শত্রুও যদি তার খারাপ চায়, তার ক্ষতি কামনা করে তাতেও কিছুই যাবে আসবে না, যা খুদাহ্ চাইবেন, যতটুকু খুদাহ্ মঞ্জুর করবেন, তা হবেই। আর শুধু তাইই হবে। এই বিশ্বাস যার কলজেতে আছে তাকে রুকে রাখবে এমন জোস্ এমন তাকৎ পৃথিবীর কোনো শত্রুরই নেই।

হোসেন স্তব্ধ হয়ে গেলো সারেং মিঞার কতা শুনে।

সারেং মিঞার মধ্যে যেন কোনো পীরের বাস। এমনিতে সে মানুষটাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। ককনও ককনও, ক্কচিৎ সেই লুকিয়ে-থাকা মানুষ বা ফকির বা খুদাহ্র অবতার বাইরে বেরিয়ে আসেন। সেই তিলেক সময়ের সারেং মিঞাকে দেখলি, তার জ্বলজ্বলে দুটি চোকে চোক রাখলি, তার সমস্ত মুখমণ্ডলময় যে এক কুদর্তি রওশনী ফুটে ওটে ফজিরের আসমানের পবিত্র আলোর মতো, তকনই বোঝা যায় যে এই ইনসান বা পীরকে বাইজ্জত বাকায়দা খাতির না করলি খুদাহ্র কাছে বড় গুণাহ্ হবে।

ঐ সময়টুকু পেরিয়ে গেলেই আবার সারেং মিঞা সাদামাটা জান্-চিন্ সারেং মিঞা!

হাওয়াটাতে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব লেগেছে। সামনে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বোধহয়।

হোসেন ছইয়ের ভিতর থেকে নীল-রঙা হাফশার্টটা নিয়ে আসে। দুধারে জঙ্গল এবারে কেরমোশোই গভীর হতিচে। বড় নদী ছেইড়ে একটা খালের মধ্যে ঢুইক্যে পইড়েচে একে একে নৌকোগুলো। সামনের নৌকোর কলিমুদ্দি আর কালু মিঞারা টুক-টাক কথা বইলতেচে। তামাক খেতিচে। তাদের গলার স্বর আর তামাকের গন্ধ ভাইসে আসতিচে আলতো হয়ে ফিনফিনে হাওয়ায়। খাল ক্রমশ সরু হতিচে।

শিষ খাল এ ঢুকেচে ওরা। এই সরু খালদের শিষ খাল বা সুঁতিখাল বলে। কলিমুদ্দিরা বলাবলি করছিল। এখন ভরা-জোয়ার। মেলা মাছ ঢুকতিচে জলের সঙ্গে। মাছরাঙা আর বকেরা ঝাঁপাঝাঁপি করতিচে।

দুপাশের জঙ্গল, মনি হয় ইবারে দুটি হাত দে গলা টিইপ্যে ধইরবে ওদের। এমনই ভাব। আলোও ক্রমশঃ পড়ি আসতিচে। এমন সময় খালে একটা বাঁক নিতিই হোসেন মিঞা দেইকতি পেলো খালের দু পাড়ে শুকনো ডালের সঙ্গে ফালি ফালি নোংরা ন্যাকড়া বাঁধা। কোনো ডালটা বা নুইয়ে পইড়েচে, কোনোটা বা বেঁইকে গেচে। তবে বেশি লয় ; তিন চারটে ডাল অমন।

কলিমুদ্দিদের নৌকোতে এক বাঙাল মাঝি চেলো। সে বইলে উটলো, ঝাম্‌টি রে ! ঝাম্‌টি। খাইছে !

কলিমুদ্দি নৌকোতে দাঁড়িয়ে উটে, এক হাতে ছই ধরে, পেছন পানে মুখ ঘুরিয়ে বইললো, ইকানে নোঙর করা তো যাবেনি সারেং ভাই। কি বইলতেচেন ?

মুখে কোনো কথা না বলি সারেং মিঞা মাথাটা দুদিকে ঘোরালো দুবার। এপাশ ওপাশ করি, কেনিং শহরের মাদ্রাজী বড়ার আর দোসার দোকান্দারের মতো।

সবকটি নৌকো ছায়াচ্ছন্ন খালটি পেরিয়ে চললো ছপাছপ দাঁড় ফেলে, সারি ধরে, পাল টাঙানো থাকা সত্ত্বেও।

ঝাম্‌টিটা কি জিনিস গো মিঞা ?

হোসেন অবাক হয়ে শুধোলো।

বড়মিঞা ! বড়মিঞার নিশান।

বড়মিঞা মানে বাঘ। সোঁদরবনের মদ্দি বাঘকে কেউ নাম ধরি ডাকে না। যেখানে যেখানেই ঝামৃটি পোঁতা আছে দেকচো দোস্ত, জানবে সি সব জায়গা থেকিই বাঘে মানুষ নিয়েচে।

একই দিনে? একই খাল থেকে?

হ্যাঁ। একই খাল থেকে। তবে, না, একই দিনে নয়, দেকলে না ঝামটিতে বাঁধা ন্যাকড়াগুলো! ওর মধ্যে একটি দিন সাতেকের পুরোনো হবে। অন্যগুলির একটি প্রায় একমাস আগের। অন্যটি, সম্ভবতঃ গত বছরের। যে জেলে, বাউলে বা মউলেদের নৌকো থেকে বাঘে মানুষ নেয় তারা ঐ ঝামটি পুঁতে, চিহ্ন দিয়ে অন্যদের সাবধান করে দিয়ে যায় যে, এই খালে মানুষখেকো বাঘে মানুষ নিয়েছে। একানে যেন কেউ নোঙর না করে।

নৌকো থেকেও মানুষ নেয় বাঘে?

সবসময় যে নৌকো থেকেই নেয় তার কুনো মানে নেই। জেলে মউলে কাঠুরেদের মধ্যে কারোই তো নৌকোয় বসে থাকলি চলে না। নৌকো বেঁধে দে কেউ গাছ কাটতি যায়, কেউ যায় মধু পাড়তি। নৌকোতেও অবশ্য থাকে কেউ কেউ।

কেউ কেউ খালেই মাছ ধরে। কেউ বা নৌকোতে বা নৌকোর সঙ্গে বাঁধা ডিঙ্গি নৌকোতে রান্না করে, মশলা বাটে।

যেখানে বনের মধ্যে মধ্যে মিষ্টি জল আচে, কেউ বা সেই মিষ্টি জল আনতি বনের ভেতরে চলে যায়।

রাতের বেলা হারিকেনের ফিতে কমিয়ে রেখে নৌকোর পাটাতনের উপরেই শুয়ে থাকে তারা সকলে পাশাপাশি। পালা করে পাহারায় থাকে। মুকে কথা বলে না কোনো। সুন্দরবনের বাঘ পিরথিবীর আশ্চর্যি। মানুষের গলা শুনতে পেলি তারা দূরে না গিয়ে, কাচে আসে।

বাঘেদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে কিছু থাকে না ওদের কাছে?

হোসেন শুধোলো।

থাকে। অস্ত্রর মধ্যে লাঠি, শড়কি আর বুকের দুর্জয় সাহস। দু একটি নৌকোতে আমার মত বে-পাশী বন্দুক-টন্দুকও।

বন্দুক যাদের কাচে থাকে, তারা তা চুরি করে হরিণ মারার জন্যেই ব্যবহার করে। সুন্দরবনের বাঘ এমনই জানোয়ার যে বন্দুক ব্যবহার করার সুযোগও তো বড় একটা দেয় না। পাশী বা বে-পাশী বন্দুক থাকে কম নৌকোতেই। তবে পট্‌কা থাকেই।

কি পট্‌কা? পট্‌কা কেন?

আছাড়ি পট্‌কা। রেঞ্জ অফিস থেকে দেয়। প্রত্যেক রেঞ্জ অফিস থেকেই। যে দিক দিয়েই বনে ঢোকো না কেন।

কেন দেয়?

দেয়, বাঘকে ভয় পাওয়াবার জন্যি। অথচ তার ফল হয় ঠিক উল্টো। এরা সাক্ষাৎ যম। পট্‌কার আওয়াজ শুনে বরং বুইজে নেয় মানুষ কোথায় আচে। আওয়াজ শুনে কাচে আসে মানুষ ধরার জন্যি।

আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন বনে দুধারে ঝাম্‌টি-পোঁতা খাল পেরোতে পেরোতে হোসেনের একবার আম্মীজানের মুখটা মনে পড়ে। অন্য একজনের মুখও। হিঁদুবাড়ির ডুরে-শাড়ি পরা মেয়ে অলির মুখটি। মনে পড়ে, আসন্ন সন্ধ্যার আগের তার গ্রামের রূপটি। মাত্র দু-রাত দুদিনে এক অন্য জগতে পৌঁছে গেল এসে। ভাবলেও অবাক লাগে। সেই নিরাপদ জীবনের শান্ত পরিমণ্ডলের কথা, জলপিপির জলার সকাল বিকেল, চেনা গন্ধ, চেনা-স্বাদ, চেনা-ঘর, চেনা-বিছানা, পাশ-বালিশ, গল্-তাকিয়া।

হোসেনের মনটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিজেকে দোষ দেয়, কেন এমন হঠকারিতা করলো, কেন এলো সারেং মিঞার সঙ্গে!

সারেং মিঞা যেন হোসেনের মনের কথা বুঝতে পারলো। জলের উপরে-পড়া সন্ধের আকাশের রঙের মতো এক আশ্চর্য হাসি ছড়িয়ে গেলো তার মুখে।

সারেং মিঞা বললো, আসল যে মরদ তার জায়গা তো ইকানেই। ঘরে, আরামে, সহজে সংসার যারা করে তারা তো করেই। খুদাহ্ কিন্তু সামান্য কিছু মানুষকে বেছে নেন তাঁর জিম্মাহ্‌দারীর জন্যে। তেজারাত্,— যারাআত্ করার মতো আদমের তো অভাব নেই দুনিয়াতে কিন্তু জোশ্ আর জেসারাত্-এর চিঙ্গারী তো কম মরদের মধ্যেই থাকে।

হাতে হাতিয়ার নিয়ে জঙ্গ্‌এ সামিল হলেই যে কেউ বীর হয় এমনই নয় হে দোস্ত। চেয়ি দেকো, এই সব সাধারণ মানুষদের দিকে, যারা নিজেদের বিবি আর বাল-বাচ্চাদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেবার জন্যে নিজেদের জানের পরোয়া না করে, এমনি করেই মাছ ধরতি, কাঠ কাঠতি, মধু পাড়তি প্রতিবছর কী দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে লুঙি-গামছা আর একটু চাল ডাল নুন তেল আর মিঠা-পানি সম্বল করি এই দোজখ্‌এ আসে ফিরে ফিরে। ইদের মদ্দি অনেকেই ঘরে আর ফিরবে না জেনিও। এরাই তো হচে আসল যোদ্ধা। অস্‌লি ইন্‌সান। এদের পাসীনার আর খুনের মধ্যে দিয়েই ইনসানিয়াত্‌এর ইম্‌তেহান্‌ চলছে হরওয়াক্ত। খুদাহ্‌ই জানেন এদের চেয়ে বড় সেবক তাঁর আর কত জন আছেন। রুজির মালিক আল্লাহ—রিযক্‌ কা মালিক আল্লাহ হি হ্যায়। কিন্তু ঘরে বসে থাকলি তো আল্লাহ তোমার রুজি জুটিয়ে দিবেন না। দ্যাকো হোসেন, তোমাদের মতো সুখী, ছক-বাঁধা বাদা-বিলের জীবনের মানুষদের এদের দেকে অনেক কিচুই শেকা উচিত। রাবব্‌ সবকা হায় কিন্তু আল্লার সাধনা কত ভিন্নরকম হতে পারে তা নিজের চোকেই দেকে নাও।

হোসেন বললো, সারেং মিঞা, আমার ভয় যে কইরছে তা ঠিকই। কিন্তু আমি ভাবতিচি তুমি এমনি কইর‍্যে কেন এই বিপদের মদ্দি ঘোরো? তোমার পেরোজনটা কি চেল? সুকে থাকতি ভূতের কিল কেউ খায়?

সারেং মিঞা হাসলো।

বললো, ঐ। ঐ তো হলো গিয়ে কত্া দোস্ত। কার যে কিসে সুক তা কে বলতি পারে? এখ্যানে বাঘ অসহায় মানুষের পেছনে পেছনে ঘোরে। বাঘ হচ্ছে জুরম্‌, অপরাধী; আর খুদাহ্‌রই ইচ্ছানুযায়ী আমি হয়তো বাঘের পেচনে পেচনে ঘুরি, সেই মুজরিম্‌কে সাজা দেওয়ার জন্যি। খুদাহ্‌র হুকুমত্‌এর কথা কে বলতি পারে বল?

নৌকোগুলো ঐ খালটা পেরিয়ে একটি কম চওড়া নদীতে পড়তেই সামনের নৌকো থেকে কলিমুদ্দি মিঞা চেঁচিয়ে বইললো, ইকানেই

থেইক্যে যাই মিঞা। আপনি কি বইলতেচেন?

হোসেনের হাসি পেল। ভাবলো, এই তো আলাপ হলো দুপুরে, এরই মদ্দি এরা সারেং মিঞাকে গার্জেন বাইনে ফেললো দিকি! তা, মনুষ্যিটির মদ্দি কিচুমিচু একটু আচে বৈকি! যে ছ্যাকে, সেই নেতা বলে মেইনে নেয় নিজ থেকে অথচ ত্যানার নিজের নেতাগিরির এম্‌বিশোন্ মোটেই লাই।

সারেং মিঞা মাথা নেইড়ে বললো, রাতে ঝড়জল আসতি পারে হে। ইকানেও নোঙর করাটা ঠিক হবে না কলিমুদ্দি মিঞা। রাঁধা-বাড়াও তো আছে, না, কি? আট্টু এইগ্যে গেলেই নাস্‌রাতের খাল। সেই খালেই থাকাটা ঠিক হবেক।

আপনে যা বইলবেন।

এবার কালু মিঞা বললো।

হোসেন মনে মনে বললো, লে হালুয়া। এরা যেন সব সারেং মিঞার ভরসাতেই গেরাম ছেড়ে বেইরেচিলো। চিত্তির! নাকি চিনতো আগে থেকেই? ভাব দেকালো চেনে না?

রাতে খিচুড়ি রেঁইধেচিলো হোসেন। লাইপে এই পেরথম্। সি কথা সারেং মিঞাকে বইলতেই সি বললো: লাইপে পেরথম্ আরো অনেক কিছুই করার বাকি আছে দোস্ত তোমার। খিচুড়ি রেঁইধেই শুরু হলো।

তবে দেইক্যে দেচিলো মিঞা। কিসের পর কী করতি হবে, চাল ডাল কি করি ভাজতি হবে। সারেং বললো, একন এট্টু ফুটুনি হোক। পরে তো ভাত আর লবণ।

নিজের রাঁধা খিচুড়ি নিজে খেয়ে নিজের পিঠেই নিজে চাপড়ানি দিতে ইচ্ছে গেলো হোসেনের। একন হবে না। রাতে শুয়ে শুয়ে চাপড়াবে।

একন সব নৌকোতেই খাওয়া-দাওয়ার পাটই চুইক্যে গেছে। আশ্চর্য শান্তি একন চারধারে। কে একজন একটা বদনা সরাতে গিয়ে

নৌকোর গলুইয়ে লেইগ্যে যেইতেই এমন এক পেচণ্ড শব্দ উটলো যে অবিশ্বাস্য। সেই শব্দ আবার জলে জলে দৌড়ে চইলে গেল বহুদূর। এখন আবার নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধতা আগে কোনোদিনও জানেনি হোসেন। নৌকোর পাটাতনের গায়ে জলচলার শব্দ উইঠতিচে। একন ভাঁটা দিচে। সড়সড় খড়খড় করে পাতা-পুতা খড়-কুটো ভেসে যেতিচে সমুদ্দুরের দিকে। আকাশময় তারা। তারার নীলচে সবজে আলো জলে পড়ে জলের বুকে নীলচে-সবজে আভা ফুইটিয়েচে। অন্ধকারের মদ্দি দূরের বাঁক থেকি কী একটা পাকি ডেকে উইঠলো বার বার। কী পাকি কে জানে! বুক ছম্‌ছম্ করে উইটলো হোসেনের। সারেং মিঞার দিকে চাইলো পাশ ফিরে। সারেং মিঞা ফিস্‌ফিসে গলায় বললো, বইলব! এ পাকি রাতে ডাকে না। কিচু দেখে, ভয় পেয়ে থাকবে।

পাটাতনের নীচ থেকে লুকিয়ে-রাখা বন্দুকটা বের করলো সারেং মিঞা। ক্যানভাসের কেসটা খুইলে ফেলে টোটা পুরলো দুটো।

তারপর নিজের পাশে শুইয়ে রাকলো।

হোসেন বললো, যদি ফুইট্যে যায় হটাৎ? বাঘ এলি তারপরই পুরলি হতো না?

বাঘের নাম উচ্চারণ করেই ঘেবড়ে গিয়ে বললো, বড়মিঞা, বড়মিঞা।

সারেং মিঞা হাসলো, শব্দ না করে।

বললো, ইকানের বড়মিঞা আসে যমএর মতো। কুনো সাড়া না দিয়ে। তার চেহারা দেখা যায় না, শব্দ শোনা যায় না। যম যারে নেয়, সেই কেবল দেখতি পায় এক ঝলক।

এই বনে কতদিন থাইকতে হবে আমাদিগের?

হোসেন শুধালো। ভয়ে তার বাক্যি রোধ হয়ে এসেচেলো।

যতদিন এরা সকলে থাকে।

সে কতদিন?

যতদিন বর্ষা না নামে।

অতদিন?

হুঁ। অতদিন। তুমি ফিরে যেইতে চাও তো কোনো ফিরতি-

নৌকোতে তোমাকে উইটে দেবোকন। দু একদিনের মদ্দি ভেইবে বইল্যো আমারে। চইল্যে যাওয়াই বোদয় ভালো। সখ করতি এইসে শেষে পৈতৃক পেরানডা দিবে কিসের জইন্যে? আমার সঙ্গে বুইজে-শুইনে আসা উচিত চেলো তোমার দোস্ত। আমি যে মানুষটা গোলমেলে তা তো সকলেই জানে!

তাপ্পর বর্ষানামার পর?

হোসেন ফিরে-যাওয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

তাপ্পর আমাদের আসল জায়গাতে যেতি হবেক। মানে, বর্ষা নামার পর।

সি জায়গা কোতা মিঞা?

এই বনেই। এই বনেরই মধ্যে কুনোখানে।

সিকানে কি কইরবে?

নিজেরে আবিষ্কার করব। এই পিরথিবীতে কেনই বা এলাম, কী করতে এলাম, কেনই বা ফিরে যাবো ; ই সব শুধোব নিজেকে। নিজের সঙ্গে নিজে কথা না-বলি কথা বইলব।

ঘোর বর্ষায় এই বনে থাইকবে?

অপার বিস্ময়ে বললো হোসেন মিঞা।

মুখে শব্দ না করি মাথা নেড়ে জানালো সারেং যে, হ্যাঁ। তাই থাকবে।

কিন্তু কেন?

শেষ অবদি যদি নাই দেইকতে চাও তবে একুনি পালাও। পরের ছেলেকে মেইরে কি গুনাহ্ করবো। তোমার দ্বারা হইবেক না মিঞা, তুমি ফিরৎ চইলে যাও।

না, না, না।

হোসেন বললো।

ক'দিনেই ওর বড় ভয় ধরে গেছে। গায়ে জ্বর। কিন্তু বড় নেশাও ধরে গেছে। এ এক আশ্চর্য জীবন, আশ্চর্য জগৎ, এমন কোনো জগৎও যে চেলো এত্তো কাছেই সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাও চিলো না।

একে যখন হাতের মুঠোয় পাবার সম্ভাবনা একবার ঘটেচে তখন সে সুযোগ হাতছাড়া করবে না হোসেন। কে জানে! এই সারেং মিঞা কে? কোন্ জহন্নাম বা জিন্নত্‌এ নিয়ে যাবে এ হোসেনকে? কিন্তু যেখানেই যাক, এই অনিশ্চয়তা, এই ভয়, এই আতঙ্ক অথচ বেঁচে থাকার জন্যে এই তীব্র সংগ্রাম, এই অভাবনীয় নীরব প্রচারহীন যুদ্ধর নেশা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। কী বহুমূল্যে যে দুমুঠো ভাত, একটু নুন আর একটু মিষ্টি জল কেনা হয় ওর দেশেরই এক নিভৃত প্রান্তে তা জলপিপির জলার ধারে বাস করা সুখী মানুষেরা জানে না। এই মানুষদের জীবিকার ভয়াবহতার কথা কলকাতা দিল্লী বম্বের মানুষরা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এই জীবন নিজের চোখে দেখার সুযোগ যখন ঘটে গেছে তখন সেই সুযোগ ফসকাতে দিতে পারে না হোসেন।

জান গেলে যাবে।

ভাবতিচোটা কি?

সারেং মিঞা বললো।

ভাবতিচি, ভাইগ্যে তোমার সঙ্গ ধইর্যে লিয়ে এইচিলাম!

সামনের প্রথম নৌকোটি থেকে, একজন মাঝি ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ করে তামাক খাচ্ছিলো। আর সকলেই চুপচাপ। অন্ধকার নামলেই চুপচাপ। কত কী ভাবে সকলে। কেউ হাই তুললো। পটাস্ শব্দ কইর্যে পোকা কী মশা মারলো কেউ। আর সঙ্গে সঙ্গে খুবই নীচু কিন্তু সুরেলা গলায় কালু মিঞার নৌকো থেইক্যে অল্পবয়সী ছেইলেটা মেয়েলি গলায় চেনা গান ধইরলো:

"সুন্দর জরিনা রে,
তোমারে না দেখলি মোর অঙ্গ যায় জ্বলে..."

সঙ্গি সঙ্গি আরেকজন বলল, মইরতে হয়ত নৌকো ঠেঙ্গে নেমে বনের গভীরে যা। রাতের বেলা গান গেইয়ে বড়মিঞারে ডেইক্যে আনিস না। গান থামা, গান থামা।

এ মানুষটার গলার স্বরটি একটু খোনা-খোনা। দিনের আলোয় দেখতি হবে কাল মনুষ্যিটা কে?

এবারে আরেকজন ভরাট গলায় বলে উঠলো, ওরে ও মুনসের! তোর মুখে যে একনও ভুধের গন্ধ। বিয়ার জইন্যে একুনি কান্নাকাটি উটোলি বাপ?

দু তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠলো সে কথা শুনে।

তাও চাপা গলায়। হোসেন ভাবছিল, কোন্ ভয়ের রাজ্যে এসি উপস্থিত হল সে।

কালু মিঞা না কলিমুদ্দি মিঞা কে যেন বললে, বুজতি পারলো না হোসেন; কিন্তু যেই বলুক, সে বললো, নে এবারে সবাই শুইয়ে পড় রে। একনো অনেকদিনের পত। তাছাড়া চামটার এলাকাতে পৌঁছে তো আর যিখানি সিখানি নোঙর করে রাতও কাটানো যাবে না। বনবিবি আর বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজো না দে' সে সব ঠাঁয়ে থাকা ত মোট্টে সম্ভব লয়। অতএব চামটার খালে যিখানে সব নৌকো জমা হইয়েচে, রেঞ্জার সায়েবের পিটেল-বোট যিখানে বাঁধা আচে, সিখানে গিয়ে পৌঁছতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্বব।

বিড়ির আগুন মুখে করে কে একজন বললো, চামটাতে বড়মিঞার শেষ ঘটনাটা কি তোমরা শুইনেচো গো? শুনলি গায়ে কাঁটা দিবেখন, চোখ কপালি উটবে আচ্ছা আচ্ছা মরদের।

কলিমুদ্দি মিঞা ধমকে বললে, শুয়ে পড় দিকিনি তোরা। পৌঁছতে তো হবেই সেই দোজখ্এ। ক'দিনও কি তর সয় না? কত গায়ে-কাঁটা দেওয়া গল্পই না অপেক্কা কইর্যে আচে আমাদের জন্যি। তোদের তাড়া দেকে অবাক লাগে আমার। কে থেইক্যে যাবি আর কে ফিরবি তার লাই ঠিক!

হোসেনের চোখ এমনিতেই জুড়ে আসছিলো। তারপর গ্রীষ্মরাতের ফুরফুরে হাওয়া। নৌকোর খোলের গায়ে জল চলার সড়সড় শব্দ। লোমহর্ষক আগামী দিনের, তার পরের দিনের, তারও পরের অনাগত দিনগুলির ভাবনা ওকে উত্তেজিত, ভীত, ত্রস্ত করে তারপরে ক্লান্ত করে ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিল।

হোসেন ঘুমিয়ে পড়লো অজানিতে।

সবাই যখন ঘুমোলো তখন উঠে বসে হুঁকোতে নতুন করে তামাক সাজলো সারেং মিঞা। যখন অন্য সকলের ঘুম তখনই সারেং মিঞার জেগে থাকা। কথাটা আক্ষরিক অর্থেও যেমন সত্যি তেমন অন্যার্থেও সত্যি।

প্রতি নৌকোতে ঘুম, বনে ঘুম, নদীতে ঘুম, আকাশে ঘুম, বাতাসে ঘুম, পাতাতে ঘুম, শিকড়ে ঘুম, তখন ছইয়ে হেলান দিয়ে বসে সামনে বন্দুক রেখে অন্ধকার বন আর তারার ছায়া-কাঁপা জলের উপর চোখ ফেলে বসে রইলো সারেং মিঞা। কারণ সারেং মিঞার মতো কিছু মানুষের এই পিরথিবীতে আসাটাই জেগে থাকার জন্যে।

॥ ৫ ॥

চোখ খুলতেই হোসেন অবাক হল। অথচ বেশ কদিন কেটে গেচে বুঝতেই পারচিল না কোথায় আছে সে, কোথায় এসেচে।

পূবে সূর্য তখনও ওঠেনি কিন্তু আলো ফুটেচে। একটা মস্ত গাছ তাদের নৌকো যেন ছায়া করে আছে। গাছটার নাম জানে না হোসেন। জেনে নেবে পরে, সারেং মিঞার কাছ থেকি। অন্যান্য নৌকোতে মানুষে কেউ জেগেছে, কেউ জাগেনি। চেয়ে দেখল, অন্যান্য নৌকোতে অনেকেই নেই। হয়ত প্রাতঃকৃত্য সারতে গেছে। যদিও সে ছইয়ের মধ্যেই শুয়েচে তবু দেখতে পেল তার নাকের ঠিক উপরে একটা বাঁদর বসে আছে লম্বা লেজটা ঝুলিয়ে দিয়ে। আরও কটি বাঁদর নড়ে-চড়ে সেই গাছের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হোসেন উঠে বসে পাটি গুটিয়ে রাখল। তারপর টোঙের বাইরে এসে পাটাতনের উপরে টানটান হয়ে দাঁড়াল। নিমের ডাল কাটা ছিল, ছোট ছোট টুকরো করে; সারেং মিঞার নৌকোতে। তারই একটি নিয়ে দাঁতন করতে লাগল। দাঁতন করতে করতেই দেখতে পেল, সারেং মিঞা বদনা হাতে হেঁটে আসছে জঙ্গলের গভীর থেকে। বাঁদরের কিচিমিচি ছাড়া ভারী শান্তি চারদিকে। এ এক অন্য জগৎ। একেবারেই অন্য। এমন মাটি, জল, আকাশ, গাছ-গাছালি, পোকা-মাকড়, লতাপাতা, পাখ-পাখালি এ সব এর আগে হোসেন অন্য কোথাওই দেখেনি। এখানের মানুষজন, মানে, এখানে যারা আসে তারাও একেবারেই অন্যরকম। "বিবির বিল" বা "জলপিপির জলার" চারপাশে যে সব মানুষ থাকে তাদের কারো সঙ্গেই এদের মিল নেই কোনো। চেহারাতে, মানসিক-

তাতে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে। অদ্ভুত সব মানুষ।

সারেং মিঞা বলছিল 'বিধবাপল্লী' আছে সোঁদরবনের বাদা অঞ্চলে। এবারেও যারা এসেছে নানারকম ধান্দা, দুমুঠো অন্ন-প্রত্যাশী হয়ে তারাও সকলে যে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথচ এই মানুষগুলো যে খুব বীর, তারা যে বীরত্বসূচক কিছু করছে তা তাদের হাবে-ভাবে কথা-বার্তাতে বোঝার উপায়ই নেই। যেমন বোঝা যায়, পাহাড়চুড়ো জয় করতে যাওয়া কী দেশের হয়ে বিদেশে খেলতে যাওয়া বা বিদেশি পুরস্কার-পাওয়া কোনো মানুষের চোখ মুখ দেখে বা কথাবার্তা শুনে।

অন্য একটি নৌকো থেকে সারেং মিঞাকে কে যেন হাঁক দিল। বলল, মিঞা তুমি যখন সঙ্গেই আছ তখন বাউলের কাজটা তুমিই কইর‍্যে দাও না কেন!

পা ধুয়ে নৌকোতে উঠতে উঠতে সারেং মিঞা হেঁকে বলল, আমাকে বাউলে করলে তোমাদের বিপদ ঠেকি থাকবে না। কবে ঘি খেয়েছি এখনও যেন আঙুল পিছলে যাচ্চে সে জন্যি! চলো চামটা। সেখানি বাউলের অভাব হবেনি। গোলপাতা-কাটা নৌকো, মেছো-নৌকো, জেলে নৌকোর ত টিপি লেগেছে গো সিখানি। গণ্ডায় গণ্ডায় বাউলেও পেয়ে যাবেখন।

একটি যুবক, হোসেনেরই বয়সী হবে, লাল-কালো চেক চেক লুঙি পরণে, হাসতি হাসতি বলল, আমরা যাত্রা মন্ত্র পইড়্যেই ত এইয়েচি চাচা, কিন্তু হইল্যে কী হয়! বাউলে মন্ত্র পড়ে না দিলি কি সোঁদরবনে সেঁদোনো যায়!

ছেলেটি যেন আগে থেকেই সারেং মিঞাকে চেনে মনে হল।

হোসেন অবাক হয়ে ভাবছিল, ছেলেটিকে আগে চোখে পড়েনি কেন? নীল-রঙা, বগল-ছেঁড়া একটি হাফ-হাতা শার্ট আর পরনে ঐ লুঙি। বেশ ছেলেটি। ফর্সা গায়ের রঙ। হাসিখুশি।

সারেং মিঞা বইললো, কী মন্ত্র পইড়্যে এসেচো শুনি, যাত্রার?

ঐ।

ঐ কি?

ঐ আমাদের গাঁয়ের মদন চাচা যেমন পড়ে।

কোন গাঁ তোমাদের ?

খিতিপুর।

কোন মদন ?

মদন হাজরা।

মন্ত্রটা ত বলবে !

বলতিচি—

"বদরের পায়ে দিয়ে ফুল
বেয়ে ওঠো নদীর কূল ॥
মুখে বলো হরি হরি।
গুরু আছেন কাণ্ডারী ॥
লাও ভাই বদরের নাম।
গাজী আছে লেখাপান ॥
দরিয়ায় পাঁচ পীর
গাজী বদর বদর ॥

এই মন্ত্র বলে দু হাতের কোলে জল তুলে ছিটিয়ে দেছিলাম ডিঙির গলুইতে, নিজের মাথাতে আর সাঙাতের মাথায়। বাস্। মন্ত্র পড়িই লগি তুল্যে দু হাতে ডাঙ্গায় দাঁড়ানো বাপকে পেরনাম করে লগি পুঁইতে দিলাম। ছাইড়লাম ডিঙ্গি।

বেশ কইরেচো।

সারেং মিঞা বলল।

তারপর কালু মিঞা আর কলিমুদ্দির দিকে চেয়ে গলা তুলে বলল, শোনো মিঞাভায়েরা। এখন থেইকে আধঘণ্টার মধ্যি বেইরে পড়তে না পারলি বেলাবেলি চামটা পৌঁচতে পারবেনি। আর না পারলি, কি যে হবে তা ত অনুমানই করতি পারো।

নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

বলে উটলো তারা। ভয়ের সুর লাগল গলাতে যেন।

অন্য একজন বলল, কালই যখন শিষখালে ঝামৃটি পোঁতা দেখা গেল

তকন এ বছর তেনাদের দৌরাত্ম্য যে কী পেকার বেড়েচে তা ত জানা কতাই ! কাল রাতেও আমরা সাবদানে থাকিনি। লণ্ঠনের ফিতে কইম্যে দে, লগির সঙ্গে ঝুইল্যে রেইকেচিলাম শুধু। কাল রাতের ঘুমই কালঘুম হতি পারত।

সারেং মিঞা হেইস্যে বলল, খুদাহ্‌ ছিলেন। তাঁর চেয়ে বড় পাহারাদার আর কে আচেন ?

তিনি ত থাকেনই ! আমরাই দেইকতে পাই না বলিই ত যত গোলমাল। তেনার উপরে ভরসা কইর‍্যেই ত আসা।

ই সব কতা-বাতরার মদ্দ্যেই এক বহর নৌকো বেয়ে এল ওদের বহরের দিকে।

কুথা থেকে আসতিচেন গো ?

নৌকো দেখেই বোঝা গেল জেলে-নৌকো। বড়ছোট জাল গোটানো আছে ছইয়ের মাথাতে। তুটি নৌকোর পাশে হাপর বাঁধা। মাছ ধরে জ্যান্ত মাছ এই হাপরের মধ্যে ছাড়া রাখে। মাছ মরে না বলে চালানী নৌকোয় চালান দিতে সুবিধে হয়।

ঐ বহরের আগে আগে যে প্রথম নৌকো, তার ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লম্বা তাগড়া এক বুড়ো। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারাখানি। হাতে হুঁকো। পরণে ধুতি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জী। কাঁচা-পাকা চুল মাথাময়।

সেই মানুষটি বলল, আর দেরী কইর‍্যেন না মিঞা ভায়েরা। ই বছর খপর বড় খারাপ। ইখানিই এই অবস্থা ত চামটাতে কী হবে কে জানে ! কাল রাতে শিষ খালের মুখ থিক্যে আমাদের বহরের একজন জেলেকে নিয়েচে বড়মিঞায়। মুখ-হাত ধুতে নেইমেচিল। এতজন মানুষ ও এত গুলান ডিঙ্গি ও বড়-নৌকোর মদ্দি থেকেই তাকে নে গেল দিনমানে।

আহা ! ঐ শিষখালে ত ঝামটি পোঁতা ছেলই ! তাও দেইকলেন না আপনেরা কত্তা ?

কলিমুদ্দি উত্তেজিত হয়ে বইল্যে উইটলো।

আরে না মিঞাভাই। শিষখাল তো পেচনে ফেইল্যে এইস্যে ছিলামই

আমরা। আজ পেত্যুযে নতুন ঝামটি বেঁইধে দে এলাম অন্ত শিষ খালে।
চলেন চলেন। ডিঙ্গি খুইল্যে গ্যান সবাই। আর দেরী নয়।

জেলেদের নৌকোর বহর এগিয়ে যেতি যেতিই সেই হুঁকোহাতে বললেন, আমরা আসতিচি নানান গেরাম থিক্যে। সব গেরামের মানুষ ইকানে। চামটাতে দেখা হলি পর সব গেরামের নাম বলা যাবেকন।

বলেই, সারেং মিঞাকে দেখতে পেয়েই মাথা নীচু করে হুঁকো-ধরা হাতেই দুহাত জড়ো করে পেরনাম করে বইলল, আরে সারেং চাচা যে! আপনি! কী সৌভাগ্য আমাদের। কী সৌভাগ্য। আপনি এইলি পর তবেই এক সঙ্গে চামটাতে ঢোকা যাবে। আমার বহর নে আমি বড় চামটা খাল ধইরে এগোতিচি। খালের মুকে অপেক্কা কইরব। আপনি ত সাক্ষাৎ ভগমান। মানে, খুদাহ্। আপনি সঙ্গে থাকলি ত বাবা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, বড় খাঁ গাজী পেত্যেকেই রইলেন। চিন্তার কিছুই নাই।

বলেই বললো, ক্ষমা চাইচি সারেং চাচা। আপনারে দেকতি পাইনি মোট্টে।

সারেং হেসে বললো, বড় বাজে কথা কইতেচো তুমি যোগেন। আমি কেউই লই গো। কেউ চিলামও না। আজও কেউ লই। মিথ্যে-মিথ্যি বাজে মানুষের উপরে নির্ভর যদি কইর্য়ে থাকো ত বিপদ অনিবার্য। যাঁর উপরে নির্ভর করার, শুধু তাঁর উপরেই কোরো। তোমাদের দাঁড়ানোর দরকার কি? বড় চামটা খাল দিয়ে দোয়ানিয়াতে পড়ে এগিয়ে যেও। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে সাবধানে পরিষ্কার জায়গা দেখে নোঙর কোরো। আমিও ওখানে গিয়েই খাওয়া-দাওয়া করব।

হোসেন বুঝতি পারল যে, কলিমুদ্দি বা কালু মিঞারা সারেং মিঞাকে চেনে না। তবে যোগেনবাবুর কথা শুইন্যে তেনাদের চোখ গুনি সব তাবড় তাবড় হইয়ে গেল। সারেং মিঞা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বইলল, দড়ি খোলো হোসেন। চলতি চলতিই মুড়ি কেয়ে নেবোকন।

হোসেন ফিসফিস করে শুধোলো সারেংকে, ইনি কে?

এ হচ্ছি যোগেন দাস, স্বচ্ছল জেলে। মানুষটি ভাল।

কেন ? ভাল কেন বইলতিচ ?

এ জন্যি বলতিচি যে যোগেনের পয়সা আছে তবে পয়সার জন্যি গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া মাছির মত ভনভন করে না।

কথাটা এট্টু বুঝিয়ে বলার চেল।

বুঝলি না। জীবিকা একটা পেত্যেক মনিষ্যিরই পেয়োজন। মানে, যারা ঘর-সংসার কইরেচে, বা কইরতে চায়—মানে, যারা আমার মত বাউণ্ডুলে মুসাফির নয়। কিন্তুক নিজের পেট নিজের পরিবারের পেট ত জীব-জন্তু থেকে সব্বপ্রকার মনিষ্যিই, জেলে-মউলে, সকলেই চাইল্যে নেয়। তাতে বাহাদুরী কি ? কেউ কেউ নিজের জন্যে বিস্তর পয়সা কামায়। টাকার ঢিপ্যি গইড়্যে তোলে। তাতেও বা বাহাদুরী কি। বাহাদুরী হল তাদের, যারা নিজেরা নিজেদের চওড়া কাঁধে অন্য অনেক মনিষ্যির বোঝ চাপিয়ে নে চলে। নিজের ভালর সঙ্গি সঙ্গি তার ধারে-কাছের সকলেরই ভাল করে। নিজের ভালর সঙ্গে সকলের ভাল এক কইরে দেকে। আমাদের এ যোগেন হতিচে গিয়ে সিরকম মনিষ্যি।

সারেং মিঞার কথামত ডিঙ্গি খুইলে নে, বৈঠা বেয়ে বেয়ে এগোল হোসেন। ওদের নৌকোর বহরে সাজসাজ রব পড়ে গেল। যারা ডাঙ্গাতে নেমেছিল তাদের নাম ধরে হাঁকাহাঁকি হতি লাগল।

কলিমুদ্দি বলল, আপনি এইগ্যে যান মিঞা। ছোট ডিঙ্গি আপনের। আমরা এই আসতিচি।

সজনেখালির একপাশ দিয়ে চলে গেছে গোসাবা নদী। অন্য পাশ দিয়ে পঞ্চমুখান খাল। পঞ্চমুখান খালও এসে গোসাবা নদীতেই পড়েছে। তার একটু পরেই ডানদিকে বেরিয়ে গেছে বড় চামটা খাল। তার একটু পরে ছোট চামটা খাল বড় চামটা খাল বেয়ে দোয়ানিয়া খাল হয়ে চামটা ব্লকের গভীরে গিয়ে পৌঁছনো যায়। বড় ধুতরা খাল, ভোলাখালি খাল, চন্দ্র দোয়ানিয়া খাল, লোধি দোয়ানিয়া খাল রয়েচে চামটা ব্লকের মদ্দ্যি। চামটার পুব দিক দিয়ে চলে গেচে গোনা নদী। গোনার পাশেই গোনা ব্লক। গোনার পর বাঘমারা ব্লক। চামটা, গোনা আর বাঘমারা ব্লককে ঘিরে রয়েছে গোসাবা, হেড়ো-

ভাঙ্গা আর গোনা নদী। এই তিন নদীই গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে।

এখন ভারী চমৎকার লাগছে হোসেনের। বন ক্রমশঃ ঘন হচ্চে। বড় নদী ছেড়ে খাল-এ ঢুকেচে ত গতকালই কিন্তু একন খালের দুপাশের দৃশ্য বদলে গেছে। এঁকে-বেঁকে যাওয়া খালের পাশে পাশে ডান দিকে বাঁ দিকে বেরিয়ে গেছে অগণ্য পাশ খাল। পাশ খালের মদ্দ্যে থেকে বেরিয়ে গেছে শিষ খাল। শিষ খালের মদ্দ্যে জোরে জল ঢুকচে জোয়ারের। তার সঙ্গে ঢুকছে নানারকম মাছ। মাছরাঙারা ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরছে আর তাদের চিৎকারে সরগরম হয়ে উঠচে গ্রীষ্ম সকালের নিস্তব্ধ বন। নিস্তরঙ্গ জলে তরঙ্গ উঠচে ছোট ছোট।

প্রকাণ্ড বড়, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ; একটি কুমীর ডাঙ্গাতে উটে বসেছিল, বোধহয় ভাঁটির সময়ে। এখন এঁকে বেঁকে স্যাঁতস্যাতে পলি-মাটির মধ্যে ল্যাতপ্যাত করে চারপায়ে আর ন্যাজে ভর দিয়ে খাড়া পাড় থেকে জলে নামছে।

দেখেই, গাটা যেন ঘিনঘিন করে উটল হোসেনের। ভয়ও লাগল। কোনোদিন কুমীর দেখেনি ও আগে। কিন্তু এত বড় কুমীর! প্রায় তিনমানুষ লম্বা হবে। তার পেটের মদ্দ্যে দশ জন মানুষ একসঙ্গি ঢুকে শুয়ে থাকতে পারে। এত মোটা ও বড় সে পেট।

সারেং মিঞাকে শুধোলো হোসেন, কলকাতার ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলেকে যে কুমীর গঙ্গা নদীতে ন্যাজের বাড়ি মেরেছিল সে কি এত বড়?

সারেং মিঞা ওর দিকে গামছা করে মুড়ি আর গুড় এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বলল, এত বড় কুমীর ন্যাজের বাড়ি মারলে বাঘেরও কোমর ভেঙ্গে যাবে তার মানুষ ত কোন ছার। নাঃ, সে কুমীর এর তিনভাগের একভাগ ছিল।

কী বিচ্চিরি দেখতি গো!

সারেং মিঞা হাসল, এক হাতে মুড়ি ধরে অন্য হাতে হাল ধরে। বিড়বিড় করে বলল, খুদার দুনিয়াতে সব প্রাণীই সুন্দর। সুন্দর করি তাকাতি হবে তাদের দিকে।

বৈঠার এক এক ধাক্কাতে ঝাঁকি মেরে মেরে ডিঙ্গি ঝলকে-ঝলকে এইগ্যে চলতিচে। রোদ তখনও কড়া হয়নি। ইট্টু-আট্টু জল ছিটকি গায়ে লাগলি ছ্যাঁত্ কইর‍্যে ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা দেয়।

হোসেন তুদিকে চাইতে চাইতে ভাবচিল শুকনো ডাঙ্গার মাঝে যে জঙ্গল তার রূপ আলাদা আর সুন্দরবনের জঙ্গলের রূপ আলাদা। অন্য যি কুনো লদী বেয়ে লৌকো চাইল্যে গেলে—তুপাশে, লাগাতার না হলেও, দূরে কাছে গ্রাম নজরে পড়বেই। লোকালয়, গঞ্জ, উল্টোদিক থেকে নানা নৌকোর আনাগোনা, গরু ছাগলের পোষা-পশু-পাখির ডাক, মন্দিরের ঘণ্টা, মস্‌জিদ-এর আজান, শিশু এবং মায়ের কণ্ঠ, ঘাটে ঘাটে নানারঙা শাড়ি-পরা মেয়েদের জল নেওয়ার দৃশ্য, নদীপারের জনপদ ; আরও কত কিছু।

কিন্তু না, ইখানে কিচুই লাই। শুধু বন আর বন। নিস্তব্ধ। মনে হয় প্রাণহীন। সেই জন্যেই এই। নিভৃত, নিস্তব্ধ নির্জন, জনমানবহীন বন মনিষ্যিকে ভয় পাইয়ে দেয়। আবার তার মদ্দি যে গভীর সৌন্দর্য আচে—অপার্থিব, তার আকর্ষণও কিচু কিচু মানুষকে পাগল কইরে তোলে।

সব বনই মনিষ্যিকে, প্রকৃতিপ্রেমিক আধ্যাত্মিক মনিষ্যিকে পেচণ্ড ভাবে আকর্ষণ করে সি কথা হোসেন মিঞা তার "চম্পারনে"র হানিফ চাচা আর "দামুয়া-ভুলুয়া"র জঙ্গলের মাধো সিংকে বেশ কিছুদিন কাছ থেকে দেখেচে বলেই জানে। ভাগলপুরের "ভইষা-লোটনে"র জঙ্গলের এরফান মিঞাকেও জানে। ইদের সকলির সঙ্গিই আলাপ হয়েচেল হোসেনের নওয়াদাতে একবার, মুশহারা শুনতে গিয়ে। ঐ একবারই গেছিল। ইত্তেফাকান পৌঁছে গেছিল ক্যানিং-এর জিগ্‌রি-দোস্ত আমা-মুল্লার সঙ্গে। সি এক অভিজ্ঞতা। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সর্দারজীদের ট্রাকে করে যাওয়া, ধাবাতে খাওয়া ; তারপর বর্‌হির মোড় থেকে ঝুমরী-তিলাইয়া হয়ে শিবসাগরের দিকে এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে রজৌলির ঘাট। সে কী ঘাট! আর কী গহন বন সিখানে! সি ঘাট থেকি নেইমেই সিঙ্গার। আর সিঙ্গার পেরুলেই নওয়াদা।

কিন্তু হলে কী হয়! সি সব বনও গহন, ভীষণ, বড় বড় সাদা

কালো লালচে পাথরের চাঙড় বের করা মাথা উঁচু পাহাড়। কিন্তু সি সব বন এই সোঁদরবনের মত নয়। এই বনের যেন হাজারো-চোক, অতচ জিভ লাই। শব্দ লাই, আলোড়ন লাই কুনো। দুপাশ থেকি অজগরের চোকের মত ঠাণ্ডা চাউনিতে চেয়ে আচে যেন।

নওয়াদা কথাটার মানে, সত্যি কিনা জানে না, ওর ফুফারে ছেলে হাসমৎ বলেচিলো, নতুন ওয়াদা করেচিল কেউ, কথা দিয়েচিল কেউ, কিচু, কাউকে ; তার থেকেই নওয়াদা।

হবে হয়ত। হতি নাও পারে। কিন্তু এত কতা মনি আসচে হোসেনের আজ এই সুন্দরবনের মদ্ধ্যে ঢুইকে পড়ি ই জন্যেই যে, আজ অবধি যা কিছুই ও দেখেছে, মানে, যিসব বনাঞ্চল, তার সঙ্গি এই বনের কুনো তুলনাই চলে না। ভালো মন্দের তর্কে আদৌ না গিয়েই বলা যায় যে, ই আলাদা, ই অনন্য। সুন্দরবনের কোনো জুড়ি লাই, পরিপূরক লাই। কী সৌন্দর্যে, কী শান্তিতে, কী নির্জনতায়, কী ভয়াবহতায়। পেতিবচরই বনবিবি, বাবা দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড়খাঁ গাজী আরও যে কত দেবদেবীর পূজো করে তাঁদের আশীব্বাদ মাতায় নিয়ে এই পেবল ভয়ংকর বনে ঢোকে কলিমুদ্দি, কালু শেখ এবং অগণ্য নাম জানা ও অজানা হিন্দুমোচলমান তুরুতুরু, তার লেকা-জোকা লাই। ফরেস্ট ডিপার্টের বাবুরা যাই বলেন না কেন প্রতিবছর এই সুন্দরবনে বাঘ সাপ কুমীর কামটের বলি যে কত মনিষ্যি হয় তার কুনো হিসেবই রাকা হয়নি। আজও হয় না।

বড় আশ্চর্য লাগে হোসেনের, একজন মেয়েচেলে দেকে লাই সুন্দরবনে। এমন কুনো বনই দেকেনি ও, বা শোনেনি তেমন বনের কতা, দেকেনি নদী, খাল, যিকানে মেয়েচেলে আসা ইকেবারেই বারণ। না, এই বনে শুধু পুরুষদেরই ঢোকার অধিকার আচে। শুদুই পুরুষদের। সি জন্যিও এই বন আরও অন্যরকম।

যিখানে মানুষ-খেকো বাঘেদের দৌরাত্ম্য, দেশের অন্যান্য বনে, সিখানেও মেয়েদের কুটো-কুড়োতে ঘাস-কাটতে, জল আনতে, ফসল-তুলতে, কাপড়-কাচতে বনের মদ্দির জঙ্গলে, ঘাস-বনে,

নদীতে ক্ষেতে, ঝর্ণাতে যেতি হয়ই। কাউকে কাউকে কখনও ককনও যে বাঘের হাতে মরতি হয় না এমনও লয়। তবু সুন্দরবনের এমন ভয়াল, করাল, রাহুগ্রস্ত, ভৌতিক অনুভূতিতে ছাওয়া মতো সাংগাতিক বন বোধহয় পৃথিবীর আর কোতাওই লাই। এবং এত ভয়মিশেল ভালো-বাসার মত বনও লয়।

মুড়ি-খাওয়া শেষ হলে, হাতের গুড় ধুতে হোসেন লগি পাশে রেখে ঝুঁকে পড়ে দু হাত জলে ডুবিয়ে দিল।

সারেং মিঞা বলল, করো কি ? করো কি ? এবারে করেচো করেচো ভবিষ্যতে আর ককনও এমন কাজ করবেনি। সুন্দরবনের ডাঙ্গায় বাঘ, সাপ, শূলো ত আচেই। এর জলেও কুমীর হাঙ্গর আর কামটের কিলিবিলি। কত মাঝি, কত জেলে, এট্টা ডুব মারার জন্যি জলে নেমেচে অথবা পা-ধোওয়ার জন্যি নৌকো থেকেই জলে পা নামিয়েচে আর সঙ্গি সঙ্গি কামটে পা কেইটে নিই গেচে। কুমীরে ধরলি মনিষ্যিকে হিড়হিড়িয়ে টেনেই নে যায়। কিন্তুক কামটে তা করে না। তার কামড় বড় বড় হাসপাতালের ছার্জনদের ছুরি দে কাটার মত। যকন কাটা হয়, তখন বোজাই যায় না। এমনই নিপুণ তারা আর এমনই নিপুণ তাদির মনিষ্যির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেইটি নেওয়ার ক্ষ্যামতা।

চামটার খালে পড়ার পর থেকিই লক্ষ করচে হোসেন যে অনেক নৌকো ও ডিঙি চলেছে সারে সারে একই দিকে। রাতে ওরা কোতায় নোঙর করেচেল, কে জানে। হয়ত কোনো পাশ খালে বা শিষ খালে। তবে এ কদিনেই হোসেন বুঝি গেচে যে শিষ খালে ও সব জায়গাতি কেউই বড় একটা নোঙর করে না। এমন কি পাশ খালে করলেও খালের মাঝ-বরাবরই করে। অসম্ভব না হলে, অনেকগুলো নৌকো একসঙ্গি নোঙর করি থাকে। পাশাপাশি।

একন যেন জলের উপরে বেশ মেলা-মেলা ভাব ইয়েচে একটা। যেন হোসেনদের কোনো "তেওহার" বা হিন্দুদের কোনো পুজো। মকর-সংক্রান্তি বা গাজনের মেলাতে যেন সারে সারে বিভিন্ন মাপের ছোটবড় নৌকো চলেচে।

তাদের কারো মাথায় পাল। কারো বা গুটোনো। কতরঙের যে পাল! কারো গাঢ় লাল, পার্টির কোনো দাদার দেওয়া; কারো গেরুয়া, কারো গোলাপি। তবে গুণ টেনে চলছে না কোনো নৌকোই যদিও এই খালে জোয়ারের উল্টোমুখে যেতে হচ্ছি সকলকেই। গুণ টানচে না কারণ দুপাশেই জঙ্গল। যে গুণ টানতে নামবে, কাঁদ বেঁকিয়ে লৌকো টেনে আগে আগে প্যাতপ্যাতে পলিমাটিতে হেঁটে যাবে সেই ত খাদ্য হবে বড়মিঞার। গুণ টানতি দেকেছিল ক্যানিং ছেড়ে আসার পরেই মাতলার ডান দিকে, আবাদের পাশে পাশে যে খালটা আছে সিকানে। দেকি মনে হয়, সি খাল মনিষ্যিরই বানানো।

সারেং মিঞা মুড়ি-গুড় খেয়ে জম্পেস করে হুঁকোটি ধরাল। ছিলিম বসিয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানতে লাগল। বাঁ হাতে হাল ধরি আচে। ডান হাতে হুঁকো। বৈঠা বাইছে হোসেন।

কীরে মিঞাসাব? জোর লাগতিচে বুঝি খুব? আর এট্টু এগুলেই আমরা দুগ্যাদোয়ানির খালে গিয়ে পড়ব। সব দোয়ানি খালেই দু দিক দিয়েই জোয়ারের জল ঢোকে। সেখানে বৈঠা বাইতে অত কষ্ট হবে না।

হোসেনের বৈঠার ছপাত্-ছপাত্ শব্দ আর সারেং মিঞার হুঁকোর তামুক খাওয়ার, গুড়ুক্গুড়ুক্ শব্দই যেন ইকমাত্র শব্দ এই পিরথিবীতে। নদীর মদ্দি জলজ শব্দের যেন এক অস্ফুট উল্লাস কিন্তু শ্রবণ-গ্রাহ্য কোনো শব্দ নেই। আয়নার উপরে জল গইড়ে গেলে যেমন শব্দ হয় না অথচ হয়ও তেমনি করেই জল বাড়চে নদীর। তবে শব্দ কি আর নাই? নদীর পেটের তলে যিখানে দুমুখো জোয়ারের জল এসি মিশচে সিখানে ত কলরোল হতিচেই। তাছাড়া, দুই পারে যখন জোয়ারের জল যেয়ে ঘা দিতিচে তকন সারেং মিঞার হুঁকোরই মত আলতো-হাতে-তোলা তবলার নরম বোলের মত অস্ফুট-বোল উঠতিচে লতায়-পাতায়, শেকড়-বাকড়ে পাতায়-পাতায়। সেই অস্ফুট শব্দের সঙ্গি রোদের রঙ ছিটকোতিচে গোলপাতায়, গরানে, গেঁয়োতে, দূরের বনমদ্যের সুঁদরীতে। সে-রঙ মাছের রক্ত ধোওয়া জলের মত ফিকে-লাল হয়ে লেইগ্যে থাকতিচি কেওড়ার বড় বড় গুঁড়িতে আর শূলোতে।

হুঁকো খাওয়া হইয়ে গেলে সারেং মিঞা বইলল, এবারে তুই হালে এইস্থে বোস আর এ বৈঠাটা আস্তে আস্তে চালা। তোর বৈঠা আমাকে দে। জলপিপির জলার শৌখিন ডোঙ্গা-চালানো তোর অব্যেস, তোর কী দু-তিনদিনে অত সয়। তাও ফোস্কা পইড়েচে নির্ঘাৎ। কই? দেখি?

না, না ঠিক আচে চাচা।

লজ্জায় হাত দেকালো না হোসেন। আসলে, ফোস্কা ত পইড়্যে চেলই!

তা তুমি আবার চাচা ডাক ধইরল্যে কেন?

সবাই ডাইকতিচে। বিতিচি গেরামের গণ্ডের পোকা আমি, আমি কি জাইনতাম তুমি কে বট হে! তাছাড়া তুমিও ত আমাকে 'তুই' করে ডাকতিচ। তোমারে চাচাই বইলব। নইলে অভক্তি-অভক্তি লাগে।

ওর কথার ধরণে হেসে ফেললো সারেং মিঞা।

বলল, তুই দেকি বাগচীবাবুর 'নটবর সারেং'-এর মত কতা কইতে-চিস। "অভক্তি-অভক্তি লাগে"টা আবার কোন "ভক্তি ভরি" বাংলা ভাষা?

নটবর সারেং কি বলে?

নটবর বলত, তার বাড়ি অবশ্য চেলো কেনিং বোট কোম্পানীর মালিক বাগচীবাবুর দেশে, উত্তর বাংলাদেশের সেই পাবনা জেলায়। নটবর "বাকি"কে বলত "বাঁকি"। কতায় কতায় বিস্ময় প্রকাশ করতি হলেই বলত, "চিন্তা করেন একবার!" বয়সে তার চেয়ে অন্য কেউ ছোট হলে বলত, "কইস্ কি রে তুই?" সেই নটবর, সুন্দরবনের খাবার-দাবার মোটে পাওয়া যায় না, নুন, তেল, চাল, ডাল, মুড়ি-চিঁড়ে, মায় পানীয় জল পয্যন্ত বয়ি আনতি হয় একানে, সেই দুঃকে সকলকেই বলত, বুঝতিচেন কিনা বাবুগণ "ইকানে খাদ্য-খাদকের বড়ই অভাব।"

হোসেন হো হো করে হেসে উঠল নটবর সারেং-এর কথা শুনে। সারেং মিঞা নিজেও হাসল।

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু হাসি-স্মৃতি থাকে যা কখনও পুরনো হয় না এবং মনে হলেই মন ভাল লাগে, হাসি আসে। ভাগ্যিস সকলেরই

তেমন কিছু হাসি-স্মৃতি থাকে।

পেচনে হটাৎ জোর ছপাছপ বৈঠা বাওয়ার শব্দে চমকে উটে নিজের হাতের বৈঠা থামিয়ে পেচনে চাইল হোসেন। দেকে, সকালের সেই চেলেটি লাল-কালো চেক-চেক লুঙ্গি-পরা, বগল-ছেঁড়া নীল হাফ শার্ট, সেই জোরে এগিয়ে আসতিছে।

সারেং মিঞা বলল, অত তাড়া কি বাপ!

চেলেটি হেসে ফেইলল।

বলল, যার জন্যি চুরি করি সেই বলে চোর! আপনেই না সকলকে তাড়া লাগালেন।

বলেই বলল, এবারে সঙ্গে ইটি কে চাচা? কলিমুদ্দি চাচা ত বইলতে চিলো যে আপনাকে এ অঞ্চলে দিকতিচে বহু যুগ। কিন্তু এ কে?

হোসেন বলল, আমার নাম হোসেন মহম্মদ। তোমার নাম কি?

আমার নাম এরফান মণ্ডল। তোমার বাড়ি কোথায়?

গরান গ্রাম। আর তোমার?

বিতিচি।

সেটা আবার কোতা?

সারেং মিঞা হেসে বইলল, ও ত তোদের সোঁদরবনের বাদার মানুষ লয়। ও হলো গিয়ে "সুকের পেরাণ, গড়ের মাঠের" নোক। জলপিপির জলা বা "বিবির বিল" এর নাম শুইনেচিস ককনো?

না ত।

তা ত না শোনারই কতা! তোদের ত ওদিকে কোনো দরকারই পড়ে না। তোরা ত আসিস নামখানা দিয়ে।

এরফান কথার মাঝে কথা কেটে বলল, তা চাচা, হোসেনকে আমার ডিঙ্গিতে নে' নি? গপ্প করতে করতে যাব।

তা ভাল। কিন্তু আমার ডিঙি থেকে এক দাঁড়ি উঠায়ে নেলে একটা অন্য দাঁড়ি ত দিবি আমারে? না কি? তা কলিমুদ্দি, কালু এরা সব গেল কোতা। তোর নৌকো থেকে কোতা তাদের ফেইল্যে দিলি?

তেনারা সব বুড়ো খুজি খুঁজি যে যেমন পেইরেচেন অন্য নৌকোতে গিয়ে উটেচেন। কাল থেকি্য ত যার যার, তার তার।

মানে "হিজ-হিজ হুজ-হুজ" বলতিচিস্। মাল-জান সামাল-সামাল।

হোসেন হেসে উঠে বলল, কী বলতিচ? আগে মাল পরে জান?

সারেং মিঞা বলল, জী। ঠিক তাই বলতিচি। জান-প্রাণ এর দাম সুন্দরবনে কিছুমাত্রই লাই। জান-প্রাণ এই আচে, কী এই লাই! তবে মালের দাম আছে বৈ কি। চাল ডাল নুন তেল, শড়কি, দা, লাঠি, বেপাশী বন্দুক, টাটকা-টোটা, মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুকের বারুদ, চকমৃকির পাথর, গুলির ক্যাপ এই সবই প্রাণের চেয়ে অনেকই দামী।

আর টাকা-পয়সা? তার দাম নেই?

মোট্টেই লাই। ইকেনে টাকা ত কাগজই। কে কী দিবে সেই কাগজের বদলে?

তারপর এরফান মণ্ডল কথা ঘুরায়ে নে শুদোল, তোমার বে-থা হল হোসেন?

পেবল আপত্তির সঙ্গে, যেন ঘোর অন্যায় কুনো কথা শুনচে এবং তার তীব্র প্রতিবাদ করচে এমন ভাবে দু পাশে মাথা নেড়ে উটল হোসেন। বলল, কী যে বইলতিচো! না। না। না। ককখনো না। জীবলেও করি লাই, জীবলেও লয়।

ই আবার কী কতা গো! ককৃকনো না। জীবলেও করি লাই! পেত্যেকের বেলাতেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, ইকসময়ে ত 'ককৃখনো না' 'হ্যাঁ' হয়ে যায়ই! চিরদিন 'না' থাকা জিনিস আর কটি আছে খুদাহ্র দুনিয়াতে?

না, না। আমি উসবের মদ্দেই লাই। তাই ত সারেং চাচার সাঙাত হইয়ে তোমাদের সোঁদরবনে চইলে ইলম গো।

কাজটা ভাল কইরেচ কী মন্দ তা বলতে পারচিনি। কলিমুদ্দি চাচার কাছে যা শুইনেচি, তাতে ত সারেং চাচার আসার কতাটা সব মনুষ্যিরই জানা কিন্তু ভাই ফেরার কতাটি ত জানা নাই কারোরই।

মানে?

মানে হল, বাউলে, জেলে, মউলে গোলপাতা-কাটা নৌকো, কাঠুরের নৌকো সকলেই ফিরে যায় বর্ষার মুখে মুখেই। মুখে মুখেই বা বলি কেন, বর্ষা নামার আগে আগেই। আর সি যাওয়া কী যাওয়া। চোকের জলে ভেসে ভেসে যাওয়া।

গরীবের যদিও চোকের জল ফেলার সময় লাই, চোখ তবু অজানিতেই ভিজে ওট্যে গো।

কেউ বাবাকে ফেলে যায়, কেউ ছেলেকে, কেউ শালাকে, কেউ ভগ্নীপতিকে, কেউ ছেলেবেলার খেলার সাথীকে। যাকে ফেলে গেল তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে না কেউই। মানুষখেকো বাঘ ত অনেক জঙ্গলেই আচে কিন্তু এমন বনের তুলনা লাই।

বুকের আধখানা ফেলেই যাক, নিচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ফেলে যাক তবু একসময়ে এই ভয়াল সুন্দরবনকে পেছনে ফেলে ফিরে যায়ই সকলে একসময়। যখন সবাই ফেরে সেই সময়েই নাকি তোমার সারেং চাচা ভোমরার মত কালো-করে আসা মেঘের আকাশের দিকে ছাইক্লোনএর গন্ধ-মাকা সমুদ্দের দিকি তার ডিঙ্গি বেয়ে চলে যায়। একা। একেবারে একা। অন্য কারো টারান্‌জিস্টারে যখন শাসানি দেয় আবহাওয়াবাবু, "সমুদ্দে মাচধরা পেচণ্ড বিপজ্জনক। জেলেদের সাবধান করা হচ্চে। তিন নাম্বার পতাকা উড়তিচে।" ঠিক তকুনি সারেং চাচা একা ডিঙ্গি বেয়ে কালো মেঘের মদ্দি, কালো জলের মদ্দি, তার লাল লুঙি-পরা আর লম্বা সাদা দাড়ি-ওড়ানো চেহারা নিয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যেতি থাকে। দূর সমুদ্দের হাড়ুম-গাড়ুম শব্দ শুইনে ঘর-ফিরতি আমাদের যখন নাড়ি ছেড়ে যায়, যে-ডাক বাঘের ডাকের চেয়েও ভয়ংকর, তখন সারেং চাচা হাসতে হাসতে মিলিয়ে যায়। পেতি বছর।

তা, ফেরে ককন চাচা?

হোসেন শুধোল।

সে চাচাই জানে। কখনও কখনও দু'তিন বছর ফেরেও না। কোথায় থাকে এই মরণ-বনে? কী খায়, কোন দ্বীপে সে যায়? কী সে খোঁজে? তা কেউই জানেও না, চাচা কাউকে বলেও না। এই কারণেই ত ফরেস্টের

পিটেল-বোটের বাবু থেকে আমরা পেত্যেকেই চাচাকে আল্লারসুলের কাছের লোক বলেই জানি। চাচার কাছে এট্টু থাকতি পারলি বড় আনন্দ পাই।

তোমার ত বয়স বেশি না। তুমি চাচাকে জানো কতদিন ?

তা পনেরো বছর হইয়ে গেল বইকী। দশ বছর বয়স থেইক্যে আসতিচি।

অত ছোইট্যবেলা থেকি ?

কী করি ? বাবাকে বাঘে নিল গোনা ব্লকে। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। বিধবা মা। দুই বুন। তকনই দিদির বিয়ের বয়স হইয়ে গেচিল। আরডা ছোইট। তাই দশ বছর বয়স থেকি আসতিচি। দিদির বিয়া দিয়ে দিইচি। গোসাবাতে থাকে দিদি। এই বছরেই ছোট বুইনটার সাদী দে দেব এমন কতা-বাত্‌রা পাকা হইয়ে আচে। আমার এক পুইত্র এক কন্যে। গত পনেরো বচর আসতিচি এই বহরের সঙ্গে, পেতিবছর এই বহরের সঙ্গেই ফিইরেও যেতেচি চাচার দয়ায়। এইবারেও ফিইর্যে যাব। না ফিরলি চইলবে না। বুনটা আমার কত আশা নিয়ে বইস্যে থাকবে। খুব ভাল দুলহান পেইচি গো। ক্ষেত-জমি-সাইকেল, ইক্কেরে বড়লোকের ঝিংচ্যাক বেটা। বুনটার কপালটা সত্যিই খুব ভাল।

বাঃ বাঃ বলে উঠল হোসেন। জ্যাঠার মত।

সারেং মিঞা তাড়া দিয়ে বলল, গপ্পে গপ্পে যে তোদের হাত থেইক্যে এইল রে। চামটা কি রেতের বেলায় পৌচবি ?

এরফান বলল, আমরা ত ভাবতিচি চাচা, দুকুরে কুনো পাশ খালে কিছু কাকঁড়া ধইর‍্যে নে তাপ্পর রাতটা ইকানেই কাইটে আবার বেরুব। চামটার খালে লিশ্চয় অনেক নৌকো জমেচে। কাকঁড়া-গুলো ভাল দামে বিক্‌কিরি হইয়ে যাবে। আর বিককিরি না হলি, চাল ডাল নুন তেল শুকনো লঙ্কা প্যাজ রসুন কালোজিরে মশলা-পাতি, ই সব ত পাবোই কাঁকড়ার বদলে।

থাকলি, সাবধানে থাকিস। পাশ-খালের ইক্কিবারে মদ্দিখানে

নৌকো আর ডিঙ্গিগুলোন নে পাশাপাশি নোঙর করি থাকিস।

পরক্ষণেই সারেং মিঞা বলল, যাচ্চি না যকন তকন তুই বৈঠে ঢিলে দে। তোদের বহর তোকে ধইরে নেবেখন।

তা নেবে। আচ্ছা, চন্নু তবে সারেং চাচা। আসসালাম ওয়ালেকুম্। হোসেন ভাই, আসসালাম ওয়ালেকুম।

সারেং মিঞা আর হোসেন প্রায় সমস্বরেই বলল, ওয়ালেকুম আসসালাম।

এবার ওরা আবারও দোকা। ওদের নৌকোর চারধারে গোল-গোল কালো কী সব যেন খুব জোরে হুড়ুস্ ফুড়ুস্ শব্দ করে জল ছিটকোতে ছিটকোতে জলের উপর উতোর-চাপান দিতিচে। দেখতে তালের মত। তবে হলদেটে ভাব লাই। শুধুই কালো। আর তালের চেয়ে বিশ-পঁচিশ গুণ বড়ো। পুরোপুরি গোল নয়। পেটটা কম কালো, পিঠটা পুরোই কালো।

ভয় পেয়ে গেল হোসেন। ডিঙিটা এক ধাক্কায় উল্টিয়ে দেবে না ত? ওর চোখ-মুকের অবস্থা দেখে সারেং মিঞার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

শুকনো গলাতে হোসেন শুধোল, চাচা, কী এগুলো? দেকিনি কক্কনও।

তা টিক। তোদের বিলে ত এসব থাকে না। এগুলোর নাম শুশুক। এরা বড় বড় নদীতে থাকে। মাছ ধরে খায়। মজার পেরাণী। হুড়গুম্-হুরগুম্ করি জলের মদ্দি ধুম-ধাড়াক্কা লাইগ্যে দিয়ে সুন্দরবনের এই স্তব্ধ নিঃশব্দ একঘেয়েমি মাজে মাজে কাইট্যে দেয় এরা। এরা যকন কাচে থাকবে তখন নিশ্চিন্ত হতি পারো যে ধারে-কাছে কুমীর লাই। কুমীর এদের ধরতি পারলি হলো। ইকিবারে চাটনি কইরে খায়।

ধরতি পারে না কেন?

আরে বড় হুঁশিয়ার জানোয়ার এরা! তাছাড়া ডাঙ্গার মধ্যে চলা আর জলের মধ্যে চলায় ত তফাৎও আচে। জলে রোগা-প্যাংটা মানুষও কত ভারী হয়ে যায় জানিসনি? অত বড় বড় কুমীরেরা ছুইটে পারে শুশুকদের সঙ্গি?

জলের মদ্দি আর কিকি আচে, চাচা ?

আরও কত কী আচে। বড় বড় জলের সাপ আচে। চিত্র বিচিত্র। উদ দেকেচিস ? উদবেড়াল ? ই দিকের জলে বড় একটা দেকা যায় না। হাঙ্গর, কামট আর কুমীরের জইন্যে কি তাদের বেঁচে থাকার জোটি আচে ? তবে হ্যাঁ উদবেড়ালের খেলা দেইখতে পেতাম বিহারের গঙ্গাতে। শীতের দিনে দু পাশের বালির উঁচু পাড়ের গর্তি সেঁদিয়ে বসে গোঁফ-জোড়া লাইচ্যে লাইচ্যে ইতি-উতি চাইত, আর গতিক সুবিদে লয় দেকলিই উপর থে সোজা ডেরাইভ মারত জলে, ঝপাং কইরে। তাপ্পর একটু দূরে আবার সাঁইতরে যেয়ে ডাঙ্গায় উটত। কতায় বলে না, ভেজা বেড়াল। এই উদবেড়ালেরাও ভিজলে একরকম আর শুকনো থাকলি অন্য রকম। বাঘেরই মাসী ত। সব বেড়ালই। বড় বড় ডোরাকাটাও ভিজে গেলে মনি হয় যেন মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো লোম-ওটা, কুকুরটা কেনিং শহরের লঞ্চ-ঘাটার এঁটো খেতে এইয়েচে!

আর কী আছে চাচা জলে ?

আর কী কী আছে তার সব কি আমি নিজেই জানি ? কতটুকুই বা জানি ? জিন আছে। হুরী-পরী। মানুষকে মারার বন্দোবস্তর ইকানে কোনো ক্রুটিটি লাই। ইকানে যে জান-বাঁচায়ে ফিরে্য যাওয়াটাই এক দুঘঘটনা। বুয়েচো হোসেন। খুদাহতাল্লার বোধহয় ইচ্ছাই ছিলো না যে এই বেহেশত্‌এর লা-জওয়াব বনে আমাদের মত বদর জানোয়ারের পা আদৌ পড়ে!

বলেই বলল, তুমি ভাবতিচো, সব জেইন্যে শুইন্যে আমি তোমাকে ইকানে এইনেচি কী করতি। কী ? ভাবতিচো না ?

ভাবতিচি। আবার ভাবতিচিও না।

মানেটা কী হল এই হেঁয়ালির ?

মানেটা হল, তুমি আমারে দুনিয়া দেকাবে বইল্যে লিয়ে এইচো। আমি ত ছিলম গর্তের পোক। তুমি আমাকে সেই গর্ত থেইক্যে তুইল্যে এই এতবড় উদার, ভয়াল, চিত্র-বিচিত্র, রহস্যময় জন্নত্‌ আর দোজখ্‌-এর বুলান্দ-দরওয়াজার সামনি এইনে দাঁড় কইর‍্যে দিলে চাচা। তুমারে

লাখ লাখ সালাম। পরবরদিগারের দোয়া না থাকলি কী আমার জীবনে এমন অঘটন ঘটে! তুমার সঙ্গে না এইল্যে পর আমি ত বিতিচি গেরামের নেপো, নিতে, অপু, নৈমুদ্দিন, মোতাহারদের সইঙ্গে ফালতু ফালতু বাকি জীবনটা কাইট্যে দিতাম। নস্করবাবুদের রোয়াব দেইখতাম। আর ঐ মামুলি পরিবেশে "ইনসানও" হব ইমন খোয়াবও দিখতাম। তুমি চাচা, আমারে জিন্দ্‌গী দান কইরেচো। হিঁদুদের বেরাম্বনদের যকন পৈতে হয় তকন নাকি তাদিগের পুনর্জন্ম হয়, শুনিচি। তুমি আমার চে ভাল জানবে। পৈতে হলে, তাদের সংস্কৃত ভাষাতে তারা নিজেদের বলে 'দ্বিজ'। মৎলব কিনা, দুইবার পয়দা হল। সেইরকমই চাচা, আজ এই নীল আকাশের শামিয়ানার নীচে, এই নীলচে-সবুজ জলের অদেখা নদী এই হাজারো-সবুজের ঘের-দেওয়া জঙ্গলের মদ্দি ডিঙ্গি বাইতে বাইতে, এই শুশুকদের খিদ্‌মদ্‌গারীর মদ্দি আমি মোচলমান হইয়েও 'দ্বিজ' হল্যাম। "আখ্‌রতের" দিনে ত সব মোচলমানকেই জবাবদিহি করার জন্যি গোরস্থান ছেইড়ে উঠতি হয় কিন্তু আমার জিন্দ্‌গী থাকতি থাকতিই, আমার জওয়ানি থাকতি থাকতিই সারেং চাচা তুমি আমাকে অন্য এক "আখরত্‌"এর দিনের সামনে এনে দাঁড় কইর্যে দিলে।

হাজার সালামৎ তোমাকে। লাখো সালামৎ।

সারেং মিঞা চুপ করে বইসেছিলো। এতবড় বক্তিমে শুনতে সে অব্যস্ত ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ বিতিচি গেরামের এ ছোঁড়া যে এমন বক্তিমে-বাজ সি খপরও ত তার অজানাই ছেল।

হুঁকোটা হাতে তুইলে নে নতুন ছিলিম লাগিয়ে দেশলাই জ্বাললো সারেং মিঞা।

বলল, তুমি যা বইললে বেটা, তুমি যা বইললে দোস্ত, তুমি যা বইললে বিরাদর, তুমি যা বইললে হুকুমদার, তুমি যা বইললে ইনসান্‌ ইর জন্যি আমারই শর ঝুঁকাতে দিল্‌ করছে তোমার পায়ে। পরবরদিগার ভাবনা দিয়েচেন সব ইনসানকে। নাক দিয়েচেন, চোক দিয়েচেন, জিভ দিয়েচেন, মগজ দিয়েচেন কিন্তু বেশির ভাগ ইনসান্‌কেই সেইসব অঙ্গ

প্রত্যঙ্গর ব্যাভার দেননি। তুমি আজ যিসব কথা বললে বেটা, সিসব লজ্, সিসব পায়েরভি খুদাহতাল্লার রহমৎ ছাড়া ইকেবারে অসম্ভবই চেল। বিলকুলই অসম্ভব। আর সি জন্যিই আমার এমন শর্মিন্দা। আমি জানি, আমি কে! আমি কতটুকু! তাও জানি। আর জানি বলেই ত, আমার এত নজ্জা। সবসময়ে শর ঝুঁকিয়েই থাকি।

সারেং চাচা, তুমি জানো না তুমি কে। ভাবছো বটে যে, জানো। আমি যা বললাম, তুমি তাই।

হো হো করে হেসে উঠল সারেং মিঞা।

বলল, জানো হোসেন, আমার সেই ফওত্ হয়ে-যাওয়া হিঁদু ব্রাহ্মণ দোস্ত লক্ষমন পাঁড়ে, যে কালিঘাটে পূজো চড়াতে এসে কালিঘাটের শ্মশানেই ছাই হল, সে এই চেনাচেনির বাবদে আমাকে একটা কতা বলত। প্রায়ই বলত। তার কতা প্রায়ই মনে পড়ে।

সে ত হিঁদু।

হোসেন বলল, অবাক হয়ে।

তাতে কি? সেও ত ইনসান্। আমারই মত। আর সব ধর্মই ত একই! সব ধার্মিকই ত বিরাদর।

তা সে কী বলত? তাই বলো। তোমার লক্ষমন পাঁড়ে?

পাঁড়েজী বলতো, ওদের হিঁদু ধর্মে, ওদের শাস্ত্রে নাকি একটা কতা আচে "আত্মানং বিদ্ধি।"

কোন্ শাস্ত্র?

এই রে! তাকি আমি জানি! ওদের অনেক শাস্ত্র আছে বেদ, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, রামচরিত মানস। তবে কোন্ শাস্ত্রে এ কথা বলেছে তা বলতি পারব না।

কতাটার মানে কি? আত্মানং বিদ্ধি?

মানে, নিজেকে জানো। তুমি যেমন বললে যে, আমি নিজেকে জেনেচি। নিজেকেই যদি জেনে ফেলতি পারতাম তবে আর জানার বাকি কি থাকত দোস্ত! কত্তদিন থেকে ভেবেচি "গীতা" পড়ব কিন্তু পড়া হয়নি। আমার পড়া হয়নি, কিন্তু আমার দোস্ত লক্ষ্মণ পাঁড়ের কিন্তু

"কোরাণ শরিফ" মুখস্ত ছিল। সমস্ত রুকু, আয়াৎ, বয়েৎ। মস্ত পণ্ডিত মানুষ ছিল পাঁড়েজী।

হোসেন বুজতে পারল যে, সারেং মিঞার একটু 'সেণ্টু' হইয়েচে নইলে এমন যাত্রার কায়দাতে কতা তো সে ককনও বলেনি এতদিন। 'সেণ্টু' হইয়েচে বইলেই এট্টু চুপ মেইর‍্যে গেল হোসেন।

সকালের বাতাসে সারেং মিঞার সাদা দাড়ি উইড়তেচেল। বাঁ দিকের পাশ-খালের দিকে মেলা সাদা বক উইড়তেচে। সজনেখালির পর পাকি-টাকি আর বিশেষ পড়েনি। ইকানে পাকিদের কিসের মেলা বইসলো কে জানে! ইলিকশান এর মীটিং কি? কতগুলো বড় বড় কালো পাকি, কাদা-খোঁচাদের মতন অদ্ভুত ডাক ডাইকতে ডাইকতে উইড়ে গেল বাঁ দিক থেকি ডানদিকে ওদের মাতার ওপর দে।

কি পাকি এগুলো। চাচা?

এগুলানরে কয় কার্লু।

কার্লু! কক্কনো দেইকিনিকো আগে।

সবাই কি সব দেইক্যে ফেলেছে বাজান? জীবনে সবকিছুই একদিন পরথম দেখতি হয়। তোমার জীবন ত পঁচিশ বছরের মাত্র. কত কী দেকার বাকি আচে একনও। কত সুন্দর সব জিনিস, কত ভয়ংকর সব জিনিস, জানতে বাকি আছে কত রহস্য। হতে বাকি আছে কত সুন্দর অসুন্দর অভিজ্ঞতা। তাড়া কিসের দোস্ত?

এরফান্ মিঞা যে শুধু বিয়েই করেচে তাইই নয় তার যে দুই ছেলে-মেয়েও হইয়ে গেচে এই কথাটাই হোসেনকে ভাইব্যে তুললো। অথচ বিতিচি গেরামে তার আব্বা-আম্মী যে তার ছোট ভাইটাকে বিয়ে দিই দিচে, তারাও যে ঘোর সংসারী হইচে সি কতাটাই একেবার মনে ছেলোনি হোসেনের। "সংসারী" যাদের হবার, তারা ঠিকই হয়, টাইমেও। কিন্তু কেন যে হয়; মানে "সংসারী", এই কতাটিই ভেইব্যে পায় না হোসেন।

চাচা, তুমি বিয়ে-থা কইরলে না কেন গো?

হঠাৎ সারেং মিঞাকে শুধোলো হোসেন।

সারেং মিঞা বৈঠা থামিয়ে এক মুহূর্ত দূরের রোদ চিক্‌চিক্‌ করা নদীর বাঁকে চেয়ে রইলো। চোখের মণি যেন ক্যামেরার লেন্স। তাতে সমস্ত নদী, বন, পাকি, ছায়া সব ছবি হয়ে ফুটে উঠল।

কিন্তু মুখে কোনো কথা বইললো না মিঞা।

হোসেন বললো, ভয় পেইয়েচিলে কি? সাহসে কুলোলোনি? আমারই মত?

সারেং মিঞা দুদিকে মাথা নাড়লো।

তবে? রহস্যের মদ্দি যেতে চাইলে না। সকলেই ত বলে বিয়ে হল গিয়ে "দিল্লীকা লাড্ডু। যো খায়া উ পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওভি পস্তায়া।"

নারে হোসেন, সি জন্যিও লয়।

তবে? কী জন্যি?

সকলেই যা করে সারেং মিঞা তা কোনোদিনও করেনি। সকলেই ত করে বিয়ে। বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে হয়, ঘর সংসার করে। তাদের খাওয়াতি পরাতি গিয়ে অধিকাংশ মানুষই নাকানি-চুবুনি খায়।

নাকানি-চুবুনি খাওয়ার চিন্তাতেই কি নিকাহ্‌ করলেনি তুমি? তাহলে, পরের বোজ মাথায় নিয়ে কাইট্যে গেলে কি করি সারাজীবন? কারো বোজাই যদি না বইতে তবে না হয় কথা চেল। এই যে এতো মনিষ্যি তোমায় ভালবাসে, মান্যি-গণ্যি করে তাদের জন্যি কি তোমার কম চিন্তে ভাবনা?

জিভ আর টাগরা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল সারেং মিঞা, ট্‌াক্‌ করে। অধৈর্যসূচক! এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নাড়াল দুদিকে। আপত্তিসূচক।

হোসেন কথা না বলে, সারেং মিঞার মুখের পানে চেয়ে রইল।

সারেং মিঞা আবার বৈঠা বাইতে শুরু করায় হোসেন বলল, তুমি একটু ছিলিম টেইনে নাও চাচা, আমি বৈঠে বাইচি।

পারবি? তোর হাতে ত ঘা হয়ি যাবে।

ঘা হবে, ঘা শুকুবে, ব্যথা হবে, ব্যথা মরবে, এমনি করেই ত নতুন জুতো, নতুন বৈঠে, নতুন কত কিছুই সইয়ে লিতি হয়। সি ভয় করলি

চইলবে কেন। ওঠো তুমি সারেং মিঞা।

সারেং মিঞা বৈঠা ছেড়ে উঠে হালের কাছে গিয়ে বসে পা দিয়ে হাল ধরে এক হাত দিয়ে বইঠে বাইতে বাইতে অন্য হাতে হুঁকো খেতে লাগল।

হুঁকোতে বেশ কয়েকটান লাগানোর পর হোসেন বলল, কই ? বললে না ত।

সারেং মিঞা একরাশ ধুঁয়ো ছাড়ল। তামাকের চিটচিটে গন্ধে নদীর গন্ধ মেশান দিল। সারেং বলল, মনিষ্যি হইয়ে ইকানে এলি ক্যান ই কতাটি কক্কনো ভেইবেচিস ?

কোতায় এলাম বইলচ ? সোঁদরবনে ?

আরে না, না। সোঁদরবনে লয়, পিরথিবিতে!

প্রথমটা হোসেন থতমত গেয়ে গেল একটু। পরক্ষণেই বলল, ইটা আবার কী প্রশ্ন ? সব মনিষ্যিই যি জন্যে আসে সিজন্যেই এইসিচি।

সব মনিষ্যি কি জইন্যে আসে ? পেটের ধান্দা করতি, টাকা রোজগার করতি, বিয়ে করতি, ছেলে মেয়ে পায়দা করতি, মেয়ের বিয়ে দিতি, বুড়ো হইয়ে নাতি-নাতনি কোলে কইরে রোদে পিঠ দে দাঁইড়ে পরনিন্দা-পরচর্চা করতি ? এই জন্যিই কি মনুষ্যি পিরথিবিতে আসে ?

হোসেন মিঞা চুপ করে রইল।

সারেঙ মিঞার মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, মনে পড়ে গেল, হঠাৎই মওকে-পর। বলল, একটা শের আচে, আমাকে পাট্‌নার সুর্মাওয়ালা মুনাব্বর বলেচিল বহুবছর আগে। তখন আমি জওয়ান।

"আদম্ নহী হ্যায়, সুরৎ-এ আদম্ বহত্ হ্যায় হিঁয়া।

মানেটা কি হল ? তা বলবে ত।

মানে হল, মনিষ্যি লেই, তবে মনিষ্যির চেহারার জীব ইকানে বিস্তর। মনিষ্যির চেহারা লিয়ে জন্মালেই ত কেউ আর মনিষ্যি হইয়ে যায় না হোসেন। চাইরদিকে যত মানুষ আমরা দেইকতে পাই, তাদের মদ্দি নিরানব্বুই ভাগই মেসিন। পিসটনের মত। জাঁতা কলের মতো। জীবন পিষে যাচ্ছে সকাল থেকে সন্দে। কী পিষছে ? কেন পিষচে ? কোথা

থেকে এইসেচে ? কোথায় যাবেক সি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা নাই তাদের। যন্ত্রে আর সেসব মনুষ্যিতে তফাৎও নেই কোনোই। মানুষ হতিচে খুদাহর সবচেইয়ে কিমতি, সবচেয়ে পেয়ার-দুলহার এর জীব। তাকে কত্ত অক্লদার করে পাইটেচে পরবরদিগার ইকানে। সেই যদি অন্দের মতোই চললো, অন্দের মতোই শুধু ফজিরের আর জামার, মগরীব আর ঈশার নমাজ পড়ে নিজের আর নিজের বিবি আর আণ্ডা-বাচ্চার খিদ্‌মদ্‌গারী করেই জিন্দ্‌গী কাবার কইরে দিয়ে চইলে যায় ত মনিষ্যি হয়ে জন্মাবার দরকারটাই বা কি চেল ?

হোসেন হেসে ফেলল, সারেঙ মিঞার কথাতে।

একটু উষ্মার সঙ্গেই ও বলল, আজীব কথা বলচ তুমি চাচা। আদম-এর সকল্ নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে বলেই কি সে তার আব্বা-আম্মীর খাল-খরিয়াৎ পুচবে না ? বিবিজান-এর আরাম-সুবিস্তা দিকবে না ? বাল-বাচ্চার আণ্ডা-রোটির বন্দোবস্ত করবে না ? সে ত তাইলে আমার মত বে-কামকা মর্দ হয়ে, গালিই কুড়িয়ে বেড়াবে সারাজীবন ?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসলো সারেং মিঞা।

বলল, তুই বেকাম্‌কা আদমী বলেই ত তোকে রেখেছি সঙ্গী হিসেবে। জানি না, তোর দৌড় কতটুকু। কতদূর যেতে পারবি তুই। তবে এক বিশেষ পথে চলবার এলেমটুকু তুই অর্জন করেছিস। বাকিটা খুদাতাল্লার দোয়া।

হোসেন, সারেং মিঞার কথার মানে পুরো বুজতে না পেরি বৈঠে বাইতে বাইতে সামনের জলের দিকে চেয়ি রইল। নদী বাঁক নিয়েচে। প্রায় সমকৌণিক বাঁক সামনে। জলের মধ্যে লক্ষ সূর্য ঝকমকাতিচে।

সারেং মিঞা স্বগতোক্তির মত বলল। দোষ ত তোর অনেকই। আমার দোষ আর ভুলও ত পাহাড়-প্রমাণ। ছেইল্যে বয়স থেকি আজ অবধি যা করলাম, যত মর্দ-আওরাৎ এর আঁসু বওয়ালাম তার ত কোনো লেকাজোখা নেই। তবে কথাটা কী জানো হোসেন, যিনি দুনিয়ার সব দোষ-গুণের বিচারক তাঁর বড়ই দয়া। পাটনার সুর্মাওয়ালা মুনাব্বর আরও একটি শের বলত, ভারী দিলচস্‌পি শের :

"গলতিয়াঁ করতা হুঁ জী ভর, ইস্ লিয়ে
বকশিসোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ্ হ্যায়।

মানে কি হল? যেমন হিন্দুদের সংস্কৃত অং-বং। তেমন আমাদের এই উর্দু-ফার্সী। ফোঁস-ফোঁস করে শুধু।

সারেং মিঞা হেসে বলল, এই তিন ভাষারই জুড়ি নেই রে বেয়াকুফ্। তুই মুক্যু তাই ই-কথা কইচিস। ইংরেজরা চলি যাবার পর যদি এই তিনভাষার ঠিকমত চর্চা হত হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে তাহলে দেখতি তুই দেশিই কতদূর এইগ্যে গেচে। ইংরেজদের নকলনবীশ হয়েই ত ই অবস্থা হল আমাদের।

আঃ চাচা, শের-এর মানেটা ত বলবে! মৌলবী সাহেবদের কাছ থেকে চিরদিন দূরে দূরে থেইক্যেও দেখচি কপালে দেদার দুঃকু। জলে কামট-কুমীর, ডাঙ্গায় সাপ বাঘ আর নৌকোতে তোমার মত মৌলবী। তওবা! তওবা!

হোসেন বলল।

সারেং মিঞা হেসে ফেলল ওর কথাতে। বলল্, শোন্—

তুমার দোয়ার উপর, ক্ষমার উপরে যে আমার অগাধ ভরসা!
তাই না জিন্দগী ভর শুধু ভুলই করে এলাম!
শুধু ভুলই করে এলাম!

॥ ৬ ॥

দুপুরে বড় চামটা আর দুগ্যাদোয়ানী খালের মুখেই নৌকো ডিঙ্গি সব বেঁধে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছিল হোসেনরা। কলিমুদ্দি কালু মিঞা আর এরফানরাও। চালে ডালে ফুটিয়ে খেয়েই আবার ডিঙ্গি ছেড়ে দিল। তারপর কাঁকড়া ধরবে বলে ওরা পাশের একটি বড় শিষখালে ঢুকে গেল। হোসেনরা এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যের মুখে মুখে বড় চামটার খালের মধ্যে ঢুকে যেখানে সারে সারে নৌকো সব মাঝনদীতে নোঙর করা ছিল তাদেরই পাশে গিয়ে নোঙর করল। আধো-অন্ধকারে দু-একজন চিনতে পারলেও অধিকাংশই সারেং মিঞাকে চিনতে পারল না।

হোসেন দেখল, রেঞ্জারবাবুর লঞ্চও তারই মধ্যে নোঙর কইর্যে আচে। সাদা ফুটফুটে রঙ। যেন, বিরাট এক রাজহাঁসটি।

এখন শুক্লপক্ষ। আজ হয়ত নবমী দশমী হবে। সূর্য পশ্চিমের বনে ডুবতি না ডুবতিই একেবারে নিঃশব্দে কিন্তু রৈ রৈ করে চাঁদ উটল। ডাঙ্গার জঙ্গলে চাঁদের এক রূপ আর জলের জঙ্গলে অন্য। জলের মদ্দি হাজার হাজার চাঁদ ঝকমকাতি লাগল। মায়াঞ্জন লেগি গেল যেন একেবারে হোসেনের চোকে। এমন জলজ সৌন্দর্যে, এমন গা-ছমছম-করা জিন-পরীদের দেশে ককনও আসেনি সে আগে।

"বিবির বিল" বা "জলপিপির জলাতেও" চাঁদের সৌন্দর্যর কোনো তুলনা হয় না। সিখানে কত রাতে একা একা পূর্ণিমার চাঁদ-ভাসি বিলে তার ডোঙ্গা বেয়ে সৌন্দর্যে বুঁদ হইয়ে ফিরেচে হোসেন। কত আশ্চর্যি

সব শব্দ, গন্ধ, সেই সব পূর্ণিমার রাতে। বড় মাছের ঘাই মেরে যাওয়া। চাঁদের আলোতে ঝকঝক-করা রূপোলি আয়নার কাঁচকে দু টুকরো করে উপুরে উপুরে কালো ছিপছিপে সাপ সটান সাঁতরে গিয়ে তাকে নড়ায় কীভাবে তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেচে ও। ডোমকুর, কামপাখি, জলপিপি, পানকৌড়ি, সল্লি হাঁস এবং ডুব-ডুবারা রাতের বেলা ঘন হয়ে বসি কী সব স্বগতোক্তি করে, সি সবও শুইনেছে হোসেন। মরা গাছের কালো ডালে সব জীবন্ত সাদা বকেরা ফুলের মত ফুইট্যে থেইকেচে আর মরা পেয়ারা গাছের সাদা ডালে চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত রূপোলি আকাশের পটভূমিতে পানকৌড়িরা কেমন গলা-উঁচিয়ে অন্য দিগন্তের প্রহরীর মত বসি থাকে তাও সে দেইকেচে। আলেয়া দেখেচে বাদার ওপরে ওপরে। সি সব অবশ্য আঁধার রাতে। আলেয়াই, না মনসুর-চাচার বিধবা মেয়ে সালমা ? যার সঙ্গে তার সালমার মাঝবয়সী ল্যাংড়া ফুকার পীরিত ছিল, সেই ? মালসাতে আগুন জ্বেলে আসত নাকি, যাতে আলেয়া ভেবে, মানুষে কাছে না আসে ভয়ে। আসত, সালমা কৃষ্ণপক্ষের রাতে শরীরের খিদে মেটাতে। সে খিদেটা কেমন তা হোসেন জানে কিন্তু খেয়ে কখনও দেকেনি। তার মনের খিদে নিয়েই সে বেশি ব্যতিব্যস্ত।

হুরী-পরীরা "বিবির বিল"এ পূর্ণিমার রাতে নাকি চান করতি নামত। সব পোশাক-আসাক বিলের পারে খুলে রেকে তারা জলকেলি করত তাদের সোনারপারা অঙ্গ নেইড়ে নেইড়ে, বিলের মদ্দি তরঙ্গ তুলে তুলে। সেই দৃশ্য একবার চুরি করে দেখে গজানন হাজরা চিরদিনের মত অন্দ হয়ে গেচিল। দু চোখই অন্দ। সে কথা জেনিও হোসেন কত রাত চুপ করি বিলের মধ্যি ডোঙ্গা লাগায়ে ঝাঁঝির মদ্দি মড়ার মত চুপ কইর্যে বসি থেকিচে। অন্ধ হয়ে গেলেও তার দুঃক ছেলো না কোনো। যদি দেকতি পেত জিন-পরীদের।

কিন্তু পায় নি।

সি সব ভয়, সি সব গা-ছমছমানি, এই চামটার খালের দম-বন্ধ ভয়াবহতার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়।

কত লৌকো, ডিঙ্গি, ছিপই যে না নেগেছে। বড় বড় মহাজনী লৌকো, কাঠুরেদের গোলপাতা-কাটিয়েদের। কোনো ডিঙ্গিতে কেউ গান ধইরেচে নিজের মনে। কোনো নৌকোর জালিবোটে রান্না হতিচে। গাবুক-গুবুক কইর‍্যে মশলা বাইটচে কেউ। কষে লঙ্কা-প্যাঁজ-রশুন দে ক্যাকঁড়ার ঝোল বানাবে মইন্যে হয়। বড় নৌকোর পাটাতনে কত কিছুর মীটিং বইসেচে। কেউ গলুইয়ের কাচে বসে পা দিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে লাইলনের সুতো ড্যে জাল বুইনতেচে।

রেঞ্জার সাহেব তাঁর বোটের দোতলার ডেকের পরে ইজিচেয়ার পাতি বসে আছেন সাদা লুঙি আর এট্টা হাত কাটা সাদা গেঞ্জী পইর‍্যে। হোসেনদের ডিঙ্গি নৌকোতে বইসে দোতলা বোটের রেঞ্জার সাহেবকে ভগমান বলি মনে হতিচে। তাঁর বাবুর্চি তাঁর জন্যি "খানা" বানাইতিচে। গড়গড়ার আলবোলার নলি রইয়েচে তাঁর হাতে। গুড়ুক হুড়ুক করি টান মাইরতিচেন আর সি তামাকের গন্দে চামটার খাল ম-ম করি উইটতিচে।

হোসেন নাক তুইল্যে গন্ধ নেতিচেলো। তামাকের। চাঁদের রাত বলি সাদা ধোঁয়া ঠিক ঠাঃর হচ্ছিলো না। কিন্তু গন্ধ জব্বর।

সারেং বললো, কী তামাক জানিস ?

কী তামাক ?

এ হলো ত্রিপুরার তামাক। এই রেঞ্জারবাবুর বাড়ি আগরতলা। সিখান থিকে 'খাম্বীরা' তামাক আনান বাবু। বাবু ভারী শৌখিন। বাদায় এক বউ, কেনিং টাউনে এক বউ আর আগরতলায় আরেক বউ।

এতো বউ! তা বউ খেয়ি থাকলিই পারে! তামাক লাগে কী কাজে ?

তা আমি বলি কেমন কইর‍্যে।

তা খাম্বীরা তামাকটা কী জিনিস বটে ?

হাঃ। খাম্বীরা তামাক!

তুমি কি আগরতলাতেও গেছ নাকি ? সিটা কোন্ দেশ ?

আরে মুক্য। সিটা ত্রিপুরা রাজ্য। ইংরেজ সায়েবরা উচ্চারণ করত 'টিপারা' বলে।

ত্রিপুরা, টিপারা কেন?

তা আমি কী করে জাইনব।

তা বলো সারেং, খাম্বীরা তামাকের কতাই বলো।

জটাবংশী, জষ্টিমধু, পামেলা, একাঙ্গী, জয়ত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, চুয়া, চিনিরাব, সবরী কলা এই সবের মিশেল দেতি হয় তামাকের সঙ্গে। তবে হয় খাম্বীরা তামাক।

ফিরিস্তি শুনে হোসেন হাঁ হয়ে গেল। সারেং বললো, কী খাবি?

না খেলেও হয়।

তা কেন! সোঁদরবনে এইস্তি একবেলাও না-খেয়ে কেউই থাকে না। কে বলতে পারে এই খাওয়াই শেষ খাওয়া কি না।

মুড়ি খেলিই হয়।

কেন, চালে ডালে খিচুড়ি চাপায়ে দিতেচি। আলু প্যাজ সেদ্ধ হইয়ে যাবে এক্ষুনি। তুই চাপা, আমি বইলে দেবকন। রান্না করা আবার কী এমন কাজ। তবে ভালো রান্না করা খুব কঠিন কাজ। কাজের মত কাজ। তা আমাদের তেমন রান্নাতে দরকার নাইতো। যেনতেন পেকারেন ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল্যেই হল। ই সব যত বাদ দেতি পারবি, যত কর্ম করতি পারবি, ততই দেখবি, হালকা হতিচিস। থাক থাক, খিদের মুখে ইসব ভারী বাইক্য তোর হজম হবে না। নে, চাপা।

খিচুড়িটার বেশ গন্ধ ছেড়েছে। পাশের নৌকোতে কে যেন মসুরের ডালে রসুন কালোজিরে কাঁচালংকা ফোড়ন দিল। আঃ! এ যেন "খাম্বীরা" তামাকের গন্ধকেও হার মানাল। ঠিক সেই সময়েই ঝপ্পাং করে একটা আওয়াজ হল। মসুর ডালের নৌকোর পরে যে গোলপাতার মহাজনী নৌকো চেল তার সঙ্গের ছোট ডিঙ্গি থেকে। মশলা বাটচিলো কেউ। ঝপাং শব্দের সঙ্গি সঙ্গি মশলা বাটার আওয়াজও থেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল, চিৎকার—

নে গেল রে! গোবিন্দকে নে গেল হারামীটা! মামারে!

কে গোবিন্দ, কে হারামী, হোসেন কিছুই বুঝতে পারল না। দেখল ফুটফুটে চাঁদের আলোতে ভাসা মাতলার খালের মধ্যে একটা পেকাণ্ড ফুটবলের মতো কালো গোল কী জিনিস লক্ষ লক্ষ রূপোর সাপে কিল-বিল করা নদীর মধ্যে সাপগুলোকে কেটে টুকরো করতি করতি একটা মানুষের কাঁধ আর ঘাড়ের মদ্দিখানে কামড়ে ধইর্যে সাঁতরে যাচ্চে উত্তরের পারের দিকে। বাঘটা কোনদিক দিয়ে সাঁতরি এলো খাল-মাঝে, কেমন করি এতজোড়া চোকের কোনো চোখে ধরা না দে আর কোন্ দুঃসাহসে মহাজনী নৌকোর সঙ্গি বাঁধা ডিঙ্গিতে বসি মশলা-বাটা মানুষকে মুখে তুলি নেয়ি চলি গেল তা ভাবাই যাচ্চে না।

মহাজনী নৌকোর পাটাতনে বসে কম করে দশজন মানুষ গপ্প করচেল। হরিণ মেরেচিল লুকিয়ে। তার মাংস আর ঝোল খাবে তারই অপেক্ষাতে ছিল। অথচ তবু বাঘ ভ্রুক্ষেপ করলো না।

চার-পাঁচখান নৌকো নোঙর তুলে বাঘের পিছা করলো চিৎকার করতি করতি। যেন চিৎকারে ভয় পেয়ি বাঘ গোবিন্দকে ছেড়ি দিবে।

রেঞ্জার ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাঁর দোনলা বন্দুকে চারবার গুলি পুটোলেন।

সারেং মিঞা বিড় বিড় করলো।

বললো, শব্দে কি আর সোঁদরবনের বাঘ ভয় পায়? শব্দে তারা কাছে আসে।

তুমি কিছু কর সারেং চাচা। তোমার বন্দুকটা…

আমার বন্দুকটা বে-পাশী! তাছাড়া গোবিন্দ একন সব করাকরির বাইরে চলে গেচে।

কী করে বুঝলে?

জানি, তাই। বাঘ যখন ড্যাঙ্গাতে পৌঁচে ওকে নামাবে তখনই গলগল করে রক্ত বেরুবে। শ্বাসনালী, ফুসফুস অথবা হৃদয় তার ফুটো হয়ে গেচে। যদি এই গোলমালের কারণে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে না পারে খাওয়ার জন্যে, তবে পারে উঠেই ওকে মাটিতে নাইমিই শেয়ালে যেমন করি কইমাছ চিবিয়ে মাঠের আলে ফেলি যায় কইমাছের মাতা; তেমন

কইরে গোবিন্দর মাতায় এক কামড় দিয়ে কইমাছের মাতারই মত ফেলি যাবে।

ঈসস্। বইলচো কি চাচা।

বাঘ ততক্ষণে পারের কাছাকাছি পৌঁচেচে। এত গোলমাল, বন্দুকের আওয়াজ, প্রায় দেড়শ মানুষের চিৎকার এত সবের কোনো প্রভাবই পড়লো না বাঘের উপরে।

হোসেন খিচুড়ি সেদ্ধ হলো কিনা দেখতে যেতেই ওর মদ্দ্যি, ওর শিরদাঁড়া বেয়ি ভীষণ এক ঘৃণা সিরসির করে নেমি গেল। ঘৃণাটা ওর নিজেরই প্রতি। একটি মানুষ মরতি বসেছে যদিও, তবু একনও প্রাণ আচে, সি কতা জেনেও ও খিচুড়ি নিয়ে রয়েচে।

সারেং বলল, এই বেলা দুতিন-চামচ ঘি ফেলে দে। স্বাদ ভাল হবে'কন।

সেই মুহূর্তে তার গুরু, তার পূজ্য, তার ফেরেস্তা, সারেং মিঞার ওপরে তার ভক্তি চটে গেল।

হোসেন কতা বলতি পারল না। থুথু আটকে গেল ওর গলাতে। ঠিক সেই সময়ে রেঞ্জার সাহেব আরও দুটি গুলি করলেন। উনি বাঘের উদ্দেশেও গুলি করতে পারছিলেন না পাছে মানুষটির গায়ে লাগে। তাই শূন্যে শব্দ।

হোসেনের চোখে জল এসি গেছিল। ও ভাবচিল শূন্যে শব্দই সার। শুধু সোঁদরবনেই নয়। কত বদমাইস, ইতর, সুদখোর, অত্যাচারী মানুষকে ও নিজে হাতে মারতে চেয়েছিল। মারতে ত পারেইনি, নিজেকে হাস্যাস্পদ করেছে। শূন্যে চোট করেছে কল্পনার বন্দুকে। ছ্যাঃ।

একটা সময়ে তাড়া করে যাওয়া নৌকোগুলি ফিরে এল। গোবিন্দর লাশ সঙ্গে নিয়ে। সারেং মিঞা যা বলেছিল টিক তাই। গোবিন্দর মাথা কই মাছেরই মত চিবিয়ে ওকানেই গোবিন্দর উষ্ণ লাশ ফেলে রেকি গেচিল বাঘ।

একসঙ্গে অনেকেই কথা বলছিল। বলছিল, গোবিন্দকে নিয়ে ফিরে যাবে ওর গ্রামে। বিয়ে করেছে তিনমাস। বিধবা মা আচে। গ্রামে দাহ

করবে।

সারেং মিঞা গলা তুলে ধমক দিল।

বললো, বাঁচাতে পারলি নি। বাঘকে মারতি পারলি নি! আর ফোলা-পচা লাশ নে গিয়ে মা আর পোয়াতি বউকে দেখাবি! সাব্বাশ তোরা। পুরুষ মানুষ। কাল আলো ফোটার সঙ্গি সঙ্গি গোবিন্দকে জ্বালাবি তোরা ঐ কেওড়াগাছের তলে।

ততক্ষণে গোবিন্দর জায়গাতে অন্য একজন হরিণের মাংসের জন্যে মশলা পিশতে লেগেছিল। পেটের জন্যিই ত সব। এতো কষ্টে, এতো ঝুঁকি নে সোঁদরবনে আসা! যে গেছে সে গেছে। নিয়তি নেচে তাকে। তা বলি যারা রইয়্যে গেল তারা কি হরিণের মাংস খাবে না?

হোসেন ধরা গলায় সারেং মিঞাকে শুধোল, তুমি চিনতে নাকি গোবিন্দকে?

চিনতাম? ওকে ন্যাংটো দেকিচি আমি। ওর বাপ আমার সাঙাত চেলো। ওর বে'র সময়েও গেইচেনু ওদের গেরামে। ভোজ খেয়ে এইসেছিলাম।

তুমি যাবে না ওর গ্রামে?

নাঃ। আর কী হবে। কী আছে ঐ গ্রামে। জীবিকার সন্ধানে এসি একটা মনুষ্যি মইর‍্যে গেল তা এ নিয়ে এতো থ্যাটারের কি আচে? কইলকেতা শহরে যারা অপিসে কাজ করে, তাদের মধ্যে বছরে কতজন বাস ট্রাম মিনিবাস ট্রাক চাপা পড়ি মরে অফিস যেতি-আসতি সি খবর কেউ নেয় কি? সোঁদরবনের বাঘে খেইয়েচে বলেই কেঁইদে বেড়াতি হবে আর ভবানীপুরের যোগব্রত ঘোষ, আপার ডিবিসান ক্লার্ক, পি. জি. হাসপাতালের সামনে মিনিবাস চাপা পড়ে মারা গেলি কাঁদতে হবেনি ইটা কি কতা। মৃত্যু; মৃত্যুই। রুজি-রোজগারের জন্যি সকলকেই মৃত্যুর জন্যি তৈরী থাকতি হয়। এ নিয়ে কাব্যি যারা করে সে শালারা মনুষ্যিই লয়। এই তোকে বলে দিলম। নে, এবার খিচুড়ির হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে ঘি ঢাল আর এট্টু।

॥ ৭ ॥

ছইয়ের মদ্দি শুইয়ে থাকায় অন্ধকার অন্ধকার ঠেকতেচেল। তার উপরে সারেং চাচা আবার লুঙ্গিখান ধুয়ে ছইয়ের উপরেই মেইল্যে দেচিল। তখনও হারিকেনটা জ্বলতিচে। ফিতে অবশ্য খুবই নামানো আচে।

চোখ খুইল্যেও ভাবল হোসেন। ভোর একনো হয়নি বোদয়। তারপরই, বাইরের নানা আওয়াজে বুজল যে, সকলে উইট্যে পইড়েচে : ও একাই শুয়ে আচে।

তবে কালরাতে কেলাস্তিও চেল কম লয়। দুটি হাতেই ফোস্কা পইড়্যে গেছে। একটু গ্যাঁদা পাতা থাকলি বেশ হত। গ্যাঁদা পাতার রস ছেঁচি দেলে ঘাটা তাড়াতাড়ি শুকুত। কিন্তু ই রাজ্যে গ্যাঁদা পাতা লাই। তবে অন্য পাতা থাকতি পারে অবশ্যই। সারেং মিঞাকে জিগোতি নজ্জা কইরচে।

বাইরে আসতেই দেকল, কাল রাতে গোনা-গুণতিহীন নৌকো চেল। এখন প্রায় লাইই! রিঞ্জার সাহেবও বোট খুলি নে সজনেখালির দিকে চইলে যাবার তোড়জোর করতিচেন। গোবিন্দর লাশ সঙ্গে নে যাবেন ডিপার্ট আপিসে। সিখান থিকে পুলিশ লাশ কাটা ঘরে নে যাবে। কত ফ্যাচাং। মইর‍্যেও শান্তি লাই। সিখান থেকি কইলকাতায় খবর দিবেন। কইলকেতা থেকে বড় শিকারিদের ইকানে আসার জন্যি ডি. এফ. ও. সাহেব কনসার্ভিটর সাহেবকে বইলবেন।

জেলে, মউলে, কাঠুরে, সকলেই নাকি বইলেচে যে, চামটাতি

ইবছর যেমন উপদ্রব তেমন উপদ্রব আর ককোনো নাকি হয় নি আগে। বহর সব আসি পৌঁছাতি পৌঁছাতি চারজন ফওত্। কাণ্ড দ্যাকো ইকবার। এর একটা হেস্তনেস্ত না করলি তারা সব চামটা ছেইড়্যে চইল্যে যাবে। পয়সা দিয়ে মধু পাড়ার, কাঠ-কাটার, মাছ ধরার পাশ কইর‍্যেচে আর সি পইসা কি তাদের মাঠে মারা যাবে?

তাছাড়া খাবেটা কি তারা? সারা বচর ত এমনিতেই খেতি পায় না। বছরের মদ্দি তিন-চার মাসের সাশ্রয়; তাও কি হবার লয়?

রেঞ্জার সাহেব সারেং মিঞাকে ডেইক্যে পাইটেচিলেন বোটে। হোসেন যখন ঘুম ভেইঙ্গে উঠলো তখন চাচা বোটে। পাশের নৌকো থেকি শুনল, কাল রাতে যে সারেং একানে চেল তা রেঞ্জার সাহেব জানতেনই না। রেঞ্জার সাহেব তাকে ভাল ভাল বিলিতি টোটা দেলেন সরকারী রসদ থেইক্যে। ইংরিজি ইলী-কীনক কোম্পানির। আমেরিকান রেমিংটন কোম্পানীর প্লাস্টিক শেল-এর নানারকম বল্ আর এল জি। আর "বলই" বা কত্তরকম! রোটাক্স, লেথাল, স্ফ্যেরিক্যাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারী সুন্দর দেকতি গুলিগুলোন। বিভিন্ন রঙের। জলে ভিজে গেলেও নাকি ক্ষেতি নাই কোনোই, বইললেন সারেং মিঞাকে, রেঞ্জার সাহেব। কইলকেতা থেকি বড় শিকারিরা না-আসা পর্যন্ত তুমি ফরেস্ট ডিপার্টের মানটা কোনোক্রমে বাঁচাও সারেং। তুমি যা করতি পারবে, কইলকাতার শিকারিরা তা পারবে না।

সারেং মিঞা পত্যুত্তরে বইললো, কিন্তুক বাউলে ত ইকানে অনেকই আচে সায়েব। তাদের বন্দুকও আচে। আমি এখন বুড়া হইচি আর শিকার-টিকার সত্যিই করি না। আমি তো বাউলেও নই, শিকারিও নই, তাচাড়া শিকার ত সত্যিই ছেইড়্যেই দেচি বহুকাল। আমাকে এ ভার কেন দেন্ সাহেব?

তুমি কী, আমি জানি সারেং। তুমি কী তা জানি বলিই তোমার বে-পাশী বন্দুকের কতা ফরেস্ট ডিপার্টের সকলে জানলিও কেউ কিছুই

বলে না তুমাকে। তুমি আমাদের বিপদে যদি একটু মদত না দাও তাহলি তুমার ত এমন মুসাফিরের মত সোঁদরবনের যত্র তত্র ঘুরে বেড়ানো আর চইলবে না।

আমি ত কারো কোনো ক্ষেতি করি না বাবু। না ডিপার্টের, না বনের প্রাণীদের। আমার উপরে ডিপার্টের রাগটা কিসের?

এবারে বেশ রেগে গিয়েই বললেন রেঞ্জার সাহেব, তুমি কিছুই যদি না কর তবে বছরের মধ্যে ন মাস, ককনও ককনও বছরের পর বছর এই ভয়ানক বনে, সমুদ্দুরে, নানা দ্বীপের মদ্দি যি-সব জায়গাতে আমাদেরও কারোই পা পড়েনি দশ-বিশ বছর সিসবখানে, শিষখালে তুমি কি করো? তুমি কি কুনো গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েচো নাকি হোসেন? কোনো ডাকাত-টাকাতের? বা রাজা প্রতাপাদিত্যের কোষাগারের?

হোসেন চাচা হেসে বইলেচেল, তা বলতি পারেন আপনি বটে সাহেব। গুপ্তধনেরই খোঁজ পেয়েচি। তবে, তা সোনাদানা লয়। সে ইকেবারে এক অন্য গুপ্তধন। সে গুপ্তধন এক জীবনে খরচ করি ফেইলব যে, এমন সাধ্য আমার কি? রাজা-রাজড়াদেরও লাই আর আমি ত কোন্ ছার?

তবে কী করতে আস তুমি সারেং মিঞা? তুমি কি বাংলাদেশের গুপ্তচর?

হাঃ।' বলে' হেসেছিল সারেং মিঞা।

তারপর আরও জোরে হেসেচেল।

বলেচেল, গুপ্তচর অবশ্যই! তবে সেও বলতি গেলে এ গুপ্ত-ধনেরই মত। যার গুপ্তধনের দেখ্-ভাল করি তার হইয়েই গুপ্তচর-গিরিও করি। সব দেশ, আমাদের চিনা জানা সব ধন, যে, আমাদের চিনা-জানা কারো দখলের মদ্দি নাও থাকতি পারে এমনটা কি আপনের ভাবনার মদ্দি নাই? যে জ্ঞানে দেশ চলে, ফরেস্ট ডিপার্ট চলে, ইপার-বাংলা ওপার-বাংলা চলে, তারও বাইরে অনেক দেশ আছে, তাদের ধারণার আর জ্ঞানের বাইরেও অনেক ধন আছে; মান আছে।

সি-সবের ধারণাও যে সবার পক্ষে করা সম্ভব লয় সাহেব। ই-সব আলোচনা বাদ থাকুক। তবে কথা দিইতেচি যে, আপনে বা আপনাদের কইলকেত্তার শিকারিরা সব না-আসা পযযন্ত আমার দ্বারা যতটুকু হয় তা আমি কইরব। আপনার খপর না-পাওয়া পর্যন্ত এই চামটা ছেইড়্যে কোথাওই যাব না আমি। কথা দেলম আপনাকে।

তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাব?

কথাটা বলেই রেঞ্জার বুঝলেন যে, ভুল হল। ইকানে টাকা ত কাগজই!

পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে বললেন, কিছু আলু-প্যাজ আছে বোটে, কুমড়োও আছে আধখানা, মশলাপাতি, নুন নংকা। খাবার জল চাই? মোরগা নেবে সারেং? এক জোড়া পইড়্যে আছে পা-বাঁধা।

সারেং বলল, নাঃ। কী হবে।

তবে কি নাই? কী দিতে পারি তোমাকে আমি?

এট্টু খাম্বীরা তামাক যদি দে যেতিন!

খাম্বীরা!

অবাক হলেন রেঞ্জারবাবু। বললেন, তুমি এই তামাকের নাম শুনলে কোত্তেকে? আমি যে খাম্বীরাই খাচ্ছি তাই বা কে বলল তোমায়?

বলল বাতাস, বলল সুবাস।

তারপর হেসি বলল, দুই জিনিস ককখনো লুকোনো যায় না সাহেব।

কি কি?

সুবাস আর পীরিতি। তারা যে আচে, তা বোজা যাবেই।

কাল রাতের নদীর বাতাসে গেঁয়ো, গরান, কেওড়া, ওড়ার ফুলের গন্ধ ইক্কিবারি মেলান করি দে আপনের তামাকের গন্ধ ভাসতিচিল বাতাসে। আমিও যে ত্রিপুরা রাজ্যে ছিলাম পাঁচ বছর।

কি করতে সারেং মিঞা তুমি সেখানে? আশ্চর্য! তুমি সেখানে

ছিলে আগে কখনও শুনিনি ত।

ত্রিপুরার মহারাজের অনেক শিকারির একজন ছিলাম।

বল কি?

খুব খুশি হলেন রেঞ্জার বাবু। নিজের দেশের কথা শুনে, সে পাহাড় জঙ্গলের দেশে যে-মানুষ একসময় ছিল, তাকে বাংলার এই সুদূর ভয়াবহ জলজ রাজ্যে দেখতে পেয়ে যেন নিজের দেশের মাটিরই গন্ধ পেলেন।

হেসে বললেন, এনে দিচ্ছি। বেশি পাবে না কিন্তু। আমার স্ত্রী নিজে হাতে বানিয়ে পাঠান আমার জন্যে।

বোটএর নোঙর তুলে চলে গেলেন রেঞ্জার সাহেব। চলে যাবার সময় সারেং মিঞা তার নৌকোতে দাঁড়িয়ে বলল, খুদাহ হাফিজ।

সারেং ভাবছিল, সাহেব তাঁর ত্রিপুরী স্ত্রীকে খুবই ভালবাসেন। ভালবাসেন হয়ত সোঁদরবনের এবং কলকেতার স্ত্রীকেও! তাদের সীমিত অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ মানুষই বুঝতে চায় না যে, একজন পুরুষের প্রেম-কাম-উষ্ণতা শুধুমাত্র একজন নারীকে দিয়েই ফুরিয়ে নাও যেতে পারে। সব পুরুষই খাঁচার পোষা-পাখি নয়। হয়ত সব নারীও নয়। সারেং মিঞার ছেড়ে যাওয়া বিবি, ফিরদৌসীরই মত। এত বড় পৃথিবী, এত পুরুষ, এত নারী, বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র তাদের স্বভাব, তাদের ভালোবাসার, অবহেলার বা ঘৃণার ধরণ; তা নিয়ে মারামারি করে জীবন নষ্ট করার পেয়োজনই বা কি? খুদাহ্‌র রাজ্যে, ঈশ্বরের রাজ্যে, কোনো কিচুরই ত ঘাটতি নাই। কম তো কোতাওই কিচু পড়ে নি। আর জীবন যখন মোটে একটাই, আপাততঃ ই কতাটা যদি মেনে নেওয়াই যায়, তবে সেই মাত্র একটা জীবন কাইজা-মারামারি করে নষ্ট করারই বা দরকার কী।

মনে মনে, চলে-যাওয়া বোটের দিকে চেয়ে বলেছিল সারেং মিঞা, আহা সুখে থাকেন সাহেব আপনি। সুখে থাকেন আপনার তিন-বিবিগণ। বুঝলেন কিনা সাহেব, এই সুখে-থাকাটাই হল গিয়ে আসল কতা। যে যেমন করে পারে অন্যকে বেশি দুঃক-টুঃক না দিয়ে নিজেও

সুখে থাকুক। সুখে থাকুক সকলেই।

সারেং মিঞা জবু-থবু-মেরে-যাওয়া হোসেনকে বলল, নে, ছুটি গুড়-মুড়ি মুইক্যে ফেলি এবারে বেইর‍্যে পড়ি আমরা। আগে-পিছে বেশ কিছুটা গিয়ে, পাশ-খাল শিষ-খাল সব ভাল কইর‍্যে একটু নিরীক্ষণ কইরে আসা যাক। যে-বাঘটা কাল রাতে গোবিন্দরে নেচিল সিটা থাকে কুথায়? কোন্ দিকে? না, রয়ে গেচে কাছাকাছিই ঘাপটি মেরে?

হোসেনদের নৌকোর পাশেই যে নৌকোটি ছিল সেটি জেলেদের নৌকো। ডানপাশের নৌকোটি মউলেদের। মধু-পাড়ার নৌকো। ওদের দুই নৌকোতেই একজন করে বাউলে আছে। শিকারী বাউলে নয়, দেয়াসী; মন্ত্রজ্ঞ। তারা বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজী কালু রায় বা অন্য কারো মন্ত্র পড়ে দিলে পূজো সেরে দিলে, বনের মধ্যে তবেই নামবে অন্যরা।

সেই দুই বাউলের একজনের নাম মধু। অন্যজনের নাম মুনসের। মধু, মউলেদের নৌকোতে ছিল আর মুনসের জেলেদের। মধু আর মুনসের দুজনেই বলল, তুমি মুড়ি-গুড় খেয়ে নিয়ে আগে চল চাচা। তুমি যিখানে লোকো ভিড়িয়ে পূজো দেতি বলবে, সিখানেই দিব।

ওদের নৌকোর মোরগ দুটোই আলো ফুটতে না ফুটতেই কঁকর-ক-অ-অ-অ করে ঘুম ভাঙিয়েছিল হোসেনের। হোসেন ভেবেছিল, এই খাদ্য-খাদকের অভাবের দেশে সঙ্গে নে এইয়েচে, কেইট্যে খাবে বলে। ঝুড়ি-চাপা দেওয়া কবুতরও আছে দেখল অন্য নৌকোটিতে।

মুড়ি-গুড় চিবিয়ে জল খেয়ে ত ছাড়া হলো নৌকো। আগে-পিছে। প্রথম নৌকোতে মউলেরা আর মধু বাউলে। মদ্দ্যি হোসেনরা। আর পেচনে জেলেরা আর মুনসের বাউলে।

সারেং মিঞা বলচেল, চৈত্রের প্রথমে সুন্দরবন ফলে-ফুলে একেবারে সেজে ওঠে। বর্ষার রূপও বড় চমৎকার। তবে সেই সময় বড় বড় লঞ্চওয়ালাও ইদিক মাড়ায় না। তার নৌকোর কতা ত কোন্ ছার। পেকৃতির একদিকে যেমন রুদ্ররূপ তেমনই আবার স্নিগ্ধ রূপ। বর্ষায়

পেটে কিল দে, সাপ বাঘ কুমীরের পায়ে হাত দে, যদি কেউ থেকে যেতি পারে তবে তার ইনাম যে কী মিলবে তা অভাবনীয়। ভরা-বর্ষাতে সুন্দরবনের বুকের কোরকে বসি বর্ষা কাইট্যে গেচে এমন মানুষ মেলা পাবে না খুঁজে।

চৈত্রর প্রথমে কেওড়া, ওড়া, গেঁয়ো, গরাণ সব গাছই ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। ফুলপটিতলার লাল, নীল, হলুদ-রঙা ফুল। মৌমাছির ঝাঁক আর প্রজাপতির ঝাঁক তখন দলে দলে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মধু খেয়ে খেয়ে ফিনফিনে লাল হলুদ পাখনাতে চৈত্রর রোদ ছিটকোতে ছিটকোতে ঘুরে বেড়ায়। সারেং বলে, কিন্তু বুঝলে সাঙাত, বর্ষার রূপের সত্যিই তুলনা হয় না। নদী খাল শিষখালের রূপের কথা ত ছেড়েই দিলাম, বনেরই বা সে কী রূপ।

ডাইনে দু তিনটে বাঁক নিয়েই মউলেদের নৌকো থেকে মধু বাউলে বলল, ছ্যাখ ছ্যাখ, গরাণ ফুলের মধু খেয়ে ঐ মৌমাছি উড়ল। লাগা, লাগা ডিঙ্গি লাগা যাদব।

ওদের নৌকোর সঙ্গে অন্য দুটি ডিঙ্গিও লাগল।

ওখানে মন্ত্রজ্ঞ বা পুরোহিতকে বলে "দেয়াসী" মধু আসলে দেয়াসী।

সে ডাঙ্গাতে নেমেই বলল, ছ্যাখ ছ্যাখ কী ভাগ্যি তোদের যাদব! ছ্যাখ। ট্যাকের উপরে বাবা দক্ষিণ রায়ের থান পর্যন্ত রইয়েচে। কী চমৎকার থান রে। কারা কবে পেতিষ্টে করে গেচিলো তোদেরই প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। এখনও বাবা রইয়ে গেছেন। গায়ের সোনার বর্ণ যেমনটি তেমনই আছে। ঝড়-জলেও। উপরের ছাউনিটিও প্রায় যেমনটি, তেমনটি আছে। আয় আয়, কাছে আয়!

হোসেন দেকল, হিঁদুদের এক দেবতা। সুন্দর চেহারা। দুগগা মায়ের পুইত্র কার্তিক ঠাকুরের চেহারার চেয়েও ভাল। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ, থাকথাক কুচকুচে কালো বাবরী চুল! তার উপর আবার মুকুট-পরা। কানে কুণ্ডল, কপালে রক্ততিলক, বড় বড় টানা টানা দুটি চোখ, হিঁদুরা যাকে বলে "পদ্ম-পলাশলোচন"। টিকোলো

নাক। গোঁফ জোড়া দুই কান অবধি ছড়িয়ে গেছে। গায়ে তার রাজার যুদ্ধের পোষাক। হাতে মাটি আর সিমেণ্ট মিশিয়ে তৈরী করা একটি মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুকের মত দেখতে বন্দুক। কালো এবং লাল রঙ-করা। পিঠে ঢাল ও তূণীর। বাঘের পিঠে চড়ে আছেন বাবা। তাঁর পাশে প্রায় ওঁরই মত দেখতে, তবে একটু ছোট। এক দেবতা।

ইনি কে চাচা ?

হোসেন উত্তেজিত হয়ে সুধোল।

ইনিই হলেন গিয়ে বাবা দক্ষিণ রায়। বাঘেদের দেবতা। সঙ্গে তাঁর সহোদর কালু রায়।

বলেই বলল, বাবা দক্ষিণ রায়ের পূজো ত তোমাদের বাদা অঞ্চলেও হবার কতা। দেকোনি ?

না ত! ইকেনে এঁকে কারা পেতিষ্টে করল ?

করেচে এই জঙ্গলে আসা মানুষেরাই। কত মানুষের পরিশ্রমে এ সম্ভব হয়েছে বল্ তো দেখি। এখন থেকে হোসেন, তোরে তুইই বলব। তুমি-টুমি বলা আমার অভ্যেস লাই।

আগেই ত বলতি পারতে।

দেখ, মাটির দেওয়াল বানাতে হয়েছে এই মাল বা টঁ্যাকের উপরে। খড়ের নৌকো ইকানে এনে, তা থেকে খড় লামিয়ে সেই খড় দে চাল ছাওযা হইয়েছে। বেশিদিন হয়ওনি ওঁর পেতিষ্টে। দেখছিস না, খড়গুলো সব লতুনই রইয়েচে। সুন্দরবনের এক বর্ষার দাপট সইতে হলে ছুঁড়িও বুড়ি হয়ে যায়।

বলতে বলতেই, উল্টো দিক থেকে একটি জেলে নৌকো আইস্তা আইস্তা বেইরে এল। সে নৌকার আরোহীরা হোসেনদের সবাইকে দেখে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

ততক্ষণে মধু বাউলে বাবার সামনে হাঁটু-গেড়ে বসে মন্ত্র পড়তে লেগে গেছে!

"চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়।
শার্দুলবাহন দক্ষিণ রায়॥

ঢাল-তরোয়াল টাঙ্গি হস্তে।

দক্ষিণরায় নমোঽস্তে।”

বলেই, মোরগ আর মুরগী ছুটোকে আর কবুতর-জোড়াকে বিড়বিড় করে নীচুগ্রামে কী সব মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে, ছেড়ে দিল জঙ্গলে। তারা ত কঁক্-কঁক্ করে নিমেষের মধ্যে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। হোসেন বলল, চাচা, কাল যে মুরগি দেখলাম সেগুলো জংলী মুরগি লয় ?

জঙ্গলে যে বাস করে সে ত জংলীই। তবে এদের আদিবাস সোঁদরবন নয়। মুরগী এখানে কোনকালে ছেল কি ছেল না তা ফরেস্ট ডিপার্টের নেকাপড়া জানা বাবুরাই বইলতে পারবেন। তবে এই সোঁদরবনে আগে গণ্ডার ছেল। বহুদিন আগের কথা বইলচি। শুয়োরও নাকি ছিল অগুণতি। বাবুদের কাচেই শোনা।

এদের, মানে এই মুরগি আর কবুতরদের অনেকই সময় লাগবে এই বনে মানিয়ে নিতে। মানিয়ে নেওয়ার আগেই সাপ আর বন-বেড়ালের খাদ্য হয়ে যাবে হয়ত।

সারেং মিঞা নিজের মনেই বলল।

মধু দেয়াসী হাঁক ছেড়ে বলল, যারে! যারে! অরে ও মদনা, পাঁচু, হরিপদ, আর ভয় লাই। বলতে বলতেই, বাবা দক্ষিণ রায়ের পায়ে একটু সিঁদুর লাইগ্যে দিল।

বলল, বনে কেউ থুথু ফেলবিনি আর পেচ্ছাপ করবিনি। করলেই আর বাবার দয়া থাকবেনি। তকন তোমাদের বাঁচাবার ভার তোমাদেরই নিজের। মনে থাকে যেন। “হিজ-হিজ হুজ-হুজ” দায়িত্ব।

সারেং মিঞা নৌকো থেইক্যে নাবেনি। তার মুখ দেইক্যে মনে হতিচিল যে, তার মনের মদ্দি কিসের যেন ধন্দ জেগিচে একটা। সেটা কি ? তা হোসেন জিগ্যেস করবে ভেবেও করল না। কিছু বলবার হলি, চাচা নিজেই বলবেখন। চাচার মুখ দেখি মনে হল, চাচা যেন কোনো কতা চেইপ্যে যাতিচেন।

চাচা গলা নাইম্যে হোসেনকে বলল, আমাদের ক্যানিং-এর যতীন মাইতি আচেন না। মহা-পণ্ডিত লোক। আমাকে একদিন বইল-

ছিলেন যে হিন্থুঁদের কবি কৃষ্ণরাম এক কাব্য রচনা কইর়্যে ছিলেন তার নাম "রায়মঙ্গল"। এই রায়মঙ্গল নামে সোঁদরবনের একটি বিখ্যাত নদীও আছে। বিশাল। তার দুপাশের জঙ্গল মানুষখেকো বাঘের জন্যে কুখ্যাত। সে নদী বঙ্গোপসাগরে যে পড়িচে।

এই "রায়মঙ্গল" কাব্য লেকার সময়েই কৃষ্ণরাম নাকি হিন্থুঁদের এক বহু পুরানো কাব্য "চণ্ডীমঙ্গল"-এর অনুকরণ করে লেকেন। কিন্তু যতীনবাবু বরাবরই বলেন যে, ই কথাটি ঠিক নয়। "রায়মঙ্গল"-এর অনেকই অংশ আছে যা "চণ্ডীমঙ্গলে"র অনুকরণ আদৌ নয়, তা পড়লিই পষ্টই বোঝা যায়। "রায়মঙ্গল" কাব্য রচনার আরম্ভতেই কবি কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল রচনার কারণ দেকাতে গিয়ে বইলেছেন:

"রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলো মোরে দক্ষিণের রায়।।
পাঁচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটির মধ্যে হইব প্রচার।।
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।।"

আঠারো-ভাটি হয়ত আগে শুন্দরবনের একাংশের নাম চেল।

হোসেন, সারেং মিঞার পাণ্ডিত্যে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাচ্চিলো প্রতি মুহূর্তে। একটা ডিগ্রীহীন, ইঞ্জিরি-না-জানা মানুষের শরীলে কতরকম জ্ঞানই যে রয়েচে! এমন আধার বলেই ত খুদাহ এঁকে বেছে নেচেন। কত মন্ত্র, কত পুঁথি, মানুষটার নকদর্পণে। কত রকম গুণ। অথচ ব্যবহারে একেবারে মাটির মানুষ! 'ঘামণ্ড' বস্তুটিই অজানা তার কাচে।

আর নেই মন্ত্র? চাচা? তুমি এত কিছু মনে রাকলে কি করে? আশ্চর্য বটে!

হোসেন বলল।

সারেং মিঞা হেসে উঠল হো হো করে। শিশুর মত। বলল, আমি যে মৌলবী! আবার হাসলো, হা হা করে। যখন ছ্যানাটি ছিলম তখনই মাদ্রাসা থেইক্যে তাইড়্যে দিল। ইমনই মেধাবী ছিলম! ইস্কুলকালিজের ত মুখটি পর্যন্ত দেখি লাই। কুরান-শরিফ পুরো কোনোকালেই মুখস্ত লাই কিন্তু তবুও আমি সৎ-মুচলমান। খুদাহই আমার সব। আসলে যা পছন্দ লা হয়, তা আমার কিছুতেই মুখস্ত হতি চায় না। আর পছন্দ যা হয়, তা ডুইবার পইড়ল্যেই বা শুনলিই মুখস্ত হইয়ে যায়।

আরও বল চাচা?

শোন, তবে, কবি কৃষ্ণরাম-এর রায়মঙ্গল থেকেই বলি:

"কড়জোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি,
ভর ঘটে ভকতবৎসলা।
সোনার বরণ তনু, অগ্নিনীনাগর হনু,
নিশাদিনি অমনি বিজয়।
বিশাল নয়নজোড়, শ্রবণ অবধি ওর,
চাহনি চমকে রিপুচয়॥
পূজা করে একমনে, কাটে কাঠ গিয়া বনে,
বাহুল্যা বাহুল্য কত ঠাঞী
পাইলে নাহিক খায়, বাঘের বিমুখ হয়,
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।"

আবার এই কথাও আছে ঐ রায়মঙ্গল কাব্যেই বাবা দক্ষিণরায়ের সম্বন্ধে, যে আমাদের ফকীরদের সঙ্গে একবার জোর লেগে গেছিল বাবার। বড়লোক সওদাগরেরা সবাই একবার সমুদ্রযাত্রার সময়ে ঐ আঠারো ভাটির অরণ্যে দক্ষিণরায়ের মূর্তি অথবা "বারা" পূজো করলেন।

বারাটি কি জিনিস চাচা?

"বারা" হল ঘটের মতো। —কালিঘাটের পোটোদের ঘট দেখছিস

ত। সেই রকম। তার গায়ে নানা রকম রঙীন লতাপাতার ছবি সুন্দর করে আঁকা থাকে। মূর্তি ত সবজায়গাতে থাকে না। "বারা"ই পূজো হয় বেশি জায়গাতে। যিখানে যিখানের জল অনেকদূর অবদি ঢোকে সিখানে বাবা দক্ষিণরায়ের এই "বারা" গাছ থেকে ঝুলোনো থাকে। যাতে জলে না ভেজে, বা ভেসে না যায়।

তা, হিন্দু দেবতা দক্ষিণরায়ের এতসব বর্ণনা করলেন কবি কৃষ্ণরাম আর বড়খাঁ গাজীর কোনো বর্ণনা নেই? তিনিও ত সোঁদরবনের ব্যাঘ্রদেবতা।

লিশচয় আছে। থাকবে না কেন! শোন তবে!

"ইন্দ্র যেন স্বর্গ মাঝ, বড়খাঁর গাজীর সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি
গীরিদা হেলান গা, মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দিয়া পান
মাথায় চিকন কালা, হাতে ছিনিমিনি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরাণ।"

তা যাই হোক, শুধু বাবা দক্ষিণরায়ের পূজো হল আর বড়খাঁ গাজী সাহেবের, তিনিও ব্যাঘ্রদেবতা, পূজো হলো না দেখে মুসলমান ফকীরেরা মহাখাপ্পা হয়ে গিয়ে বাবার উদ্দেশে গালাগালি করে বলেছিলেন:

"শোনতে হো দক্ষিণরায়? এইসা দাগাবাজী
বাঁধ্‌কে লে আনেসে তবে হাম গাজী"

এই না বলে, ফকীরেরা তাদের চেলাদের হুকুম করলেন—

"উন্‌কি মুরতি সব ইতিবারি তোড়"

তারপরই লেগে গেল ধুন্ধুমারকাণ্ড! অনেক জল গড়ানোর পর বাবাকে টাইট করার জন্যে বড়খাঁ গাজীপীর রাজা দক্ষিণরায়কে অখিরকা বাত শুনিয়ে দিলেন:

"অভ্‌ভি নেহি জানতে হে বড়েখাঁ গাজী পীর
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকো জাহির॥
পয়দা যতেক কিছু হয় হররোজ
তেরা আধা মেরা আধা এই বাত সোজ॥"

"সোজ" মানে শোচ আর কী। বাঙ্গালী দেবতার উর্দ্ধ তো! আমাদেরই মতো। তার চেয়ে আর ভাল কী হবে!

এই কথা শুনে দক্ষিণরায় অবাক হয়ে বললেন :

"কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল।
গাঁয় নায় মানে যেন আপনি মোড়ল।"

তাপ্পর?

চোখ বড় বড় করে হোসেন শুধোল।

খুব মজা লাগছিল ওর। বাঘেদের দেবতাদের নিয়েও সাতকাহন রইয়েচে দেকচে। অন্যান্যরাও সব দাঁড়িয়ে-বসে শুনছিল সারেং মিঞার কথা।

তারাও সমস্বরে বলল, তাপ্পর?

তারপর আর কি? বাবা দক্ষিণরায়ের বাঘ সৈন্যদের সঙ্গে বড়খাঁ গাজী পীর এর সৈন্যদের মধ্যে তো রে মার! রে ঘাঁক! রে ঘ্যাঁক্! রে ঘাঁক্! কইর‍্যে সে পেচণ্ড যুদ্ধ নেইগ্যে গেল।

তাপ্পর?

তাপ্পর কি? কেউই হার মানে না। দুজনেই সমান বীর। পিরথিবী পেরায় রসাতলে যায়।

হিন্দুদের বিধাতা চুপ করে না থাকতে পেরে বেহেস্ত-এ দেবতাদের মীটিং বসালেন। তারপর বিধাতা স্বয়ং আধা-হিন্দু আধা মুসলমানের রূপ ধরে সোঁদরবনে নেমে এলেন যুযুধানদের শান্ত করতে। আবির্ভাব হল স্বয়ং বিধাতার। আর তাঁরই বা কী রূপ!

কেমন রূপ তাঁর?

"অর্ধের মাথায় কালা এক ভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ-পুরাণ দুই হাতে।"

তাপ্পর?

তাপ্পর আর কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়া মরে।

প্রচুর বাঘ মারা পড়ল এবং তারপরই শান্তি। বাবা দক্ষিণ রায় এবং বড়খাঁ গাজী পীর দুজনেই জানলেন যে, শত্রুপক্ষ এলেমদার বটে। তারপর "টুরুস্" হবার পরে বাঘেদের রাজ্যে ঢেঁড়া পড়লো :

"এখন দক্ষিণ রায় সব ভাটির অধিকার*
হিজুলিতে কালুরায়ের থানা।
সবত্রে সাহেব পীর সবে নোঙাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।।"

যে ডিঙ্গিটা উল্টোদিক থেকে বেয়ে এল তাদেরও সকলেই এতক্ষণ চাচার কথা শুনছিল হাঁ করে। সারেং মিঞার কথা শেষ হলে পর মধু বাউলেকে তারা বলল, কাজটা ভাল কইরলে না গো বাউলে।

কী কাজ! কেন?

অত মানুষের সামনে মধু একটু অপ্রস্তুত ও অপমানিত হয়েই মুখ তুলে শুধোলো।

সেই মাঝি বলল, এই বাবা দক্ষিণ বায় নিজেই মড়া। তিনি আবার আমাদের বাঁচাবেন কি করে?

ছিঃ। ছিঃ। ঠাকুর-দেবতাদের সম্বন্ধে এ কীরকম কতা। তাও আবার এখন সাংঘাতিক সব দেব-দেবতা। কেন? মরা কেন? তাছাড়া তুমি জাইনলে কি করে?

আমি যে গতবছর পুটকিন গাঁয়ের যে-মানুষেরা এই মূর্তি পেতিষ্টে কইরেচেল তাদের সঙ্গেই ছিলম। এই পেতিষ্টে ঠিক মত হয় নি। বড় পাপ ঘটেচেল ইকানে।

পাপ? কি পাপ?

হ্যাঁ। পাপ ছেল। মূর্তি পেতিষ্টের আগে গোসাবা থেইক্যে জবরদস্তী করে তুলে আনা একজনের বৌকে এই বাবার চালারই মদ্দ্যি বেইজ্জৎ কইরেচেল।

কে? তাছাড়া সোন্দরবনে মেয়েচেলের কথা এই পেরথম শুনলাম।

* মানে আঠারো ভাটির সব ভাটা।

না শুনে থাকলি শোনো।

পাপটা কইরল কে ?

নস্করবাবুদের মুহুরী।

কোন্ নস্কর ?

আরে "জলপিপির জলা"র নস্কর। চেনো না যেন! মুনিষ খাটলে কত বচর! ন্যাকামি।

এই মুখ সামলি কতা বলবি। আমি কে জানিস ?

আমি তোর মা-বাপ কে, তাও জানি। বেশি চেঁচাসনি মধু। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দোব। মধু বাউড়ি আবার বাউলে হইয়েচে! মানুষ মারার খ্যাঁচাকল!

মুহুরীর নামটা যেন কী ?

কী যেন নাম, নানু না কানু গাঙ্গুলী।

বামুনের ছেলের এই কাজ ?

ঘোর কলি যে! ইসব তো বামুনেরই কাজ! তবে ফলটাও ইকেবারেই হাতি-নাতি পেইয়্যে গেচে। নামখানা ফিরতি ফিরতি একজনেরে বাঘে নেচে, দুজনেরে কুমীরে। আর মেয়েটারে নিয়ে গেচে ছিপ নৌকো করি আসি বাংলাদেশি ডাকাইত। রায়মঙ্গল ধরি এইস্যেচেল তারা।

অন্য একজন শুধোলো, তা, নস্করদের কিরিয়া-কাণ্ড এখন চালাতিচে কে ?

আরে যে হয় চালাতিচে! আমরা আদার ব্যাপারী হইয়ে জাহাজের খপরে দরকার কি ?

তবে ?

তবে কি ?

পাশের নৌকোর সেই মুখ-ফোঁড় লোকটা বলল, কাল যে গোবিন্দরে বাঘে নেল রাতে সে আর তার নৌকোর সকলি ত ইকানেই পূজো দে চামটার খালের ঐকানে নোঙর কইর্যেছিল। ঐ দেকো, এখনও সিঁদুরের দাগ পষ্ট আচে। একদিন আগের দাগ, যাবে কি করে ?

তাইলে কি হবে একন ?

চিন্তিত গলাতে মউলেরা বলল।

কী হবে তা কি করি বলব। তবে এইখানে পূজো দে ড্যাঙ্গাতে নামলে হিতে-বিপরীত হবে।

সেই সবজান্তা লোকটা বলল।

মধুর নৌকোর মউলেরা গলা ভারী করে বলল, কী গো দেয়াসী! দুদিন ধইর‍্যে ইকেনে ঢুইক্যে মিঠা জল, চাল ডাল নুনের শ্রাদ্ধ করতিচি আমরা। আর রোজগার ত হলোনি এক পয়সাও।

ইবারে সকলে একই সঙ্গে সারেং এর দিকে ফিরে বলল, কী কইরব আমরা ? ও চাচা ?

সারেং বলল, যদিও আমার কাজ লয়। তবু রেঞ্জার সাহেবরে কথা দিইচি। আমি থাকতি পারতাম কারণ মৌচাক বেশি দূরে লয়। আমিও দেইকেচি যে গরাণ ফুলের মধু খেয়ে মৌমাছি উড়ল। তা তোমরা নামবে কজন ?

তিনজনা।

তিনদিকে যাবি ?

হ্যাঁ। তা নইলে চলবে কি করে ? একই মৌচাকে মারামারি করে মইরব নাকি ?

একসঙ্গে তিনজনকে পাহারা দিই কি করে!

সঙ্গে সঙ্গে মুনসের বাউলে বলল, চাচা, তিন বাঁক গিয়ে বাঁয়ে একটি শিষখাল আছে। তারই কাচে মস্ত মস্ত মৌচাক। সিখানে যেয়ে নতুন করি পূজো কইরে দেব। বনবিবির ঠাঁই সিকানে। সেই শিষখাল দোয়ানিয়া খাল। দুদিক দে জোয়ারের জল ঢুকতিচে একন, পার্শে মাছের ঢিপি পইড়্যে গেচে। সিকানে কি যাব ?

মধু বাউলে চুপ মেরে গেছিল। তার মা-বাবা তুলে কথা বলেছে সেই মুখ-ফোঁড় ছোঁড়া। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে আর কান লাল করি বসি আছে।

হোসেন ভাবতেচেল, কত মনুষ্যিরই ত কত গোপন কথা আচে।

যি মনুষ্যি অন্যর হাঁড়ি হাটে ভাঙার ভয় দেকায় তারও কি আর গোপন কথার হাঁড়ি লাই? হাটে ভাঙলে কার হাঁড়ি থেকি কী বেরোয়, তা কেই বা বলতি পারে! কেন যে মনুষ্যি হয়ে অন্য মনুষ্যির বুকে এত ব্যথা দেয় তা কে জানে! ভাবলেও মন খারাপ লাগে।

বৈঠা বেয়ে গুণে গুণে তিন বাঁক যেয়েই শিষখালের মুকে ওরা এইস্যে পড়ল আধঘণ্টার মধ্যি।

ভারী সুন্দর জায়গাটা। জোয়ারের জলে এখন সমস্ত বনকেই মনে হতিচে ভাসমান উদ্যান। যেন জলের মদ্দ্যি ঘন-সবুজ হলুদ-লাল-পাট-কিলে-কালো পাতা-লতা শাখাপেশাখা নিয়ে একটি বেবাক জঙ্গল ফুলেরই মতো ফুইটে্য আচে। বড় বড় কেওড়া গাছগুলোর শূলো থাকে, মাটি ফুঁড়ে তারা সোজা এক হাত দেড় হাত আকাশের দিকে উটে থাকে ডাঙ্গার জঙ্গলের টান-টান শিমূলের মত। কিন্তু কোনো শাকাপেশাখা লাই তাতে। ভাঁটির সময়ে নাকি অক্সিজেন নেয় এমনি করি কেওড়া গাছেরা। জোয়ারের সময়ে সবগুলো চইলে যায় জলের তলাতে। অদৃশ্য হয়ে যায়। সোঁদরবনে কেওড়া গাছগুলোই সবচে বড় গাছ। তাদের অনেক ডালপালা। বড় বড়। শাখা থেকে পেশাখা বেরিয়ে গেচে। কোথাও বা শাখাপেশাখা মাটির কাচে নেমে এসিচে। জোয়ারের সময়ে কাণ্ডও ডুবে যায় অনেককানি। বড়ই আশ্চর্য দেখায় তকন।

বনবিবির পুজো করে হিন্দু-মুসলমান সকলেই। মউল, মালঙ্গী, নৌজীবী, শিকারী সকলেই বনের মধ্যে মঙ্গলে-মঙ্গলে থাকতি পারবে এই আশায় বনবিবির পুজো করে।

জোয়ারের সময়েও যে "খাল" বা "ট্যাক" ডোবে না, বাঘে যেখানে জোয়ারের সময়ে যাবে, মা-বাঘ যেখানে বাচ্চাদের লালন-পালন করে তেমনই এক ট্যাকে বনবিবির মূর্তি দেখা গেল।

নৌকো তীরে ভিড়তেই মুনসের জোড়-হাতে মন্ত্র বলল :

"মা বনবিবি, তোমার বাল্লক এল বনে,
থাকে যেন মনে।

শত্রু দুষমন চাপা দিয়ে রাখ গোড়েব কোণে।

দোহাই মা বরকদের, দোহাই মা বরকদের ॥"

চাচা বলল, এই বনদেবী, বনবিবির চেহারা মুসলমান মেয়েদের মত, অবশ্য হিন্দু মেয়ের মত চেহারাও হয় অনেক জায়গাতে। যেন বড় খানদান-এর কোনো মুসলমান কিশোরী। মাথায় টুপি, তাতে বুনো লতাপাতা আঁকা, বিনুনী-করা চুল, মাথায় টিকলি, গলায় নানারকম হার, তারও উপরে বনফুলের মালা। কারা যেন পরিয়ে দিয়ে গেছে দিন তিন-চার আগে। ভাবগতিক দেইক্যে মনে হল, মুনসেরও বুজি মালা গেঁথি পরাবে। বিবির পরনে পিরান বা ঘাঘরা পাজামা, পায়ে জুতো মোজা, তার উপরে পাতলা ওড়না। মুরগীর উপরে, হাতে আশা-বাড়ি বা একটি দণ্ড নিয়ে বসে আছেন। ওড়নাটিও একেবারে নতুন।

মুনসের বলল, গোসাবাব নদের শেখ, মস্ত বড়লোক, তার বহর নিয়ে এসে এই দেবীকে এখানে পেতিষ্ঠ করে গেছেন পাঁচ বছর হতি চলল।

মুরগী দুটো বের কব রে।

কে যেন বলল।

পাটাতনের নীচে মুরগী রাখা ছিল দুপায়ে দড়ি বেঁধে। মুরগী বের করে একটি ছোট ছুরি বের করে মুনসের মুরগী দুটো হালাল করল।

তারপর বিড় বিড় করে বলল,

"বিবিব রূপের কথা না যায় কথন

রূপে তার কেঁদখালি হয়েছে রৌশন।"

সারেং চাচা বললেন, একবার বনবিবির সঙ্গে বাবা দক্ষিণ রায়েরও জোর বিরোধ বেধেছিল, বুজলি। শেষে, বনবিবির তাড়া খেয়ে দক্ষিণ রায় দৌড়ে বড় খাঁ গাজীর কাছে গিয়ে হাজির। গাজীই মদ্দ্যস্থতা করে দুজনের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। তখন বনবিবি, বাবা দক্ষিণ বায়কে কড়ার করে প্রতিজ্ঞা করালেন:

"আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা।

মা বলি ডাকিলে কারো বিপদ থাকে না।

বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।
কভু তারে হিংসা না করিবে।”

সবই বাঘে-বাঘে কতা-বার্‌তা, বুঝলি না। মা বনবিবিই বল, বাবা দক্ষিণ রায়ই বল আর বড়খাঁ গাজীই বল, সবই ত ব্যাঘ্র-দেবতা।

বনবিবির নামে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। তার মদ্দি তুটিই প্রধান। তারই একটি বলি শোন।

অনেক জায়গাতেই দেখতে পাবি বনবিবির মূর্তির পাশে একটি ছোট ছেলে।

বলো চাচা।

হোসেন বলল।

ধোনা আর মোনা তু ভাই ছিল। তুজনেই মউলে। মধু পেড়ে খেত। একবার সুন্দরবনে মধু পাড়তে যাবার সময়ে তাদের গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো হয়, একটি ছোট ছেলে, তার নাম তুখে, তাকেও তারা সঙ্গে নিল। তুখেরা পেচণ্ড গরীব। তার কোনো চারা নেই তাই ছোট ছেলে হয়েও ঐ অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজেও সে যেতে রাজী হয়ে গেল।

এদিকে ধোনা সোঁদরবনে পোঁছে ডাঙ্গায় নামার আগে বাবা দক্ষিণ রায়কে পূজো করতেই ভুলে গেল। সে কথা জানতে পেরে বনের অধিপতি বেজায় রেগে গিয়ে ধোনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর কঠিন আদেশ জানালেন :

“দণ্ড রক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান,
দক্ষিণ রায় নাম তার আমি তাহার সন্তান।”

শোনো ধোনা। তুমি আমাকে পূজো না দিয়ে বনে ঢুকেছো। এতবড় গর্হিত অপরাধের খেসারত হিসেবে আমাকে তোমার নরমাংস দিতেই হবে। যদি না দাও, তাহলে আমার বন থেকে এক ফোঁটাও মধু পাবে না।

আদেশ শুনে ত ঘুম চটকে গেল ধোনার। ইদিকে কী করে! নিজের আর নিজের সহোদরের সাধের গায়ের চামড়া আর মাংস কার

আর সাধ করে বাঘকে দিতে ইচ্ছে করে। অতএব তারা ঐ ভীষণ বন-মধ্যে বেচারা তুখেকেই রেইক্যে দিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে পাইল্যে গেল।

যে-বনে বাঘা-বাঘা শিকারি বন্দুক রাইফেল হাতে নিয়েও ভয়ে কাঁপে, সেই বনের মদ্দ্যি রাত নেমি আসতে লাগল। ছোট ছেলে তুখে একা। অন্ধকার যতই হতে লাগল ততই বিচারা তুখে কাঁদতে লাগল ভীষণ ভয়ে। জনমানবহীন, ভয়াবহ সি বন, নানারকম হিংস্র পশুতে, বাঘে কুমীরে সাপে ভরা। তার মধ্যে সি একা থাকবে কী করে? তুঃখে, ভয়ে, ধোনা-মোনার নিষ্ঠুরতায় সে পাগলের মত হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়েই তুখে দেখল বিকট বিরাট এক বাঘ তাকেই খাবার জন্যে তেড়ে আসতিচে।

"বিষম তুরন্ত বাঘ, আসে গাল মেলে
তুখে দেখে মা বলিয়া গিরে ভূমিতলে।
এইরূপে মা বলে ডাকে তিনবার
হেট ছেরে বৈসে কান্দে জারে জার॥
তুখের কান্দনে হেলে বিবির আসন।
অন্তরে ধিয়ানে বিবি জানিল তখন॥"

তুখের "মা" ডাকে বনবিবির আসন টলে উঠলো। তিনি ধ্যানযোগে সব জানতে পেরেই ভাই শা-জঙ্গলীকে সঙ্গে করে ছুটে এলেন সেই বনে এবং তুখেকে কোলে তুলে নিলেন। কোলে তুলে নেতিই সেই তুর্দান্ত বাঘকে দেকতি পেলেন। দেখেই তাঁর বুজতে আর বাকি রইল না, যে-বাঘ তুখেকে খেতে এসেছিল, সে দক্ষিণ রায় স্বয়ং। বুঝতে পেরিই, তিনি শা-জঙ্গলীকে আদেশ করলেন বাঘের রূপ-ধরা দক্ষিণ রায়কে শায়েস্তা করতে।

শা-জঙ্গলী সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মাতায় মুগুরের বাড়ি বসাতেই ত সি বাঘ ছুটতে নাগলো। শা-জঙ্গলীও সি বাঘের পেছনে পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মুগুরের বাড়ি মারতে লাগলেন ধমাধম বাঘের মাতায়। শেষকালে অবস্থা অতি সঙ্গীন ই কথা বুজতে পেরি বাবা দক্ষিণ রায় প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বড়খাঁ গাজীর কাছে গিয়ে হাজির

হলেন।

গাজী তখন জাঁকজমকভরে তাঁর দরবারে বসেছিলেন। গাজী, স্বয়ং বিধাতাও যেমন তাঁর আর দক্ষিণ রায়ের মধ্যের যুদ্ধে মদ্ধ্যস্ততা করেছিলেন তেমনি দক্ষিণ রায়ের আর বনবিবির বিবাদেরও তিনিই মদ্ধ্যস্থতা করে দিলেন।

কিন্তু ঐ যে আগে বললাম, "আঠারো ভাটির আমি সবার মা, মা বলি ডাকিলে কাহার বিপদ থাকে না" ইত্যাদি কড়ার কইরে নিলেন দক্ষিণ রায়কে দিয়ে তখনই বনবিবি।

গল্প শেষ হলি মুনসের বলল, নামি এবারে আমরা ডাঙ্গায়? চাচা?

নামো নামো।

তা বলি, থুথু ফেলোনি আর পেচ্ছাপ করোনি বনে। তালে কিন্তু আমার দোষ নাই। বিবি চইটবেন খুব।

গরান আর গেঁয়ো ফুলের মধু খেয়ে মৌমাছি যেই উড়ল অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই মৌমাছির পেছন পেছন উর্ধ্বমুখ হয়ে চলতে লাগল ওরা।

তিনজনে তিন মৌমাছিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল।

মৌমাছিরা মধু আহরণ করে নিয়ে গিয়ে জমাবে তাদের মৌচাকে। আর মৌচাক থাকে জঙ্গলের গভীরে। বড় বড় গাছের উঁচু ডালে। সেই মৌচাক আবিষ্কার করার পর তার নীচে ধোঁয়া করবে ওরা। সেই ধোঁয়া গিয়ে মৌচাকে পৌঁছতেই পিন্‌পিন্ করে মৌমাছিরা চাক ছেড়ে বেরোতে থাকবে আর তখন মৌমাছির কামড় অগ্রাহ্য করে ওরা গাছে উঠে চাক ভেঙ্গে মধু বের করে হাঁড়িতে ভরবে। কখনও বা চাক-শুদ্দুই নিয়ে আসবে নৌকোতে। নিজের চোকে না দেখলে বিশ্বেস হবেনি।

যখন অমনি করে মৌচাকের খোঁজে উর্ধ্বমুখ হয়ে মউলেরা জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যায় তখন অতি সহজেই ধূর্ত, ভয়ংকর বাঘের শিকার হয় ওরা সুন্দরবনে। জীবন বাঘের হাতে বিপন্ন করে, জীবন মৌমাছির

কামড়ে বিপন্ন করে, যে-মধুটুকু আনে তারও আসল মুনাফা লোটে 'ফোড়ে'রা নয়ত ফরেস্ট-ডিপার্ট। ফরেস্ট-ডিপার্টও আরেক ব্যাঘ্র-দেবতা সুন্দরবনের। বাবা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, বড়খাঁ গাজীরই মতো।

এই মানুষগুলোকে এতো কাছ থেকে না জানলে হোসেন জানতেও পারত না "জীবন-সংগ্রাম" কতাটার মানেটা ঠিক কি?

গরীব মানুষও যে ঠিক কতখানি গরীব হতে পারে সে সম্বন্ধি কোনোই ধারণা চেলো না হোসেনের। বিতিচি গ্রামের ওরাও ত গরীবই! কিন্তু ওরা যেমন করে থাকে, চারবেলা খেয়ে দেয়ে গাই-বলদ, বক্‌রা-বক্‌রী, মোরগা-মুরগী, ধানজমি, বিবির-বিলের মাছ নে, সি আলস্যির, পরম সুখের জীবনের সঙ্গি হদের জীবনের তুলনা করার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

সারেং মিঞা বলল, কী ভাবছো হে সাঙাত্।

হোসেন চুপ করে থাকে।

সারেং মিঞা বলে, শুধু বনকেই ভালবেইস্যে আসি না গো। এই মানুষগুলোর দুঃখের কাছে, ইদের সাহসের কাছে, ইদের ভালত্বের কাচেও বিকিয়ে দেছিগো আমি নিজেকে। পেরকিতি ত সুন্দরই! পেরকিতির সৌন্দর্য কার চোখে না পড়ে! কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় সাঙাত, মানুষই সমস্ত পেরকিতিকে আরও সুন্দর অথবা ভয়াবহ করি তোলে।

হোসেন চুপ করি সারেং মিঞার কথার মানিটা বোজার চেষ্টা করচেল।

সারেং বলল, সোঁদরবনের খালে-খালে এই যে খালি-গা, খেটো-ধুতি বা লুঙ্গি-পরা মানুষগুলো পেতিবছরই আসে এদের যে এই বনবিবি, দক্ষিণ রায় আর বড়খাঁ গাজী ছাড়া আর কেউই নেই! পেতিবছর তাই এরা যখন আসে, আমিও আসি। ওদের পাশে পাশেই থাকি। ওদের সেবা করি সবপহর, তাই আমার নামাজ না পড়লিও চলে হোসেন। নামাজী কোটি কোটিই আচে এ পিরথিবিতে। আমার মতো এই শব্দহীন ফজিরের আর জাম্মার, মগরীব-এর আর

ঈশার নামাজ আর বেশি মুসলমানে পড়ে না রে হোসেন। খুদাহ্‌ সবই দেখতি পান। তাই ত আমাকে ক্ষমা করি এসিচেন, ক্ষমা করি দেন। তাই ত বলি রে হোসেন মিঞা, "গলতিয়াঁ করতা হুঁ জী ভর ইস্‌ লিয়ে, বকশীসোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ হ্যায়"।

সারা জীবনই তো ভুল করেই আসছি, দোষ করে আসছি; তোমার দয়া, তোমার দোয়ার উপরে যে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে খুদাহ্‌।

খুব জোরে একটা মাছরাঙা এসে ছোঁ মারল জলে, জেলে নৌকোর ওরা খেপ্‌লা জাল ঠিক করছিল যখন। মুখে একটি পার্শে মাছ নে উড়ে গিয়ে বসল তেরঙা-মাছরাঙা একটি কেওড়া গাছের খোঁদলে। বসে, মনোযোগ দিয়ে মাছ খেতি লাগলো।

কিন্তু তার এই জল-ঝাঁপানোতে রূপোলি জল ছিটকে উঠে রোদের সোনাতে রূপোর ঝালর আর জরি লাগিয়ে দিল। মাছরাঙার শব্দ শুনে আরো একটি মাছরাঙা কোথা থেকি যেন উড়ে এল। বোধহয় ওর জোড়াটিই।

সারেং মিঞা আস্তে আস্তে পাটাতনের তলা থেকে বন্দুকটা বের করে ভাল করে গামছা দিয়ে মুছে নিল। অনেক যত্ন করে ছেঁড়া ধুতি জইড়্যে রেখেছিল সেটাকে। লোনা জল ত! মরচে পড়তি টাইম লাগে না।

বন্দুক বের করা হলি পর টোটা নিল তিনটি।

মোটে তিনটি কেন? অনেক ত আছে।

হোসেন শুধোল।

সারেং হাসলো।

বলল, সোঁদরবনের বাঘ এক টোটা ফুটোবারই সময় দেয় না তা বেশি টোটা নে করবটা কি?

তুমি এখন কোতা যাবে? বাঘ মারতি? বনের মদ্দ্যি ঢুইকবে? আম্মো যাব।

আবার হাসল হোসেন মিঞা।

বলল, তোমার মাইরতি যাত্তি হবে না ইকানের বাঘকে, সেই

তোমাকি খেতি আইসবেখন মুখ ব্যাদান করি। কিন্তুক যাকে ধইরবে সি আগের মুহূর্ত অবধি জানতি পয্যন্ত পাবে না। আমি "গাছাল" দেব। যতক্ষণ না এদের মাছ ধরা হয়।

আর মউলেদের কি হবে?

ওরা তিনজনে গেছে তিনদিকে। ওদের আমি একা দেখি কি কইর‍্যে। ওদের দেখবেন বনবিবি।

সব দেবতারা দেখার পরও তো এতো মানুষ বাঘের পেটে যাইচে পেতিবছর! তালে আর এতো পুজো-পেরনাম-সালাম কেন?

হোসেন বলল।

সারেং মিঞা হাসল।

হঠাৎই ভারী রাগ হয়ে গেল হোসেন মিঞার সারেং মিঞার উপরে। এতো মানুষের মিত্যুর কতা হতিচে আর উনি হাসেন কোন্ আক্কেলে?

হাসো কেন সারেং চাচা?

এই।

এই কি?

এই! জেলেরা মাছ খেইতিচে, মাছরাঙা মাছ খেইতিচে, বাঘরোল মাছ খেইতিচে, তা বাঘে কি খায় বলো দিকিনি? সবই ত খাদ্য-খাদক সমূহ কী না। বাঘে তাই খেতিচে মানুষ! বাঘের স্বাভাবিক খাইদ্য বহুদিন থেকেই নাই সোঁদরবনে। তা বাঘ আর কি করে? সে মানুষ খায়। খাদ্য-খাদকের সমূহটা বিচার করি দেখলি, এতি দোষের ত কিচু নাই।

তা আমরা নিজেরা মানুষ, তাই মানুষ খেলি আমাদের রাগ-দুঃক হবারই কতা। আমি যাব? তোমার সঙ্গে?

না না। তুই থাক ইকানে। জেলেদের সঙ্গে। মাছ কি করি ধইরতে হয়, তা শেখো। নইলে, খাবেটা কি এর পরে? এই বনেতে থাকতি হইল্যে সবই এট্টু এট্টু জানতি হবেক। তাচাড়া, আমি এই কাছেই থাইকব।

হোসেন লক্ষ করল, সারেং মিঞা শিষখালের পাশ বেয়ে ডাঙ্গায়

উইট্যে বেশি কথা না বাড়িয়ে সটান একটা মোটা কেওড়ার কাণ্ড ধরি উইট্যে পড়ল। কিছুটা গিয়ে, তেডালা দেকি নে আরাম করি বসল সিখানে। পেছনটা করলো পাশ থেকি, এ দিকে। শিষখালটা রইলো তার ডানদিকে আর সামনেটা রইল বনের দিকে। বন্দুকটাকে আড়াআড়ি করে শুইয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক নজর করতি লাগলো। সারেং মিঞা।

ঠিক এমনি সময়ে পুত্-পুত্-পুত্-পুত্ করে কী একটা পাখি ডেইকে উঠলো খালের ডান পাশ থেকি।

জেলে নৌকোর হেমন্ত বললো, থামা তোর পুত্-পুতানি। এইস্তে অবধি একটা মাছের-পো ধরা হলোনি আর পুত্ পুতোচেন তিনি!

অন্যেরা হেসে উঠলো।

হোসেন খুব অবাক হলো মানুষগুলোকে দেখে। মৃত্যুর সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলতিচে পেত্তিক্ষণ অথচ ওদের হাসির শেষ লাই।

মধু বসেছিল লৌকোতে। সে যায়নিকো। তার মনও খারাপ। সেই মুখ-ফোঁড় ছোঁড়া কী না কি বইলে গেল। রাতে আবারও দেকা হবে সকলির সঙ্গে সকলির। গল্প হবে, গান, তামাক খাওয়া, পরনিন্দা পরচর্চা, পাশাপাশি, কাছাকাছি তখন হয়ত বেমালুম ভুলে যাবে সকলের কতা! যতই দেখচে ততই অবাক হচ্চে হোসেন মানুষগুলোকে দেখে।

মধুকে শুধোল, ওটা কি পাকিগো মধুদা?

কোন্টা?

আরে ঐ যে ডাকল একটু আগে পুত্-পুত্-পুত্ করে।

মধু অন্যমনস্কভাবে বলল, জোয়ারি পাখি।

জোয়ারি পাকি? ভারী মজার ডাক ত! পুত্-পুত্-পুত্ করে ডাকে।

মধু এবারে হোসেনের দিকে চেয়ে বলল, বিড়ি চাই?

আমি বিড়ি খাই। তবে সঙ্গে আইনতে ভুইল্যে গেছি।

বা বা! এমন কতা তো জীবনেও শুনিনি। পারলে লোকে

সুন্দরবনে সঙ্গে ইকটা ইকসট্রা জীবন পর্যন্ত নে আসে, আর তুমি বিড়ি পর্যন্ত আনলে নি!

ভুইল্যে গেচি। আগে ত আসিনি ককনো।

পরথমবার এইস্তেহ সারেং মিঞার সাগরিদ হহলে কেন? সি তুমাকে কোথায় কার হাতে সঁপে দে কোতা নিরুদ্দেশ হইয়ে যাবে তার ঠিক কি?

শুনছি তো তেমনই সকলের কাছ ঠেঙেই। তা কি করব! এইসে যকন পইড়েইচি, যা হবে, তা হবে।

ন্যাও। ধরাও।

বলে, মধু একটা বিড়ি দিল ধুতির খুঁট থেকে খুলে। তারপর নিজের বিড়িটা ধরিয়ে হোসেনের বিড়িটাও ধরিয়ে দিল।

নিজের বিড়িতে লম্বা একটা সুখটান লাগিয়ে বললো, এহ জুয়ারি পাখির হিসটিরি আচে।

হিসটিরি? শুধোলো হোসেন আরেকগাল ধোঁয়া ছেইড়ে।

কা রকম শুনি?

বহুদিন আগের কতা। শোনা কতা তো বটেই! একজন মেয়ে নাকি তার ছেলেকে নদীর কোলে শুইয়ে কী সব কাজ-টাজ কইর-তেচেল। তখন নদীতে ভাঁটা। কাজ করতি করতি আর খ্যাল করেনি, কখন জোয়ার এসিচে আর কখন যে জোয়ার ছেইল্যেকে ভাইস্তে নে গেচে। যকন জানলো, তকন তো অনেকই দেরী হয়ে গেচে। তারপর থেহ্‌কেই সে মেয়ে নদীর পারে পারে ডেকে ফেরে। ছেলের শোকে সে প্যাক হয়ে গেচে।

বলে, ভাঁটায় রাকলাম পুত্। জোয়ারে নিয়ে গেল পুত্। পুত্ পুত্ পুত্…

হোসেন চুপ করে থাকল।

দেয়াসী মধু বলল, মাছ ধরাটা, মধু পাড়াটা, কাঠ কাটাটা শিকেই নাও। মনে কর নৌকাডুবি হইয়ে গেল। যদি বা কুমীর আর কামটের মুখ থেকে বেঁইচে ড্যাঙ্গায় ঠেইল্যি উইটলেও, যদি বা

বাঘের খাইদ্য নাও হও, একা নিজের খাইদ্য জোটাবে কোত্তিকে ?

কি কি মাছ পাও তুমরা ইসব নদী, নালা, খালে, শিষ-খালে ?

বাবা ! সি কত মাছ !

হঠাৎই জেলেদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। এই ! জোয়ারে মাচের পাহাড় ছুটতিচে। ফ্যাল ফ্যাল, জাল ফ্যাল।

অন্যজন গালাগালি করে উটল, বন্নু টানা জালটা এ পান্ত থে ও পান্ত অবধি লাগা। খেপ্‌লা জালের কাজ না কি ? দুস্‌স্‌।

বললে না, কি কি মাছ পাও ?

হোসেন আবার শুধোল মধুকে।

মধু ঐ চিৎকারে এট্টু অন্যমনস্ক হয়ে গেচিল।

মধু বলল, মাছের আসল বাহার বর্ষায়। কিন্তু তখন যদি এব— আসে মাছ ধরতি, ভারী ভয় তকন। যকন তকন ছাইক্লোন আসি আছড়ি পড়তি পারে। আর তখন এই শিষখালের চেহারা দেইখেও ভয় নেইগ্যে যাবে তোমার। বড় বড় সাপ, আর কুমীরের মোচ্ছব নেইগ্যে যাবে তখন। তাছাড়া মাতলা, গোনা, হেড়োভাঙ্গা, বিদ্যা, রায়মঙ্গল, গোসাবা ইসব নদীর তখন যা চেহারা ! বাপরে ! তবে এসি যদি একবাব পৌঁছতি পারো তবে আর দেখতি হবে নি। বেখা, রুচো, দাঁতনে, ভাঙন, কাল-ভোমরা, পান-খাওয়া, পার্শে, তপসে, কুচো চিংড়ি, নানানিবিমুনি মাছ। ভেটকি, কাঁকলাস মাছ। ট্যাংরা, বড় ও ছোট খয়রা, কানমাগুর। মেনি মাছ। ভাঁটি দিলেই কাদার উপরে তিড়িং বিড়িং করে লাপায়।

কুচো চিংড়ি দে কেওড়া ফলের টক রাঁধে তখন বাদার মানুষেরা। হ্যাঁতালের মাতা কেটে বড়াও ভেজে খায় ওরা। দারুণ খেতে। তাপ্পর খয়রা মাছ ভাজা, ভেটকির কাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যাংরার ঝাল, বড় চিংড়ির নারকোল দিয়ে মালাইকারী। তাপ্পর কচ্ছপের মাংস। কাউঠ্যা। কচ্ছপের ডিম। কচ্‌কচে করে কামড়ে-খাওয়ার পিঠ, কষে প্যাঁজ রসুন নংকা দে রান্না করি খাও এক এক থালা ভাত। আর কাঁকড়া ? কাঁকড়া কী কাঁকড়া ! কতরকম যে কাঁকড়া।

কতরকম যে তাদের রঙ। বড় বড় কাঁকড়াও আছে তাদের মধ্যে। কী মিষ্টি শাঁস। প্যাজ-রসুন-লংকা দে রাঁধলে মাংসের চেয়েও উপাদেয়।

বিড়িটা শেষ করি আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে, মুখটি খুব সীরিয়াস করে মধু বলল, আমি অবশ্য ব্যাঙও খাই। বোলোনি কাউকে। আরে ব্যাঙের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা! ছ্যাঃ।

ছিঃ ছিঃ। ব্যাঙ কেউ খায় নাকি? শুনেছি ত চীনেরা খায়। এত মাচ! মাছ খেলেই পারো।

আরে সে ত ইখানে যদিন থাকি। তদ্দিন ত পেট পুরেই খাই। কিন্তু যকন বাদায় ফিরি? তকন?

তকন কি?

তকন কি মাছ কিনে খাবার সামর্থ্য থাকে আমার?

বাদাতে মাছের দাম কি?

ভাবতিচো ভাই হোসেন মিঞা। যাদের শুধু ভাতে একটু নুনই জোটে না তাদের আবার ওসব বিলেসিতে!

তা, কি ব্যাঙ খাও?

আবার হাসি ফিরে এল মধুর মুখে। বলল, কি ব্যাঙ মানে কি? কী ব্যাঙ চাও? কালো ব্যাঙ, রূপো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, হলুদরেখা ব্যাঙ, পাতাসি ব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ, আরো কত ব্যাঙ। ব্যাঙই আমার ব্যাঙ্ক। মারি আর খাই। থালা-থালা ভাত।

বেশ লাগছে হোসেনের, মধুকে! আসলে এখানের পেত্যেকটি মানুষই আলাদা-আলাদা। যদিও দূর থেকে দেখলি মনি হয়, একইরকম। হয় লুঙি, নয় ধুতি, কাঁধে-গামছা, খালি-গা অধিকাংশরই। সবাই কালো। যারা ফর্সা তারাও রোদে জলে পুড়ে ভিজে কালো।

মধু স্বগতোক্তির মত বলল, বর্ষাতে এসো একবার। আহা! কী রূপ সুন্দরবনের! যেমন সুন্দর, তেমনই ভয়াবহ। এই জন্যেই বোধহয় পেতিবছর সারেং চাচা হঠাৎ গায়েব হইয়ে যায় গরমের পরই। আশ্চর্য মনিষ্যি! বনবিবি, বড়খাঁ গাজীরই সমতুল। কোনো মানুষকেই

দেখিনি এমন। অথবা মানুষটা হয়ত মানুষই লয়।

মানুষ লয় তো কি?

ঐ।

ঐ মানে কি?

ঐ বাবা দক্ষিণ রায় বা বড়খাঁ গাজীর মতো কোনো দেবতা বা পীর হবেন হয়ত।

বাঘে মাছ খায় না?

হোসেন শুধালো।

ঠিক সেই সময়েই মউলেরা যেদিকে মধু পাড়তে গেল সেই দিক থেকে গুম্ গুম্ করে শব্দ ভেসে এসো।

ভারী অবাক হলো হোসেন। বন্দুক নিয়ে সারেং মিঞা বসে রইল কেওড়া গাছের তেডালাতে। শিষখালের বাঁ দিকে আর ডানদিকের বনের গভীর থেকে ভেসে এল বন্দুকের শব্দ! এটা কী রকম হইল?

হোসেন ঘাড় ঘুরে চাইল কেওড়াগাছের তেডালাতে। দেখল, সারেং মিঞাও কান খাড়া করে ডানদিকে চেয়ে আছে।

কী ব্যাপার? ঘাবড়ে গিয়ে শুধোলো হোসেন, মধুকে।

ব্যাপার আর কি। বড় মিঞার সঙ্গে দেখা হয়েচে ওদের কারো। বা বড়মিঞা নে গেছে কাউকে।

নে গেছে?

কথাটা শুনেই যেন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল হোসেনের। গত রাতের গোবিন্দর কথা মনে পড়ল। শেয়ালে-খাওয়া কইমাছ।

গলাতে থুথু আটকে গেচিল। গিলে সে বলল, আওয়াজটা কিসের?

আওয়াজটা আছাড়ী-পটকার। মধু বলল, নিরুত্তাপ গলায়।

বন্ধুকের লয়?

বন্ধুক ওরা পাবে কোথা থেইকে?

আছাড়ী-পটকাই বা পেল কোথা থেইক্যে?

কেন? ফরেস্ট-ডিপার্ট দিয়েচে। সেই ইংরেজ আমল থেই ক্যেই

দিইয়ে আসতিচে। শোনোনি কি তুমি?

কেন?

আর কেন? সোঁদরবনের বাঘ আছাড়ী-পট্‌কার শব্দে ভয় পেইয়ে পাইল্যে যাবে বলে। হাঃ। বনবিবির বাহনেরা পাইল্যে যাবে কি? ধারে-কাছে অন্য বড় মিঞা থাকলি পরে সি শালারাও সিরিফ আওয়াজ শুইন্যেই চইল্যে আইসবে। মানুষ ধরার ধান্দায়।

তবে আছাড়ী-পটকা দেয় কেন ওদের? এ তো ভাল করতি যেইয়ে মন্দ করা গো।

গরীবের জীবনের দাম কি? আছাড়ী-পটকা দেয় তেনাদের চুলকুনি মারার জন্যি। সাদা চামড়ার ইংরেজরা না হোক দেশকে চুষতি এইসেচেলো। গত পঁয়তাল্লিশ বচরেও কি এই চোষা-বিদ্যা ভোলা গেল না!

হোসেন চুপ করি থাকল।

মধু বলল, মাঝি-মদ্দি কী মনে হয় জানো, চাচার সাঙাত?

কি?

যদি বেশ কিছু বন্দুক যোগাড় হতো তবে শালার ফরেস্ট-ডিপার্ট, পুলিশ-ডিপার্টের গুষ্টি নাশ কইরে ছেইড়্যে দিতাম। বাঘ-কুমীরের দাপটের কতা ত শুনেচো কিচু কিচু, জল-পুলিশের কতা কি শুইনেচো? ফরেস্ট-ডিপার্টের কিছু গুহ্য-কতা?

হোসেন বলল, কারো গুহ্য-কতাই আমার শোনার দরকার লাই। ঐদিকে কি হল্যো আমি তাই ভাবতেচি। ঐ যে একটা শব্দ হলো না!

হবেটা আবার কি? হারাধনের দশটি ছেলের একটি কী দুটি গেলো। এ নিয়ে অত ভাববার কি আচে? আর সব খাদ্য-খাদকই বেজায় মাগ্‌গি। ইকানে শুধু মানুষেরই কুনো দাম লাই। "লে-লে-বাবু দশ পয়সা"তে বিকোচ্চে। যতক্কন তুমি নিজে না যাচ্চো তাদের পেটে তদ্দিন মৌজ ওড়াও। পেটভরি কঁ্যাকড়ার ঝাল কী পার্শে মাছের ঝোল দি ভাত খেইয়ে নাও। "অদ্যই শেষ রজনী"। যাত্রার পোস্টার

দেইকেচো? হাঃ হাঃ। আমাদের জীবনও তেমনই। কেউই জানে না কার অদ্যই শেষ রজনী।

সারেং মিঞা হেঁইক্যে বলল, গাছে বসেই, ও মুনসের। কী করবি? তুই শালা গেইলি না কেন ওদের সঙ্গে?

আমি? আমি কেন? মন্ত্র ত পইড়্যে দিচি।

ঠিকমতো মন্ত্রই যদি পড়লি তবে ও বিচারাদের বড় মিঞার সঙ্গে দেকা হইল্যো কেন?

তার আমি কী জানি! মুইত্যে দেচিলো বোধহয়। নইলে থুতু ফেইল্যেচিলো।

গতিক কি বুঝিস্?

সুবিধের লয়। নিদেনপক্কে ওদের মদ্দি একটো ফিরবে না। গড়বর-সরবর না হলি আছাড়ী-পটকা ফুইটেল্যে কেনে?

ঠিক সেই সময়েই বনের ডানদিক থেকে খুব জোরে বাঁদর ডাকতে লাগলো।

সারেং মিঞা সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কী মরি করে কেওড়া গাছ থেকে নেমে এল।

ওদিকে ততক্ষণে ভাঁটিও দিতে আরম্ভ করিচে। স্যাঁতস্যাতে কালো পলি-মাটিতে গোড়ালি অবধি ডুবিয়ে নিজের নৌকোতে উঠলো সারেং মিঞা।

বললো, আমাকে পার করি দে খালটা হোসেন। ডিঙ্গি খোল। যেতি হবে।

হঠাৎ হোসেন বলল, আম্মো যাবো।

তুই! তুই কি জানিস রে সোঁদরবনের? তুই যাবি কি মরতে?

চাচা! তুমি মরলি আমিও মরব। মরার ভয় কইরল্যে কি তোমার সাগরেদ হই? সাঙাত? তুমিই না নাম দেচো।

এক মুহূর্তের জন্যি তাকালো সারেং মিঞা হোসেনের মুকির দিকে। পরক্ষণেই বললো, চল্ তবে মুন্সের। চল, যাই।

আমি গিয়ে কি কইরব চাচা? আমার কি বন্দুক আচে?

মুনসের বাউলে সারা মুখ খোঁচা-খোঁচা গোঁফ নিয়ে ছুঁচোর মতো বলল।

কিছু মনুষ্যির চেহারা দেইখ্যেই হোসেন বলতি পারে যে, শালারা মনুষ্যি লয়, জানোয়ার। মুনসেরও তেমনই পদের!

রাগে লাল হয়ে উঠল সারেং মিঞার দু চোখ। বলল, ডরপোক। আল্লা রসুল তোকে দোজখ্‌এও ঠাঁই দেবেন না।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সারেং শুধোলো মধুকে, যাবি নাকি মধু?

চলো। ডিঙ্গিতে বসি বসি পায়ে বাত ধইর‍্যে গেল। যাবো চাচা।

মধু বলল।

খালি হাতে যাবি? একেবারে নাঙ্গা হাতে?

শড়কি আছে।

মধু বলল।

ওরেও কিছু একটা দে। মানে, হোসেনরে।

দা দিতিচি।

কী দিবি?

দা আছে। দাই দিতিচি।

একজন জেলে মাছধরা বন্ধ রেখে তার নৌকা থেকে একটি দা এনে দিল হোসেনকে।

সারেং মিঞার দল রওয়ানা হয়ি যাবে ঠিক এমন সময়ে জেলেরা সমস্বরে বললো, আমরা কার ভরসায় থাকব চাচা? তুমি চইলে গেলে?

অনেকই মাছ হইয়েচে।

সারেং মিঞা এক মুহূর্ত ভেবে বলল, পার্শে আর ভাঙন মাছে ভইরে গেছে নৌকো। তোরা জাল তুইল্যে নে মাঝখালে চইল্যে যা। আমার ডিঙ্গিটা কেউ বেয়ে নিয়ে যা। আমার ফিরতি ফিরতি ভাঁটা পুরোও হইয়ে যেতি পারে। "কু" দিলে সব ডিঙ্গি নিয়ে পারে আসবি। ঐ শালা মুনসের-বাউলকে আজ ভাতও দিবি না খেইতি।

একসঙ্গে এত কথা বলতে শোনেনি হোসেন সারেং মিঞাকে এর

আগে। রাগে, বাঘেরই মত গরর-গরর করচেল মিঞা। একন অবশ্য একেবারে চুপ মেইর‍্যে গেচে।

সারেং আগে আগে যাত্তিচে। বন্দুকের ছু'নলেই টোটা ভইর‍্যে নেচে। বন্দুকটা কাঁধে শুইয়ে রেখেচে মিঞা। বড় বড় পা ফেলি এইগ্যে যেত্তিচে। কিন্তু ভাঁটি দিতে শুরু করা বনের মধ্যে প্যাতপ্যাতে কাদায় আছাড় না খেইয়ে চলাও এক ভীষণ ব্যাপার। তার উপর চারধারেই কেওড়া গাছের শুলো সোজা-সটান মাথা উঁইচ্যে আচে। একবার পা-ফস্‌কালেই একেবারে ভীষণ শরশয্যা কইর‍্যে দেবে। তাড়াতাড়ি কিন্তু খুব সাবধানে এগুত্তিচে সারেং মিঞা। মাঝে মাঝে উবু হইয়ে বইস্যে দেইকে নিত্তিচে চারপাশ। গোলপাতার ঝাড়গুলো এমনই যে, দেকা যায় না কিছুই তার নীচে। অথচ তার যে-কোনোটারই নীচে বাঘ লুইক্যে থাকতি পারে।

এতসব কী গাছ? কোনটা কী গাছ?

হোসেন ফিসফিস কইর‍্যে শুধোলো মধুকে।

মধুও ফিসফিস করলো, কেওড়া ত জানোই! ঐ ছ্যাখো, হেঁতালের ঝোপ। কী ঘন দেইকিচো। এটা গেঁয়ো। এই যে গরান। পশুড়, ধোঁদল, টক-সুন্দরী। সুন্দরী ত আচেই। যার নামে বন। তবে কম দেখা যায় একন সে গাছ। আর একটু এইগ্যে যেয়ি বলল ফিসফিস কইর‍্যে। এই টক-সুন্দরীর বন খুব ছোট ছোট কিন্তু ঘন। এরই মদ্দ্যি দিয়ে, অসম্ভব না হলি বাঘ হরিণকে তাড়া কইরে নে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যিই হরিণের শিং যায় আটকে, তখন বাঘ তাকে সহজেই কায়দা করে ফায়দা উটোয়। ঐ যে হেঁতাল দেকিচো, তার কথাই বলচিলাম। বর্ষাকালে হেঁতালের মাথা কেটে বড়া ভেজে···

চুপ করবি তুই মধু! তোর মাথা কেটে বড়া ভেজে খাবে একুনি বাঘ। শুধু কতা!

রেগে গিয়ে, কিন্তু গলা নামিয়েই বলল, সারেং মিঞা।

পিস্‌পিস্ করেই ত বলছি।

কোনো কতাই লয়।

মধু বলল, তুসস্ শালা। খেলি, খাবে। আমার মাথার পটকা ফেইট্যে যেয়ে পিত্তি গলে গেছে সি কবে! পাঠশালে পড়ার সময়ি। একবার খেয়েই দেখুক না বাঘে। ঐ মাথা-ভাজা খেয়েই তার পেরাণ যাবে।

চুপ কর। চুপ কর।

সারেং মিঞার "চুপকর" আওয়াজটি মিলোতে না মিলোতেই সামনে কী যেন একটা শব্দ শোনা গেল। ওরা তিনজনেই যে যেমন পারল আড়াল নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। মধু শড়কিটা বাগিয়ে ধরলো। সাবেং মিঞা বন্দুক সামনে ধরে থাকলো। হোসেন দেখল, মিঞার ডানহাতের তর্জনী তার ট্রিগার গার্ডে।

আওয়াজটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। দা নিয়ে, সেও তৈরী হল।

বেলা প্রায় এগারোটা একন। রোদ বনের ভিতরে ভিতরে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে গেচে। বনের আনাচ-কানাচেরও অন্ধকার ঘুচেছে। তবে একনও এমন অনেক জায়গাও আছে যেখানে আলো পৌছয়নি। হয়ত কোনোদিনও পৌঁছয় না। কিছু জায়গাতে আলো-আঁধারি। হাওয়াতে হেঁতাল আর গোলপাতার পাতা কাঁপছে। রোদ পিচলাচ্চে তাতে। পিচলে গিয়ে ছিটকে উটে বনময় ছড়িয়ে গিয়ে তিরতির করে কাঁপচে। বিলের একরূপ সৌন্দর্য আর সোঁদরবনের অন্যরূপ।

ভাবছিল, হোসেন।

পরক্ষণেই দেকে তুজন মউলে অন্যজনকে কাঁদে করে নে আসচে। তৃতীয় জনের অবস্তা সাংঘাতিক। তবে বাঘের কামড়ে নয়, ভীমরুলের কামড়ে।

তৃতীয়জনের তুটি চোখই বন্ধ হয়ে গেছে। মুখ ফুলে বাঘের মত হয়েচে। সারা গায়ে ছুঁচ-ফুটোনোর জায়গা নেই। যারা তাকে বয়ে আনতিচে তাদের অবস্তাও মোটেই সুবিদের লয়। তবু মন্দের ভাল। বাঘে ধরেনি, এই ঢের।

মধু ফিসফিস করে বলল, বনবিবির বাহন ছেল বাঘ আর মুরগী।

মুরগী যে কেন তা কে জানে। মুরগীর বদলে মৌমাছি বইসে পূজো করতে কইব এবারে। কী অবস্তা!

বলতে বলতে ও আর হোসেন গিয়ে ওদের দুজনকে সাহায্য করল তৃতীয় জনকে বয়ে আনতে। লোকটির জ্ঞান ছিলো না।

সারেং মিঞা বলল, তোরা এইগ্যে যা। আমি পেছনে পেছনে আসতিচি, পেছন আগলে।

"পেছন আগলানো" ব্যাপারটা কি, তা ভাল করে বুঝতে পারল না হোসেন। পরে ককনও জিগেস করে নেবে।

আছাড়ী-পটকা পুটোলো কোন্ হতভাগা? বাঘ এসি হাজির হয়নি এই ঢের।

সারেং মিঞা কৈপিয়ৎ চাইল ওদের কাছ ঠেঙ্গে।

ওদের মদ্দ্যি একজন, তারই নাম বোধহয় যাদব, বলল, নাঃ। যা অবস্তা হল। তার উপর নিতেটা যা ভারী। ওর কেলে-বদনে মাংস নেই কিন্তু হাড়ের ওজন সাংঘাতিক। ভাবলাম, শিষখালটা কাছেই হবে। সিখানে আপনারা এত মানুষ আছেন, খবরটা পেলি একটু সুরাহা হতি পাইরত আমাদের।

খুউব সুরাহা কইরতে গেচিলেন। ঐ আছাড়ী-পটকা ফেইল্যে দে কোঁচড় থেইক্যে। রাইফেল বন্দুকের চোট-এর শব্দ শুইন্যে পর্যন্ত চইল্যে আসে সোঁদরবনের বাঘ শিকার আর মানুষের খোঁজে। আর আছাড়ী পটকা! কী বইলব তুদের, মাঝে মদ্দি আমার ইচে হয় যে, কোনোদিন ফরেস্টের সায়েবদের কাউকে নিয়ে এসি বনের মদ্দি সেঁধিয়ে গিয়ে আছাড়ী পটকা ফুটিয়ে নিজে কেওড়ার তেডালে গাছাল দে নিচের মজাটা দেকি। যত্ত সব মানুষ-মারা কল।

তারপরেই বলল, চ, চ, পা চালায়ে চল। শুইনেছিলাম, গোলপাতা কাটা মহানদী নৌকোতে হেকিম আছেন একজন। তাঁর কাছে নে যা এরে সোজা। কী নাম বললি? নিতে না কী যেন। আরে, কত মনুষ্যি হার্টফেইল কইর‍্যে মইরেই যায় ভীমরুলের কামড়ে।

এই হোসেন। দৌড়বি না যেন কক্কনো। দৌড়েচো কী মরেচো

ইকানে। ই কতা মনে রেকো। সব্বোসময়ে।

হোসেন মউলেদের জিগেস করলো, ঈসস্, এত কষ্ট হল তোমাদের আর মৌচাকই ভাঙ্গা হলো না। মধুও পেলে না!

পাব না, কি? কাল আবার আসব সকালেই, এট্টু ভাল হয়ে নেই। যা, চাক না! গোটা পাঁচ-ছয় আছে। অতবড় চাক দেকিনি আগে। আজই পেইড়ে আনতাম কিন্তু এই শালা নিতের জন্যি! বাবুর গামচাতে আতর নাগানো চেল।

অ্যাঁ? আতর?

হ্যাঁ গো মিঞা! আতর! গোসাবাতে আমরা যখন নৌকো নাগিয়েচিলুম তখন বাবু ইট্টু ইদিক-উদিক গেচলেন। মেয়েচেলের খোঁজ-এ। পেটে ভাত লাই অতচ চ্যাট লকলক। চিত্তির আর কী!

তা চার-পাঁচ দিনেও আতরের গন্ধ গেলোনি?

কী যে বল মিঞা! আতব বলি ব্যাপার! কে মাইখ্যেচেল, কেমন করি, কোন্ মন্ত্র পড়ে দেচিল তা কে বলতি পারে। চাক-গুলোন সব খুঁজে বের করার পব নীচে ধুঁয়ো দে নিজেরা গা ঢাকা দেব কি, তার আগেই রৈ রৈ করে হাজাব হাজার ভীমরুল এসে হামলে পড়ল গো। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম তবুও কি ছাড় আচে! নিতের ত ধুতিই খুইল্যে বেরিয়ে গেল। সি জন্যিই শালাকে সব্বাঙ্গে কাইমড়েচে। বাবুর অঙ্গ-পেত্যঙ্গ ফুইল্যে ঢোল। এই রূপ নিয়ে গোসাবাতে যিনি আতর মাইখ্যেচিলেন তাঁকে একবার দেখায়ে যদি আসতি পারত ত বেশ হত।

হোসেন হেসে উঠল। কিন্তু নিতের দিকে চেয়ে কষ্টও হচ্ছিল। বেচারা বাঁচবে কি না, তাই বা কে জানে। আচ্ছা দেশ বটেক। ইকানে সকলেই যেন সংহার-মূর্তি ধইর‍্যে আচেন। বড়মিঞা থেকে মৌমাছি।

দূর থেইক্যে ওদের সকলকি পাশ খালের দিকে আসতি দেকেই ডিঙ্গি গুলোন মাঝনদী থেইক্যে পারের দিকে আসতি লাগল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। সূর্যর তাপ হইয়েচে খুউব।

॥ ৮ ॥

চামটার খালে ঢোকার পর থেকি পাঁচদিন হয়ি গেচে। হোসেনের মনে হচ্চে যেন চিরদিনই ও সোঁদরবনে আসা-যাওয়া করচে। দুঃক একটাই যে, সারেং মিঞাকে একা পাচ্চে না ও বেশিক্ষণ। একন যে থাকতি পারচে না মোটেই এই ব্যাপারটা যেন সারেং মিঞা নিজেও বুঝতে পারছে। তার ছটফটানি দেকি মনে হয় তার মন বলচে বেলা পড়ে এল অথচ আসল কাজের কাজ পড়েই রইল। যত অকাজ নিয়েই দিন কাটচে।

হোসেনের মনে পড়ে গেল পেদো-পাড়ার মানকে মুদীর কথা। মুদী একদিন যেমন বইলেচেল। মানকে মুদীকে চেলেবেলা থেকেই দেকে আসচে পা-জোড়া করে বসি কাউকে দুশো গ্রাম আটা, কাউকে পঞ্চাশ গ্রাম ধনে, কাউকে লেড়োবিস্কুট, কাউকে কাপড় কাচার সোডা, সন্ধব লবণ, লবঙ্গ বা গরম মশলা বের করি মেপে মেপে দিতে। মাসকাবারী খদ্দেরদের জিনিস দিয়ে আবার খাতাতে সব লিকে রাকছে। চল্লিশপুরের মোটা গুণ্ডা দুবার মানকে মুদীকে প্যাঁদানিও দেচিল উত্তরপ্রদেশের মুগডালের সঙ্গে কাঁকর, কিসমিস এর সঙ্গে রাবারের ড্যালা মিশিয়ে বিক্রী করার জন্যে।

কী যত্নের সঙ্গে যে মুদী প্রতিটি পয়সা গুণে নিত তা দেকার মত চেল। প্রতিটি টাকা বা প্রতি মুঠো খুচরো নেবার সময়ে তার চোক লোভে আর আনন্দে চকচক করত আর পয়সা যখন দিত ফেরৎ তার মুখটা এমন বিষণ্ণ হয়ে যেত।

শ্রাবণ মাসের এক সন্ধেতে সওদা করতে এসে প্রচণ্ড ঝড়-জলের মদ্দ্যি পড়ি যায় হোসেন। মুদীর দোকান চেল বিলের ধারেই। সেদিন মুদীর দোকানে আইটকে পইড়েচিল রাত অবধি। দোকান বন্ধ করার আগে পয্যন্ত দোকানেই চেল। তার পর মুদী তার বাড়িতে নে গিয়ে তাকে খিঁচুড়ি খাইয়ে, ঝড় বৃষ্টি ধরলি, তবে টর্চ আর ছাতা দে রাত বারোটার সময়ে বিলের ঘাটে পৌঁচে দেচিল। ডোঙ্গা ছেঁচে জল বার করতিও সাহায্য কইরেচিল অত রাতে।

হোসেন বলেছিল, তুমি অনেকই করলে দাদা।

মানকে মুদী বলেচিল, এইটুকুই ত থাকবে বাপ। সারাটা দিন যা কম্ম, তার কিছুমাত্রই ত থাকবে না।

হোসেন বাক্যিটার মানে ঠিক বোজেনি তখন। বুজেচেল অনেক পরে, আইস্তা আইস্তা।

বাড়িতে, নাভির নিচে ধুতির খুঁট নামিয়ে মস্ত কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে, ইয়াব্বড়-বড় কাঁসার থালাতে যখন হোসেনকে নিয়ে খিচুড়ি খেইতে বইসেচেল মানকে মুদি, তকন তাকে দেইকে মনি হতিচেল সি যেন ইক্কেরে অন্য মনিষ্যি। মুদীর দোকানে যে মানুষটা বসি থাকে সারাটা দিন তার একটুও যেন মিল নাই এ মানুষটার সঙ্গি। সত্যিই, যতই বয়স বাড়তিচে, দিন যেতিচে ততই হোসেন মানকে মুদী বা সারেং মিঞার মত মনিষ্যিদের দেকে বুঝতে পারচে যে, জীবিকার সঙ্গি মানুষের জীবনের কোনোই সম্পর্ক লাই। যে কসাই, যে সুদখোর, সেও মহৎ মনুষ্যি হতি পারে আবার মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের মোল্লাও অত্যন্ত নীচ চরিত্রের মনুষ্যি হতি পারে। মানকে মুদীর কতাতে একটা ব্যাপার বুঝতে শিকেচেল হোসেন যে, অধিকাংশ মনুষ্যিই মনুষ্যির জীবন নিয়ে ইখানে যদিও আসে সারাটা জীবনই তারা শুধু তাদের জীবিকারই মদ্দি আইটকে থাকে। বিতিচি গেরামের মানকে-মুদীর কতাতে "অর্থ সংগ্রহেই জীবনপাত করি, পরমার্থ নিয়ে ভাবার ফুরসুৎই পাই না।"

"পরমার্থ" কাকে বলে, "জীবন" বলতে কী বোজায় তা জানে না

হোসেন তবে ইসব শব্দ ও বাক্যিগুলোন তার বুকের মদ্দি উতাল-পাতাল করত বলিই ত তার এমন করে পাইল্যে আসা। তা না হলি, পাইল্যে আইসবে কেন?

সারেং মিঞাকে কাচ থেকি যতই দেকছে ততই যেন ও বুজতে পারচে যে রোজকার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাইরেও অন্য একটা জীবন আচে। হয়ত সব মানুষেরই উচিত-কর্ম সেই জীবনকে জানা, তাকে আবিষ্কার করা। এই উচিত বোঝার সঙ্গে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতর কুনো ভেদাভেদ লাই। কুনো সম্পর্ক লাই। কিচু মনুষ্যির, অতি অল্পসংখ্যক হলেও কিচু মনুষ্যির মনের মদ্দি এই ঔচিত্য-বোধটা থাকেই। যাদের থাকে, তারা দৈনন্দিনতার গণ্ডির মধ্যি খাঁচার পাকির মতই ছটফট করতি থাকে। পাকা ঝাপটায়, ঠোঁট দি খাঁচার লোহার পাত কাটার চেষ্টা করে। অনবরত। মুক্তির সন্ধান তারা পেল কি না পেল, শ্যামল আকাশে উড়তে পারুক আর নাই পারুক, তাদের এই চেষ্টার মদ্দি দিয়েই, তারা যে অধিকাংশর মত লয়; এই প্রতিষ্ঠিত সত্যটা পরিষ্কাব হইয়ে যেইতি থাকি অন্যদের কাচে, মানে, যাদের তা বোজাব মতো ক্ষেমতা আচে। মানকেদা সেই রাতে হোসেনের চোখও খুইল্যে দেছিল। কী যেন একটা অভাববোধ তাকিও সেই রাত থেইকেই পেয়ি বসিচে।

একন রাত নেমে এইসেচে। চামটার খালেই তারা আচে। তবে ভাগ ভাগ হয়ে গেচে। এখন যেকানে আচে সিটা গোবিন্দকে যিখানে বাঘে নেয়েচিল তার দুই বাঁক ঘুরে। জায়গাটাতে ঘোর বন। অন্ধকার হবার পরপরই গা-ছমছম করে। সন্দের এক প্রহরের মধ্যিই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ি পড়চে।

সারেং মিঞা ছইয়ে হেলান দে বসি হুঁকো খাচ্চিল। একনও 'খাম্বীরা' তামাক আচে কিচুটা। এখনও এপাশের ওপাশের নৌকো থেকি ছুটপাট কথাবার্তা, তামাক খাওয়ার শব্দ, গান এবং রান্নাবান্নার শব্দও ভেসি আসচে। অনেক দেরী করি ফিরেচে কাঠ কেটে বা মাছ ধরে বা মধু পেড়ে। দূরেও গেচিল অনেকে। জেলেরাই ফেরে সব

চেয়ে দেরী করে। কাঠুরে ও মউলেরা রোদের তেজ কমতি না কমতেই ফিরি আসে। ভাগ্য মন্দ হলি তবুও দিবা-দ্বিপ্রহরেই বাঘে নিয়ে যায় তাদের।

এক ছোঁড়া মাউথ-অর্গান বলি, ছোট্ট কী একটা বাদ্যি এনেচে। ঝ্যাঁ-ঝ্যাঁ, প্যাঁ-প্যাঁ করে সেই বাজনা বাজিয়ে সকলেরই অশান্তি করচে। বাজানো শিকে নেবার পর এত খারাপ নাও লাগতি পারত। কিন্তু একনও বাজানো শিখচে। তবে ছেলেমানুষ! বছর বারো বয়স। তাই কেউ কিছু বলে না। মায়ের কাছে ফিরবে কি না ফিরবে তা কে জানে!

সেই যে হোসেনের সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়েচেল, দ্বিতীয় না তৃতীয় দিনে চামটার খালে ঢোকার আগে, লাল-কালো চেক-চেক লুঙ্গি আব বগল-ছেঁড়া নীল হাফ-শার্ট পরা, তাদের সঙ্গে আজ সকালে আবাবও দেখা হয়ে গেছিল। আগামী কাল থেকে কলিমুদ্দি আর কালু মিঞারা সারেং মিঞাদের সঙ্গেই এক জায়গাতি থাকবে রাতে। ভেবেই ভাল লাগচে হোসেনের। তার সমবয়সী একজন কাচে থাকবে।

নিজেদের পেয়োজনে নৌকো ডিঙ্গি সব ভাগ ভাগ হয়ে যাওয়াতি বিপদও বাড়ছে। এই পাঁচদিনে আরো একজন মানুষ গেছে বাঘের পেটে। তাকে নিয়েচে চন্দ্রদোয়ানিয়া খালের এক পাশখাল থেকি দুপুরবেলা। কাঠ কাটতে নেমেচিল বেচারী ডাঙ্গাতে। দুটি মেয়ে বিয়ের বাকি। সি জন্যিই এইসেচেলো মাছ ধরতি। আরও একজনকে নিত। ছোট-ধুতরা খাল যিখানে গোসাবা নদীতে গিয়ে পড়েচে তারই কিচু আগে পশ্চিমের দিকের এক শিষখাল থেকি। মাছ ধরচেল তিনজনে মিলে। তবে তার ঘাড়ে লাপাবার আগে তার এক সঙ্গী শড়কি ছুঁড়ে দেওয়াতি ঘাবড়ে গিয়ে বাঘ পেছিয়ে যায়।

মধু বাউলে বলচেল হোসেনকে, সুন্দরবনের বাঘ যখন কাঠুরেকে নেয় তখন তারা বড় কায়দা করে এগোয়।

ধূর্তচূড়ামণি তারা। কাঠুরেরা ত চারধারে নজর রেকেই বনির

মধ্যে কাঠ কাটতে ঢোকে। তারা হয়ত দুজনে আছে। একটি গাছের দুপাশে দুজনে কুড়ুল মারছে। বাঘ এমনভাবে দূর থেকি ঘাপটি মেরে একটু একটু করি তাদের দিকে এগিয়ে যাবে যাতে দুজন কাঠুরের একজনেরও চোখের সামনের দিকের দৃষ্টির মদ্দি এসি না পড়ে। দৃষ্টির মদ্দি সি যদি থাকেও তবুও বাঘ ঠাওর হয় না। কত যে সামান্য এবং ছোট জিনিসের আড়ালে প্রকাণ্ড শরীরটাকে লুইক্যে ফেলতি পারে বাঘ, তা যারা নিজেরা নিজ চোখে বারবার বাঘ দেকিচেন তাঁরাই জানেন।

কাঠুরের কুড়ুল যেই পড়ল, গাছে শব্দ হল কটাস করে, বাঘ তকুনি এক পা সামনি এগলো যাতে তার পায়ের চাপে পাতাপুতা বা কাঠ থেকে ভেঙ্গি যাবার শব্দ না কানি যায় কাঠুরের বা কাঠুরেদের। পেয়োজন হলি মোটি একশ হাত জমি জঙ্গলের বা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পেরিয়ে যেতি বাঘ দু-তিন ঘণ্টাও অপেক্কা করে। তার বেশিও করতি পারে। তার উদ্দেশ্য যতক্কন না সফল হবে ততক্ষণই চলবে তার সাধনা। খুদাহ্ পিথিবীর সব শয়তানের সব ধৈর্য দিয়ে পাইটিয়েচেন এই জানোয়ারকে। পিরথিবিতে শিকারি যদি কেউ থেকে থাকে তবে সি এই বাঘ। এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য, এত সাহস আর কোনো প্রাণীর মদ্দ্যি দেইনি খুদাহ্।

শিকারিরা আসতিচেন মোটর-বোটি করি। তারা কলকেতা থেকি রওয়ানাই শুধু হইয়েচেন তাই লয়, ক্যানিং থেকে সারা রাত মোটর-লঞ্চ চালিয়ে এসি কাল সকালিই পৌঁচে যাবেন চামটার খালে। ফরেস্ট ডিপার্টের ছোট পিটেল-বোটে কইরে রেঞ্জার সাহেব, ফরেস্টার সাহেবকে দিয়ে সারেং মিঞাকে খবর পাটিয়েচেন গতকাল। আগামী কাল যেন দু নম্বর আর সাত নম্বর ব্লকের মদ্দির ছোট-ধুতুরা খাল-এ গিয়ে একবার হাজিরা দেয় চাচা।

সারেং মিঞা বইল্যে দেচে যে, ওকানে অনেকই বাউলে আচে। সাহেবরা যেন তাদের নিয়েই বাঘের মোকাবিলা করেন। সারেং বুড়ো হইয়ে গেচে। তাছাড়া শিকার করার ইচ্চেও আর নেই তার আদৌ।

বলেচে বটে, তবু যাবে সারেং মিঞা একবার রেঞ্জার সাহেবের খাস্বাঁরা তামাকের ঋণ শোধ করতি।

ভোর হতি না হতিই ডিঙ্গি খুলে দে ছোট-ধুতুরা খালের দিকে চলল সারেং মিঞা সাত তাড়াতাড়ি। সারেং মিঞা হাসে। হোসেন ডিঙ্গি বাইচে। এখন আর কুনোই অসুবিধে হয় না। একেবারে সড়সড় হইয়ে গেচে হোসেনের।

সকাল আটটা নাগাদ দূর থেকি মোটর বোটের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরই দেখা গেল বিরাট গলুই দিয়ে জলের বুক চিরে দুপাশে ঢেউ তুলে সাদা ধবধবে বোট আসতিচে। তার ডেক-এ নানারকম পোষাক পইরে দিশি অথচ সায়েব শহুরে শিকারিরা বইসে আছেন। কারো হাতি দু-হাজারী 'দূরবীন', কারো হাতি দশ-হাজারী বন্দুক; কারো হাতি পনেরো-হাজারী ক্যামেরা, কারো হাতি কুড়ি-হাজারী রাইপেল।

লঞ্চের ঢেউয়ের তোড়ের মধ্যে ডিঙ্গি সামলানোই দায়। সেই তোড়ে জলের উপরে লাফালাফি করতিচে ডিঙ্গি নৌকো।

শক্ত হাতে হাল ধরি রেকে সারেং মিঞা বলল, আদাব।

আদাব। কেমন আছো সারেং মিঞা?

লঞ্চের এঞ্জিন নিউট্রাল কইরে দে শুদোল বোটের সারেং সক্কলের আগে।

তুমি কেমন আচ গো নীলমণি?

সারেং মিঞা হেসে শুধোল।

ওই। চইলে যাচ্ছে।

খাইদ্য-খাদকের অভাব কি তেমনই চলতিচে একন?

ওই কতাতে হেসি ফেললো নীলমণি। মোটর-বোটের সারেং।

সারেং মিঞা ফিস-ফিস করি হোসেনকে বলল, এই নীলমণিই প্রথমি এই "খাদ্য-খাদক" কতাটা খাবার-দাবার অর্থে চালু কইরে দেয় এই অঞ্চলে। তারপরই কথাটা ধইরে গেচে। তখন নীলমণি চেল এঞ্জিনম্যান। সারেং মিঞার এ্যাসিস্ট্যান্ট।

নীলমণি বলল, আমরা আর তিনটে বাঁক এইগ্যে নোঙর করতিচি। এসো তুমি চাচা। অন্যেরাও আসবেখন। রেঞ্জার সায়েবও পৌঁচে গেচেন হয়ত এতক্ষনে।

ঠিক আচে। এগোও তুমি নীনমণি।

বলেই হাঁকলো, এই। জল তেকে বৈঠা তুলে নে হোসেন।

জল শান্ত হলি পর তারপরই আবার লামাবি।

কাল পিটেল-বোটে-করে-আসা ফরেস্টার বাবু বইলতেচেলেন যে, বাঘ যেখানে শেষ মানুষ নিইয়েচে সেই ব্লকে কেওড়া গাছে মাচা বেঁধে নাকি "গাছাল" দেবেন ঠিক কইরেচেন শিকারিরা।

শিকারিদের বেশভূষা, বন্দুক-টুপি-চশমা সব যেমন তা দেখে হার্ট-ফেল করি না মারা যায় এই সোঁদরবনের অশিক্ষিত, আনকেলচার বাঘেরা।

সারেং মিঞা বলল হোসেনকে।

হোসেন বলল, যা বইলেচো চাচা! কে কাকে খ্যাকে তার টিক নাই।

চাচা বলল, চিন্তার কিচু লাই। ওই শিকারিদের মধ্যেই কাউকে বাঘে খাবে। আর সি কতাটা ইকবার পেচার হয়ি গেলি ইবছরে সব জেলে মউলে-কাটুরেরাই পাইলে যাবে। হিত করতে বিপরীত!

বলো কি চাচা?

তবে আর বলি কি? এরা সোঁদরবনের শিকারিই লয়। ইকানে উসব চালিয়াতি চইলবে না। লুঙি-ধুতি কোমরে গুঁইজে নে, বনবিবি, বড়খাঁগাজী পূজো দে বন্দুক তুহাতে ধইর্যে খালিপায়ে বাঘের পায়ের খোঁচ দেকি দেকি এগুতি হবে ইকানে। দশ চোখ, দশ কান দশ নাক চারদিকে বিস্তার কইরে। শিকারিরা জুতো-শুদ্দু ডাঙ্গায় নামলেই ত জুতো সুদ্ধ পা-ই গেঁইতি যাবে বনে-বাদাড়ে। তারপর তু একটা পড়বে কেওড়ার শুলোর উপরে। পিঠ-কোমর সব এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়ে যাবে চাঁদবদনদের।

তাইলে কি হবে চাচা? চিন্তার গলায় বলল হোসেন।

কি আবার হবে? যা বাঘের আর শিকারিদের কিসমৎ-এ লেখা আচে তাই হবে। বাঘও তো শিকারি, না, কি? দুই শিকারির মদ্দ্যে যে-শিকারি জিতবে, সেই বাঁচবে। অন্য পক্ষ মরবে।

নীলমণি যে-জায়গাতে পৌঁচতে বইলেচেল সিকানে পৌঁচে ওরা দেকল যে সিকানে রীতিমত মেলা নেগে গেচে। ডিঙ্গিতে-নৌকোতে গমগম করছে পুরো এলাকা। রেঞ্জার সায়েব আগেই পৌঁচে গেচেন এবং বাউলেদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্চেন।

সারেং মিঞার ডিঙ্গি ডাঙ্গায় লাইগলে দাঁইড়ে উটে আদাব করলো সারেং মিঞা রেঞ্জার সায়েবকে।

রেঞ্জার সায়েব বললো, তোমার উপর ভার দে গেলাম তবু মানুষ মেরি দিল বাঘে, তুমি থাকতেও! কী সারেং?

সারেং বলল, এতবড় এলাকা সায়েব। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব থাকতেই বাঘেদের ঠেকাতে পারেন নি উনি, আর আমি ত কোন্ ছাড়!

রেঞ্জার সায়েব ত তদারকি করি চলে গেলেন!

॥ ৯ ॥

ঘটনাটা ঘটল পরদিন সকালে।

শিকারিদের বোট রাতে ডাঙ্গার পাশে নোঙর করা ছিল। ই পের্যন্ত কোনো মোটরবোটে উটে একজনও মানুষ নেয়নি বাঘে সুন্দরবনে। নেয়নি কেন তা বলা মুশকিল। হয়ত বাঘেদের ভয়, হয়ত সংস্কার। তা নইলে নিতে কোনো অসুবিধেই ছেলোনি। কুমীরও যদি ডিঙ্গি বা নৌকোর তলায় পিঠ লাইগে দে' ভেসি উটতো উপরে তাইলে কি নৌকাডুবি হতোনি? কিন্তুক ডিঙ্গির চেয়েও যে-কুমীর সাইজে বড় সেও তো কোনোদিনও নৌকো উল্টে দিতি সাহস পায়নি। এও হয়ত ভয় ও সংস্কার। মানুষ যে সবচেয়ে খারাপ চরিত্তিরের সবচাইতে ডিঞ্জা-রাস জানোয়ার ঐ খুদাহর দুনিয়ায় ই খপরত তারাও রাখে কি না!

যাইহোক, সকালবেলা চা-জলখাবার খেয়ে চারজন শিকারি দুজন কাঠুরেকে নিয়ে তাদের মাতায় পশুর কাটের তক্তা চাপায়ে দড়ি-টড়ি নিয়ে মাচা বাঁইধবেন বলি জঙ্গলে ঢুইক্যেচিলেন।

গতকালই বিকেলে নেইম্যে দেইকেচিলেন যে খালের কাছে ডাঙ্গার উপরে পায়ের অগণ্য থোঁচ। যেন শোভাযাত্রা করেই বাঘগণ গেচে সি পথ দিয়ে। পথের দুপাশের গাচে গাচে বাঘের পায়ের নখ ধার দেওয়ার গভীর চিহ্ন। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁইড়ে উট্যে বড় বড় গাছের গুঁড়িতে বাঘ নখ ঘষে-ঘষে নখ পরিষ্কার তো করে বটেই, নখে ধারও দেয় অমনি করেই। শিকারিরা চইলেচেন বন্দুক রাইফেল নে, সারি বেঁইদে অতি সন্তর্পণে চারিদিক ইতি-উতি দেখতি দেখতি।

অকুস্তলে পৌঁচি মাচা বাঁইধাবেন নিজেদের তদারকিতে। তাপ্পর বিকেল-বিকেল এইস্যে সেই মাচাতি বইসবেন। দুটি জায়গাতে দুটি মাচা বাঁধা হবেক এমনই কতা চেল।

বনের ভেতরে কিছুটা যেতেই একেবারে আচম্বিতে ভয়-ডর হান অদৃশ্য বাঘ গেঁয়োর জঙ্গলের মদ্দি থেইকি ইকেবারেই অতর্কিতে ডান ধার থেইকি কোণাকুণি যেন উইড়্যে এসেই এক শিকারির ডান কাঁধ আর ঘাড় কাইমড়ে তাকে নে মাটিতে পইড়েচে। সেই শিকারির হাত থেইকি তো বিশ-হাজারী রাইফেল ছিটকে পইড়ল সঙ্গে সঙ্গে কাদার মদ্দি। অন্য দুজনের একজন কাণ্ড দেইক্যে স্ট্যাচু হইয়ে যেয়ে দাঁইড়্যে রইলেন! বাকরোধ হইয়ে গেলো তাঁর। আর অন্য জন বন্দুক উইট্যে গুলি করতে চেইচিলেন কিন্তু পাচে বন্ধুরই গায়ে লেইগ্যে যায় সেই ভয়ি করতি পারেন নি। হাঁ করি চেইয়ে রইলেন তিনি সেই দিকে। ইতিমধ্যি একজন দুঃসাহসী কাটুরে কইরেচে কি, এক লাপে বাঘের দিকে এইগ্যে যেয়ে তার মাথা থেকি্য পশুর কাঠের ভারী তক্তার বোঝ ঝেইড়্যে ফেইলেচে বাঘের গায়ের উপর। বাঘ তখনও শিকারের টুঁটিতে পেরথম কামড় আলগা দেয়নি সেই সময়েই তার উপরে তক্তা পড়াতে সে বেজায় চইট্যে উট্যে শিকারিকে ছেইড়ে দে কাঠুরেকে ধইরতে গেলো। কিন্তুক সেই ঝান্নু মিঞার পো তক্তা ঝেড়ি ফেলার সঙ্গি সঙ্গি তরতরিয়ে একটো সাদাবানী গাছের মগডালে উইট্যে পইড়ল বাঁদরের মতো। ততক্ষণে অন্য শিকারি ঘুরে দাঁইড়্যে চোট কইর্যে দেচে বাঘের উপর তার বন্দুক দে। তবে 'চোট' ভাল জায়গাতি হলোনি। গুলি নাগল যেয়ে বাঘের পেইটে। তাতে ত বাঘ সাক্ষাৎ যমরাজ হইয়ে উইট্যে গুলি-মারা শিকারিকেও পেইড়্যে ফেলল। ততক্ষণ যে শিকারি বাকরোধ হইয়ে স্ট্যাচু হইয়ে গেচিলেন, তিনি গতিক সুবিধের লয় বুইঝে নিয়েই ঘুইর্যে দাঁইড়্যে লম্ফ বলে দৌড়।

দুই শিকারিকেই ধরাশায়ী দেকে সোঁদরবনের পোক হইয়েও অন্য কাটুরে ভয়ানক ভুলটা কইর্যে বইসলো। সেও শহুরে শিকারির পেচনে

পেচনে দৌড় লাগাল। বাঘ তকন দু নম্বর শিকারির বুকের উপরে বইস্যে ঘাড় ঘুইর‍্যে ইকবার দেইক্যে নিল দৌড়ে-যাওয়া শিকারি আর কাটুরেকে। কাটুরে যদি মাথার ভারী তক্তা মাটিতে ফেইল্যে দিত তবেও হয়ত কিছুটা যেতি পারত। সে হাল্কা হয়ি দৌড়তি পারত। শব্দেও বাঘ এট্টু থমকি যেতি পারত, থমকালি! কিন্তু তার কিচুই না কইরে সে অনভিজ্ঞর মতো দৌড় লাগালো। সাদা লঞ্চ থেকি মোটা তক্তার "সিঁড়ি" নামানো চেল ডাঙ্গাতে। বাঘ দুজনকেই তাড়া কইর‍্যে যেয়ে প্রথমে ধরল শিকারিকে। তার সাধের খাকি জামা-প্যানটুলন ফাল-ফালা করি নখ দে ছিঁড়্যে ফেইল্যে কানি কইর‍্যে ফেইলল মুহূর্তের মদ্দি। তাপ্পর তার ঘাড়ে, বেড়াল যেমনটি ইঁদুর ধরে তেমনি করি কামড়ে ধইর‍্যে রইলো কিছুক্ষণ। তাপ্পরই তিন-চার থাপ্পড় লাগালো মাথায়-ঘাড়ে। "থপ্" শব্দ কইর‍্যে শিকারির মাথার খুলি ফেইট্যে গেল। ততক্ষণে কাঠুরে লঞ্চে পেরায় পৌঁচে গেচে। আর মাত্র হাত দশেক। নীলমণি সারেং লঞ্চের মাতায় "সুকান" ধইর‍্যে বইস্যে চেল। সে প্রাণপণ গলার শির ফুল্লিয়ে চেঁচাতি নাগল, উইট্যে পড়্! উইট্যে পড়! প্রাণনাথ, তোর পোঁদে বাঘ।

আর মাইত্র দশ হাত চেল। প্রাণনাথ যার নাম, সেই কাঠুরে পেরায় উইট্যে এইসিচেল লঞ্চে। ততক্ষণে তার বুদ্ধি খুইলেচে। সে দাঁইড়্যে পড়্যে মাথার তক্তা খপাত কইর‍্যে মাটিতে ফেইল্যে দে বোটের সিঁড়ির দিকে দৌড়েচে। আর দু-হাত বাকি। বোটের এঞ্জিনম্যান, বাবুর্চি, মাল্লা, খিদমদগার, নীলমণি সারেং ও শিকারিবাবুদের দুজন মোসাহেব দু হাতে তালি বাজায়ে বাঘকে আইটকাবার চেষ্টা করতিচেন। প্রাণনাথের ডান পা যখন সিঁড়িতে তখন বাঘ বড় এক নাপ মেইর‍্যে এসে তাকি ধইর‍্যে ফেলল। ঘাড় কামড়ে তাকে মাটিতে ফেইলেই, ছেইড়্যে দিল। পরক্ষণেই অতজন মানুষের সামনে প্রাণনাথের মুণ্ডুটাতে কামড় বইস্যে দে তাকে ফেইল্যে রেকে পেচণ্ড হুংকার দে সক্কলের হাত-পা ঠাণ্ডা কইর‍্যে আবার বড় বড় লাপ দি জঙ্গলে ফিরে গেল। তখন সেও রক্তে মাখামাখি হইয়ে গেচে। পেটের রক্তে

শরীর ভেইস্যে যেতিচে। নীলমণি সারেং, অনেক বছরের সারেং, সুন্দরবনে তার অভিজ্ঞতাও কিছু কম লয়। তবু সে প্রাণনাথের মাথাটার দিকে চেইয়ে তু হাতে মুখ ঢেইক্যে ফেইল্যে। বাড়িতে পরথম-পোয়াতি বউ প্রাণনাথের! তার মাথা ত লয়। যেন শেয়ালে খাওয়া কই মাছ!

॥ ১০ ॥

এমনি কইর‍্যেই দিন যাতিচে। ঘটনার পর ঘটনা। তাপ্পর আরও ঘটনা।

আইজকে দুক্কুরবেলা একটি পাশ খালে নোঙর কইর‍্যে আচে হোসেনরা। আসলে এরফানেরা আচে, তাই। মাছ ধরচে সুঁতি-খালের মদ্দি। রোদ চকচক করতিচে জলে। জোয়ারের জল ঢোকার একটানা শব্দ হতিচে জোর। ডিঙ্গির খোলের গায়ে পাতা-পুতা কাঠ-কুটো সড়সড় শব্দ কইর‍্যে চলি যাতিচে। পাখি ডাকতিচে। মাছরাঙা, চমকি চমকি। কালু হঠাৎ ডাক দে মাথার মদ্দি ছুরি চাইল্যে দিতেচে। এরফান বইলতেচেলো, এই পাকিগুলোন শীতকালে এলিই বেশি দেকা যায়। এরফানেরা শীতকালেও আসে। পেতিবছর। আঃ তখনকার সুন্দরবনের যা নূপ! নীল জল, সবুজ জঙ্গল, নীল আকাশ। সুন-সান।

এরফান বলতিচিল।

সুন্দরবনের 'নূপ' বোধহয় সবসময়েই ভাল। শুধু বর্ষাকাল ছাড়া। সারেং মিঞা বলে আবার অন্য কতা। রূপের মাদ্দ এট্টু ভয় না-থাকলি কি সে 'নূপ' খোইল্যে!

আরো ভয়! আর কত ভয়ের পেয়োজন 'নূপ' খোলাতে সারেং মিঞার? পাগল একেই বলে।

হোসেন ভাবে।

এরফান বলল, এইসো দিক, ধরো, জালের ইপাশটা। বিল-এ

মাছ ধরা, পুকুরে মাছ ধরা আর স্রোতের নদীতে, জোয়ার-ভাঁটা গোন-বেগোনের নদীতে মাছ ধরা অন্য বি্যপার।

নতুন জিনিস শিখচে হোসেন। শুধু ইকটা কেন, পেতিমুহূর্তেই নতুন জিনিস শিখতিচে। ভাল লাগতিচে খুব।

ওরা সুঁতি-খাল বা শিষ-খালের যেখানটাতে দাঁইড়্যে মাছ ধইরবার কসরৎ কইরছে তার এট্টু দূরেই পাশ-খালে ডিঙ্গি বেঁইধে সারেং মিঞা তামাক খেইতেচে রোদে বসি। এতক্ষণ টোঙের মধ্যি শুইয়েচেল। এট্টু ঠাণ্ডা নেইগেছে মিঞার। সকালের দিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকতিচে। সারেং মিঞাকে দেখা যাতিচে না তবে তার তামাকের ধুঁয়ো দেখা যাতিচে। সাদা, পেঁজা-তুলোর মতো ধুঁয়ো ভোরের বাতাসে ভেইস্যে আসতিচে শিষ-খালের দিকে, গরাণ আর কেওড়া গাছের ভীড়ের মদ্দি দে। ভারী শান্তি। এই নির্জন বনে। এই শান্তির বুকের মদ্দি যে এতরকম অশান্তি লুইক্যে আচে তা কে বলবে!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই মাছের জাল বাঁইধতি বাঁইধতি হোসেনের মনে হল, কী করতিচে সি ইকানে। সি তো মাছ ধরতি বা মধু পাড়তি বা কাঠ কাটতিও আইসে নি ইকানে। তবে ঠিক কী করতি যে এইসেচেল তাও সঠিক জানা নেই ওর। সারেং মিঞার সঙ্গি এইসেচেল এক নতুন দুনিয়াতে প্রবেশ কইরবে এই আশায়। এই সোঁদরবনের বাঘ, কুমীর গো-সাপ, সাপ, কামট, হরিণ, বাঁদর, এর আশ্চর্য, জোয়ার-ভাঁটি, এর গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি এসবই ইকেবারেই যে লতুল তাতে সন্দেহ লাই কোনো। কিন্তু এই লতুন যে সি লতুল লয়। ও যে বেবাক অন্য ইক লতুল দিশের জন্যি তৈরী হইয়ে এইসেচেল মনি মনি। সেই দিশটা যে কোতা তা তো সারেং মিঞার হাবে-ভাবে ঠাহরই হলো নি ইকন পয্যন্ত। কে জানে! কী আছে সারেং মিঞার মনে! কী ভাবে! কী করে! কোথায় নে যায় তাকি শেষ পয্যন্ত।

তবে একটা ব্যাপারে ও মনে মনে এট্টু দুঃকু পেইয়েচে। এই এরফানকে সারেং মিঞা যেন একটু বেশি স্নেহের চোখে দেখতিচে।

হোসেনই ত তার সাঙাত, কিন্তু এরফানরা ফিইর‍্যে আসার পর থেইকেই, এ কদিন সারেং মিঞার এরফানের প্রেতি ব্যবহারটা কেমন যেন মাখো-মাখো ঠেকতিচে। কী ব্যাপার কে জানে।

সারেং মিঞাও ভাবতেচেল, কী করতিচে সি ইকানে? কেন আসে, কোতায় যাইব্যে বইল্যে আসে আর কোথায় বার বাব তার ডিঙ্গি ঠেইক্যে যায় সাত্য-চড়ায়, মিথ্যে-চড়ায়, গোন-বেগোনে, দোয়ানিয়া খালে তা ভেইব্যে পায় না সে। অন্য দশজনের মত তার যদি কুনো সুগোল গন্তব্য থাকত, মানে যে গন্তব্য আর ফেরাতে এক বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়, তবে ত ভাবনা ছেল না কুনোই। কিন্তু সে যে সারেং মিঞা। সে যে অন্য কেউই লয়। তার চলার পথ, তার গন্তব্য সবই যে অন্যদের থেকি আলাদা। তবু কী করতিচে সে ইকানে?

সারেং মিঞা, টোঙের গায়ে হেলান দে গলুইয়ের দিকে ডান পায়ের উপরে বাঁ পাটা চাইপ্যে দে বইসেচেল। এবারে পা বদলে, বাঁ পায়ের উপরে ডান পা'টি চাপাল।

এই দুটি পা অনেকই হেঁটেছে এই দুনিয়ার পথে পথে, অনেকই সাঁতার কেইটেচে জীবনভর। দুটি পায়ের মদ্দি কোন্ পাটি যে বেশি কেলান্ত তা ও বুঝে পায় না।

তবে ডান পায়ের আঙুলগুলি আজকাল ফুলতিচে, ডান হাঁটুটাও বেগড়বাই কইরতিচে। শরীল নোটিস দিতেচে "বেলা পড়্যে এইল্যো, ঘরকে যাও। মিঞা ঘরকে যাও।"

কিন্তু ...

সারেং মিঞা এরফান-এর কথাই ভাবছিল। তারই সঙ্গে, এমন সব কথা, যা সারেং নিজেও কখনও নিজমুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করে নি। স্বপ্নে দেকেচে। দেকেচে অবশ্যই! জীবনে একবারই শুদু, একবারই একজন মনুষ্যির মেইয়ে তাকে প্রায় তার দু-ডানা কেইটে দিয়ে অন্য দশজন পুরুষেরই মত সংসারের পাঁকে আইটকে ফেইলেচেল। তার নাম ছেল নাজনীন। শেষ পযন্ত অবিশ্যি তার বাঁধন কেইট্যে পাইলে

আসতি পেইরেচেল সারেং মিঞা। কারণ, সারেং মিঞা জাইনত যে বিবি যদি বুঝদার না হয়, না মমতা থাকে তার মিঞার প্রতি, মিঞাকে যদি সি নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর যাবতীয় খোয়াব হাসিল করার উট হিসেবেই ব্যবহার করে যায় আজীবন, তবে সেই নিকাহ্ মরদের পক্ষে কয়েদখানা। দু পায়ে ভারী বেড়ি নিয়ে সেই মরদের পক্ষে শর উঁচা করে ইনসান্-এর মতো বাঁচাই অসম্ভব। তার উপরে সারেং মিঞার মত ইনসান! যার ইনসানিয়াত বোঝে এমন আদমই কম আছে খুদাহ্‌র দুনিয়াতে।

তাছাড়া শাদীর পর কোন্ বিবি যে কেমন নিকলাবে তা শুধু কিসমৎই বলতে পারে! শাদী করা আর কিমতি মোড়কে কোনো উপহার গ্রহণ করা যেন একই জিনিস। মোড়কে-মোড়া উপহারের মোড়ক খুলবার পর যে কী চিজ বেরুবে ভেতর থেকে তা একমাত্র খুদাতাল্লাই জানেন। যাই হোক, ঐ জুয়া খেলার মধ্যে যায়নি সারেং মিঞা। নিজের জান বাঁচিয়ে ভেগে এসেচি সাধারণ হয়ে যাওয়ার অভিশাপ থেকে, সারাজীবন নিজের মাপের চেয়ে ছোট হয়ে বেঁচে থাকার গুণাহ্ থেকে বেঁচে গেচে। নিজের জিন্দগীকে নিজের নিজস্ব করে রেখেচে। কলুর বলদ করে নি যে নিজেকে, এইটা ভেবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু সেই মুখটি, নাজনীন-এর সেই মুখটি এখনও মাঝে মাঝেই তার মনের মদ্দি ভেসি ওঠে, এমন একলা হয়ে-যাওয়া নদীর উপরের রোদ-ঝলমল সকালে বা হঠাৎ ঘুম ভেঙি-যাওয়া-অগণ্য তারা-ভরা ঘোর অন্ধকার মাঝরাতে। "দিল্‌কি আয়িনেমে হ্যায় তস্‌বির ইয়ার, যব গর্দান ঝুঁকায়ি, দেখ লি।" নাজনীন তার বন্ধুই ছিল। আর বন্ধুর ছবি ত হৃদয়ের আয়নাতে থাকেই। যেই ঘাড় একটু ঝুঁকোয়, অমনি সেই ছবি ফুটে ওঠে।

"নাজনীন" কথাটার মানে, শুনেচিল সারেং, নাজনীন-এরই কাছে। আহ্লাদী। সেই আহ্লাদীর মুখছবিটি জলছবিরই মতো সেঁটি আচে সারেং মিঞার স্মৃতিতে। আর কী আশ্চয্য! এই এরফান

ছেলেটার মুখ যেন হুবহু নাজনীন-এরই মুখ।

কবে হারিয়ে গেচে নাজনীন, সারেং মিঞার জীবন থেকি। কখনও তাকে লতুন করে খুঁজতে বেরুবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার জীবন, পুরুষের জীবন, নারী-বিবর্জিত জীবন। পুরুষদের নিয়েই তার সবকিছু। কাজ-অকাজ, খেলা, ঈশ্বর-ভজন সমস্ত কিছুই। কোনো নারীরই স্থান লাই তার জীবনে। থাকবেও না কোনোদিন। আর সেই জন্যিই কিচুদিন হল বড় উতলা হয়েচে সারেং এরফানকে দেকে, তাব প্রিয়-নারীর ইয়াদগার হিসেবে।

কলিমুদ্দি বুড়ো 'হরচি' আর 'টিপালি' নিয়ে তার নৌকোর "টোঙ"-এ পেছন ঠেইক্যে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে জাল বুইনতেছেলো। সে ছেল শিব খালের ইকেবারে মুখেই। একটা পশুর গাছের সঙ্গে তাব ডিঙ্গি বেঁইধ্যে। সেও যেন কী ভাবতিচেল। এই সোঁদরবনের মত এমন জায়গা নাই ভাবাভাবির মতো। চারদিকের পরিবেশ থেকি, জল থেকি আকাশ থেকি, বিচিত্র গাছগাছালি থেকে, জলের জোয়ার-ভাঁটা থেকি, কালু পাখির হঠাৎ চিৎকার থেকি, হঠাৎ আসা "পিঠেম" বাতাস থেকি, ভাবনা যেন উটে এসি মাতার মদ্দি সেঁদিযে যায়। অতীতের ভাবনা, ভবিষ্যতের ভাবনা, সুখ-দুঃকের ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতার সব ভাবনা 'হরচি' আর 'টিপালি'র মদ্দি মদ্দি জাল-বোনা সুতোরই মত যেন জড়ামড়ি কইর‍্যে আইটকে যায়। তখন বর্তমানকে আর অতীত ভবিষ্যৎ থেকি আলাদা করার কোনো জোটি থাকে না আর!

দুই বুড়ো একে অইন্যকে দেকতি পেতিচে না। অথচ এরফান আর হোসেন তারা যিখানে মাছ ধইরতিচে সিখান থেকি ওদের দুজনকেই দেখতি পেতিচে।

বেলা বাড়তিচে। মাছরাঙারা ঘন ঘন ছোঁ দিতিচে জলে। জলে ও ডাঙ্গায় দু-জায়গাতিই বেঁচে থাকা স্যালামাণ্ডার, এই টুকুনটুকুন, জলের তলায়, হোসেনের উরুতে, সুড়সুড়ি দে পিচলে পাইল্যে যেতিচে। যেই ভাঁটি দিবে অমনি তারা প্যাচপ্যাচে কাদার উপর

এঁকিবেঁকি যাবে। তখন দেকলি, গা-ঘিনঘিন করি ওট্যে।

মাছ বেশ অনেকই হল। নৌকোর সঙ্গে হাপর আছে। তাইতে জ্যান্ত মাছ রেইক্যে দেবে। একন ছোট একটি জালের মুখ বন্ধ করে খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রেখে দেচে। মাঝে মাঝে ধড়ফড় কইর্যে উটতিচে রূপোলি-কালচে মেশাল যাওয়া মাছগুলোন। জল নড়ি উঠতিচে। রোদ চমকি যেতিচে চলকি-ওটা জলে। তাপ্পর তিরতির করি কাঁপাতচে দুপাশের ঝুঁইক্যে-পড়া গাছগাছালির কাণ্ড, শাখা-পেশাকায় আর পাতায় পাতায়।

হঠাৎ এরফান জোরে চেঁচিয়ে উঠল, পাড়ে ওটে! পাড়ে ওটো! হে হোসেন! কুমীর। কুমীর।

কুমীর দেখতে পায়নি হোসেন। কিন্তু শিষখালের জলের মদ্দি একটো লম্বা ছায়া দেখতি পেইয়েচেল হটাৎ। তড়াক্ করি ইক লাপ মেইরি পারে উইটেচে। সঙ্গি সঙ্গি এরফানও। আর পেরায় তারই সঙ্গি সঙ্গি যে-খোঁটার সঙ্গি জলে-ভরা মাছগুলোন বাঁধা চেল সেই খোঁটাটা চটাং শব্দ কইর্যে জলে পইড়্যে গেল। আর পরক্ষণেই মাছের জালের সঙ্গি বাঁধা থাকতিই সিটা ভেইস্যে চইললো পাশ খালের দিকে। কুমীর জাল-শুদ্ধু মাছ তার মুখে পুইর্যে নে ভেইসি চললো পাশ খালের দিকে। বিরাট কুমীর। কোন্ দুঃসাহসে যে সে এই এতটুকুন শিষখালে ঢুইক্যে পইড়েচেল তা কে জানে। সঙ্গে শড়কি বা বন্দুক থাকলি শিক্কা দেওয়া যেতো তারে।

কুমীরটা মাছ, জাল-এর খোঁটাটা পর্যন্ত নে যেতি এরফান আর হোসেন দুজনেই একসঙ্গি হেসি উটলো। তাদের হাসি শুনি কলিমুদ্দি মিঞা নৌকার পাটাতনে উটি দাঁড়ায়ে ওদের দিকে চেইয়ে শুদোলো, তোদের হলোটা কিরে?

ওরা চেঁচিয়ে বলল, কুমীর! কুমীর!

কলিমুদ্দি মিঞাও চেঁচিয়ে বলল, বাঘ! বাঘ!

ওরা বলল, বাঘ নয় কুমীর। সব মাছ নে গেল।

কলিমুদ্দি ধমকে বলল, বাঘ। বাঘ। এই এরফান, তোর ডাইনে,

পেচনে বাঘ। জলে ঝাঁপে পড়ি সাঁতরি আয় দুজনে। তাত্‌তাড়ি।

কলিমুদ্দির কতা শেষ হতি না হতি, এরফান আর হোসেন মুক ঘুরায়ে দেকতি-না-দেকতি জোয়ারের কাদা-জলে ভেজা লাল-কালো বাঘ উইড়ে এসি এরফানের বাঁ কাঁদে লাফিয়ে পইড়্যে তার কাঁদ আর ঘাড় কামড়ে ধইর‍্যে তাকে নে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিল।

হোসেন স্তব্ধ হয়ে দাঁইড়ে রইল। কলিমুদ্দি মিঞা জোরে হাঁক দিল, ডিঙ্গি খুইল্যে জলদি আসেন সারেং মিঞা। বন্দুক গাছ ধইর‍্যে আসেন। এরফান ছোঁড়ারে বাঘে নে গেল।

সারেং মিঞার শিষখালের মুকে পোঁছতি পোঁছতি পাঁচ-সাত মিনিট লাগলো। ডিঙ্গিটা দৌড়ে গিয়ে বাঁধল হোসেন একটি কেওড়ার ডালে। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা বের করি নেল সারেং মিঞা। চারটা টোটা ঠেইসে নিল লুঙির কশিতে।

কলিমুদ্দি মিঞা শড়কি নে এসি দাঁড়াল। বলল, ফিরে যেয়ে এরফান-এর মায়েরে কি বইলব চাচা? লাস পেলিও পেতি পারি। পেরান ত আর ফিরৎ হবেনি!

হোসেন বলল, আম্মো যাব চাচা।

ওর বাক্যি-রোদ হয়ে গেছিল। অচেনা মানুষ হলিও কথা চেল। ই-যে তার নতুন সাঙাত। ভারী হাসি-খুসি জ্যান্ত ছেলে। একটু আগে এরফানই তাকে বাঁইচ্যেচেল কুমীরের হাত থেকে। আর এরফান বাঘটাকে দেখতিও পেল না!

ওরা তিনজন এসি প্রথমে দাঁড়ালো, যে জায়গাটাতে বাঘে এরফানকে মাটিতে ফেইলেচেল সিখানে। সিখান থেকি বাঘের খোঁচ দেকি দেকি লাপ মেইর‍্যে মেইর‍্যে আগে আগে চইলতে লাগলো সারেং চাচা। লাপ মেইর‍্যে মেইর‍্যে যেতিচে বটে কিন্তু পায়ি এটটুও শব্দ হতিচে না। ঝোপ-ঝাড় কাঠ-কুটো বাঁইচ্যে বাঁইচ্যে এগুতিচেল সে। আর তার পেচন-পেচনে শড়কি বাইগ্যে ধরে কলিমুদ্দি মিঞা। আর তার পেচনে খালি হাতে, হোসেন।

এট্টু এগিয়ে যেতেই দেকা গেল এরফানের লাল-কালো লুঙি-খান ছিঁড়ে-খুঁড়ে কেওড়ার শুলোতে আইটকে আচে। রক্ত-মাখা। আরও এটটু পর, হ্যাঁতালের ঝোপের গায়ে সেই বগল-ছেঁড়া নীল শার্টকানা। বুক পকেটে পঁচিশ পয়সার একটি বলপেন গোঁজা। হলুদ-রঙা। যিকানে শার্টটা পইড়্যে আচে সিকানে অনেক রক্তও পইড়্যে আচে। নীল শার্টটা লাল রক্তে ভিজে বেগুনী দেকাচ্ছে। কাঁধের কাছে যিকানে বাঘ কামড় দেচিল সিখানে মস্ত ফুটো।

হোসেনের মনে পড়ি গেল এরফানের ইতিহাস। তার বাবাকে বাঘে নেচেল গোনা ব্লকে। তখন তার বয়স পাঁচ। বিধবা মা। দুই বোন। মানে, এক দিদি এক বোন। সংসারের ভার পড়ি গেল তখনই তার ঘাড়ে। দশ বছর বয়স থেকি তাই এই সোঁদরবনে আসছে এরফান। দিদির বিয়ে সে-ই দেচে। এ বছরেই ছোট বোনের শাদী দেবে। শাদীর কতা-বাতরাও সব পাকা। সেই থেকি আসতিচে। পনেরো বছর কেটে গেছে। প্রতিবারই কলিমুদ্দি মিঞার বহরের সঙ্গিই আসতিচে। এরফান বলেচেল, তার নিজেরও এক ছোট ছেলে, এক কন্যে। এত বছর নির্বিঘ্নে ফিরে গেচে। এবারেও তাকে নির্বিঘ্নেই ফিরতি হবে। "ছোট বুনটা কত আশা নিয়ে বইস্যে থাকবে আমারই মুখ চোয়। ফিরতিই হবে আমাকি। খুব ভাল দুল্‌হা পেইয়েচি। খেত-জমি, সাইকেল, ইক্কেরে বড়লোকের ঝিং-চ্যাক ব্যাটা। বুনটার কপালটা সত্যিই ভাল।"

মানুষ কি ভাবে আর খুদায় কী করেন! যা কিছু হয়, সবই তেনারই ইচ্চেতে।

এবারে বন্দুকটা শরীরের সামনে আড়াআড়ি ধরি লুঙিটি কষে বেঁধে এগুতিচে খুব সাবধানে সারেং মিঞা বাঘের খোঁচ দেইকি দেইকি। ওরা পেচন পেচন চইলল রুদ্ধশ্বাসে। বাঘের খোঁচ, সামনে যেয়েই একটি হ্যাঁতাল ঝোপের মদ্দি ঢুইক্যে গ্যাচে।

সারেং মিঞা উবু হয়ে বসি তার ফাঁক দে' দেখার চেষ্টা কইরল। সে উবু হইয়ে বসতিই ওরা দুজনেও উবু হইয়ে বইসল।

দেইকল, হঠাৎই যেন সারেং-এর শরীলটা শক্ত হইয়ে গেল। বন্দুকটা ঘুরায়ে নে সামনে কইরল। তখন হোসেনও দেখতি পেল যে ভয়ঙ্কর এক বাঘ বইসে আচে এরফানের রক্ত-মাখা উলঙ্গ শরীরের উপরে। বাঘের মুখ, দাঁড়ি-গোঁফ। সব রক্তে মাখা! বাঘের পেটটা এরফানের পেটের উপর। শুয়ে-থাকা এরফানের মাথাটা আর বাঘের মুখটা তাদেরই দিকে। বাঘটা যকন ছাইক্লোনের মতো এসি এরফানকে নে গেল, তকন তাকে ভাল কইর‍্যে দেকা পযযন্ত যায়নি। দেইকল একন। সি বাঘ দেইকি ত হোসেনের পেটের মদ্যে ব্যথা শুরু হইয়ে গেল। গলা শুকায়ে কাট। তুই পায়ে জোর লাই। ছেইড়ে-আসা মায়ের নাম করি গলা ছেইড়্যে কাঁদতি ইচ্চে করল কিন্তু গলা দে কোনো আওয়াজই বেরুতিচে না।

বাঘের শরীলও তাদের দেকা মাত্রই শক্ত হইয়ে গেচে। তার ল্যাজটা পেছনে ডাণ্ডার মত শক্ত হইয়ে উঠতিচি নামতিচি। হ্যাঁতালের ঝোপের মদ্দি হটাৎই সে হোসেনদের বুদ্ধ্যু বাইন্যে এক লাপে সইর‍্যে যেয়ে লুকোতি পারত। কিন্তু তা না করি, সি তুই ভাঁটার মতো স্থির চোকে চেয়ে রইল ওদের দিকে। সারেং মিঞা চোট করবে বলি বন্দুক তুলি ধইরেচে যকন ঠিক এমনি সময়েই কলিমুদ্দি মিঞার ডান পা কাদায় হড়কে গেল আর সে গিয়ে হুমড়ি খেইয়ে পড়ল ত পড় সারেং মিঞারই পিটে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের চোট হইয়ে গেল। কী হল বোঝার আগেই বাঘ এক লাপে অদৃশ্য হইয়ে গেল ডান দিকে।

আশ্চয্য!

বলল কলিমুদ্দি মিঞা।

সোঁদরবনের বাঘকে এমন করতি দেখি লাই আগে ককনো। সি শালা সোজা লাইপ্যে এইসে আমাদের উপরে পড়ে তিন থাপ্পড়ে তিনজনেরই ধড় থেকে মাথা আলগা কইর‍্যে দিত। কত শিকারীই ত দেকলাম। নাঃ, বাঘ নিশ্চয়ই “ফ্যাকটো” বুইজ্যে গেচে যে, এ যে সে শিকারি লয়; এ সারেং মিঞা। খুদাহ্‌র খিদমদ্‌গার।

চুপ কইর‍্যে থাকো মিঞা।

দাঁইড়ে উঠতে উঠতে সারেং ধমকে বলল কলিমুদ্দিকে, তার পরই গলা নাইব্যে ফিসফিস করল, আমার ঘাড়ে হুমড়ি খেইয়ে পড়বার আর টাইম পেইলে না? কী লোক হে তুমি মিঞা?

চোট কি হ'য়ইচে? লেগেচে বাঘের গায়ে?

সারেং মিঞার ধমকেব উত্তর না দিয়ে কলিমুদ্দি মিঞা শুদোলো।

নাঃ। গুলি অনেকই উপর দিয়ে চইলে গ্যাচে। একন তুমি ফিইব্যে যাও দেকি! শড়কিটা হোসেনরে দে, তুমি ডিঙ্গিতে ফিইর‍্যে যাও।

কলিমুদ্দি ভয় পেইয়ে গেল ভীষণ; বলল, ফেরার পথি খালি হাতে আমারে যদি বাঘে ধরে! অনেকটা এইস্যে গেছি ত! গভীর বন। সোঁদরবন। তাছাড়া এরফানকে গোর ত দিতি হবেক।

সে যকনকার কথা তখন ভাবা যাবেক।

সারেং বলল।

তারপর একটু ভেবি বইলল, তাইলে তুমি এই কেওড়া গাছে উট্যে পড়। উঁচু ডালে উট্যে ভাল জায়গা দেকি বসো যেইয়ে। এরফান-এর লাশ পাহারা দাও। বাঘ এখন আমার মোকাবিলা না কইর‍্যে এই লাশের কাছে আইসবে বলি আমার মনি হতিচে না। এ যে-সে বাঘ লয়। মনি আচে কি তোমার মিঞা সি বাঘের চেহারা, যে গোবিন্দকে নেচিল? ও তুমি তো ছিলেই না সি রাতে। তবে যারা দেইকেচিলো তাদের মুখে যা শুইনেছিলম তাতে মনি হতিচে যে, এ বাঘ, সি বাঘ।

আর শোনো মিঞা, বাঘ যদি ইকানে আসে তবে আমার নাম ধইর‍্যে জোরে হাঁক দিবে। যাতে আমি বুইজতে পাই।

বলেই বললো, যাও. শিগগির ওটো গাছে। আর দেরী কোরোনি।

কলিমুদ্দি গাছে উট্যে গেলে সারেং মিঞা বলল, চল্ হোসেন, আমরা এগুই।

হোসেনের হাত-পা থরথর করি কাঁপতেচেলো। হাত থেকে শড়কি পইড়্যে যায়-যায়। সারেং মিঞা ওকে দেকি বাঁ হাত দিয়ে ফটাস্ করি এক চড় বইস্যে দিল হোসেনের ডান গালে।

হোসেন প্রায় চিৎকার করি কেঁইদে উইটভেচেল।

সারেং মিঞা বলল, ডরপোক্। বেহুদা! তুই না আদম্। তুই না খুদাহ্‌র হাতের তৈরী সবসে বড়িয়া জান। তুই না ইনসান! একটা জানোয়ার, যার খুদাহ্ বলে ডাইকবার কেউ নাই, যে খাওয়া আর ঘুমোনো আর বছরে একবার জোড় লাগা ছাড়া আর কিছু জানে না, তুই আদম্ হয়ি তারে ভয় পাবি? বলেই, মাইরলো আরেক থাপ্পড়।

হোসেন বুক শক্ত করি এগোল সারেং মিঞার পেচুপেচু।

একটা জোয়ারি পাখি শিষ-খাল-এর অন্য পার থেকি ডেইকি উটল হঠাৎ, পুত্-পুত্-পুত্-পুত্-পুত্।

তারপরই বাঁদর ডাকতি লাগল পশ্চিমদিকের সুন্দরী আর সাদাবানী গাছেদের জঙ্গল থেকি। আসলে, তারা ছেল কেওড়া গাচের ওপরে। কিন্তু সে গাছগুলোর সামনে বড় বড় সুন্দরী থাকাতে ভাল ঠাহর হচ্চিল না।

সারেং মিঞা এক মুহূর্ত দাঁইড়ে পড়্যে সে দিকে চেয়ি কী ভাবল এটটু। তারপর উত্তর দিকে এগিয়ে গেল কিচুটা। বাঘের খোঁচ এর হদিস না কইরেই।

ব্যাপারটা বুজল না হোসেন। বাঘকে কজা করতি হলি ত বাঘের খোঁচ দেইকেই এগুতি হবে! তা না, বাঘের খোঁচ ছেড়ি উত্তর দিকে হাঁটা দিল কেন চাচা।

বড় ভয় করতি লাগল হোসেনের। যদিও তখনও ডান গালটো জ্বইলতেছেল চড়ের দাপটে।

এরফান তাকে শিখিয়ে দেচিলো একটা মন্ত্র কাল রাতেই। সেই মন্ত্রটা মনে মনে আওড়াবে একবার ঠিক করল।

সারেং মিঞা একটা মস্ত কেওড়ার কাণ্ডে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়ে বলল, ভাল করি আমার পেছনে নজর চালা। আমি একটা বিড়ি খেয়ে নিই।

হোসেনের রাগ হইয়ে গেল। নগ্ন, রক্তাক্ত, অর্ধভুক্ত এরফান-এর শব পড়ে হ্যাঁতাল ঝোপের নীচে, আর সারেং মিঞার এখন বিড়ি খাবার

সময় হলো !

জম্পেস করে বিড়িটা ধইর‍্যে নিজের ফতুয়ার পকিটে দিশলাইটো রেইক্যে দে সারেং বলল, তাড়াহুড়ো করলি সুন্দরবনের বাঘের পেটেই যেতি হবে। আজ যখন বন্দুক হাতে নে বহু বছর বাদে এই মাল-এ উইটে এসিচি তকন হয় বাঘ মইরবে, নয় আমি ! আধা-খ্যাঁচড়া কাজ করা আমার পচন্দ লয়।

বলে, বিড়িতে সুখটান দিইতে লাগল।

বিড়িটা খাওয়া হইয়ে গেলি, এবার আবার পুব-মুখো এগুতি লাগল সারেং মিঞা। হোসেনের মনি হল, এ যাত্রা তার বাঁচার আর কোনোই সম্ভাবনাই লাই। সারেং মিঞার হাবভাব পুরোপুরি মাতালের মতো। বাঘ কোনদিকে গেল, তাব খোঁচ কোতা পইড়ল সেদিকে খ্যাল নাই, নিজের খ্যালে সে পশ্চিম, উত্তর, পুব যে দিকে খুশি পা চালাতিচে।

এবারে হোসেন, এরফানেরই কাছ ঠেঙ্গে শেখা সেই মন্ত্রটি মনি মনি বইলতে লাগল—

"বনদেবী মা ! তুমার ভরসায় এইলাম মাগো,
যেন বাঘে ছোঁয় না, জঙ্গল দেবী মা।
তুমার কোইল্যে এইলাম মাগো,
যেন ঝালে কাটে না।"

এই মন্ত্র কার কাচ থেকি এরফান শিকেচেল তা ও জানে না। এ মন্ত্রে কাজই যদি হবে তবে এরফান নিজেই বাঘের পেটি যাবে কেন ? তবু, শড়কি ধরি হোসেন মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে আর সারেং মিঞার পেচন পেচন চইলতে থাকে। একটু পরই সারেং খোঁচ খুঁজে পেল। বড় বড় পা ফেইলি বাঘ হেঁইটে গেচে। সারেং মিঞা বাঘেরই মতো বাঘের খোঁচ দেকি দেকি এঁইকে-বেঁইকে নানা গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায়, ঝোপ-ঝাড়ের এ-পাশ ও-পাশ দে সাবধানে চইলতে লাগল। এই বনের ভেতরটা ভারী পরিষ্কার। জোয়ারের জল বেশির ভাগ জায়গাতেই পৌঁচয় বলি মনি হয়। ঢেউ যেন সবে ঝাঁট দে´ পরিষ্কার

কইরে রেক্কে গেচে। ছবির মতো চারধার।

হঠাৎ নাকে পেচণ্ড দুর্গন্ধ এলো হোসেনের। নিশ্চয় বাঘের গায়ের গন্ধ। থম্‌কি দাঁড়াল ও। কিন্তু সারেং মিঞার নাক কি বন্ধ? চাচার নাকে কি সে গন্ধ পৌঁচয়নি? হোসেন দু কদম এইগ্যে যেয়ে চাচার পিঠে বাঁ হাতের আঙুল ছোঁয়াল।

চাচা চম্‌কি উইট্যে পেছনে তাকাতেই, নিজের নাকে হাত দে তাকে বোজাল গন্ধর কতা, হোসেন।

সারেং মিঞা বিরক্তির চোকে সামনের একটি বড় গাচের দিকে আঙুল তুলি দেকালো। হোসেন অবাক হয়ি দেকলো, গাচটাতে বোধহয় কয়েক শ বাদুড় মাথা-নীচে পা-উপরে কইর‍্যে ঝুইল্যে আচে। বাদুড়েরই দুর্গন্ধকে বাঘের গায়ের গন্ধ ভেইবেচেল ও। ওদের নিজেদের গেরামে বাদুড় যে লাই তা লয়, তবে একসঙ্গি এত বাদুড়! ভাবা পযযন্ত যায় না। লজ্জা পেইয়ে গেলো হোসেন।

চলেচে ত চলেচেই! বনের মদ্দি খোঁচ দেইক্যে দেইক্যে যেতি যেতি দুপুর হইয়ে গেল। মাতার উপরে সূর্য। গাছপালার ঠিক নাচে নীচে ছায়া। ছায়ারা তকন সবচে ছোট। এতবড় বন কিন্তু সি তুলনায় পাকি নেই বললিই চলে। দিন-দুকুরেই শ্মশানের মত নিজ্জন। নদী বা খাল কাছে থাকলি কেবল তারই শব্দ পাওয়া যায়। এই দুককুর বেলা মনে হতিচে চারদিকই একরকম। কেওড়া, গরাণ, গেঁয়ো, হ্যাঁতাল, মাঝে মদ্দি টক-সুন্দরী, পশুর। সামনে বা পাশে তাকালি মনি হয় এই মাত্র যেখান দে পেইর‍্যে এল, সি-জায়গাই ফকীর-পীরের মন্ত্রবলে এইগ্যে এসিচে। দু' পাশে তাকালিও তাই মনি হয়।

হটাৎ সামনে দেকল ভারী সুন্দর একদল হরিণ। দলে প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি ছিল। হঠাৎ নাক-উঁচিয়ে হোসেনদের গন্ধ পাওয়ামাত্র কী জোরে যে ছুট্টে গেল তারা তা বলবার লয়। মন বইলল, যেন মায়াহরিণী।

সারেং মিঞা বইলতেচেল, সমুদ্রর কাচে একটি দ্বীপ আচে তার নাম মায়া-দ্বীপ। কে জানে! ককনো নে যাবে কিনা চাচা সিখানে।

আরও কত বড় নদী, দ্বীপ। ভাঙ্গাতুনি দ্বীপ, ড্যালহাউসি দ্বীপ, বুলচেরী দ্বীপ। কত যে নদী! রায়মঙ্গল, হেড়োভাঙ্গা, গোসাবা, ভাঙ্গাতুনী, মাতলা, ঠাকুরানী। কিন্তু আজকে বাঘের হাত থেকি যদি বাঁচে তবেই না সিসব দেকা হবে! এ জন্মে কি আর হবে? কে জানে! বারেবারেই শুধু এরফান-এর ফর্সা, ল্যাংটো, সুন্দর কিন্তু রক্তমাখা শরীরটার ছবি চোখের উপরি ভেসি উটচেল।

এদিকে খোঁচ দেইকে দেইকে যেতি যেতি সারেং চাচা একটা খাল এর মুখে এইসি দাঁড়াল।

হোসেন ফিস্‌ফিস্ করে শুদোলো, বাঘে কি জল খেইয়েচ ইকানে?

সারেং বলল, বড়মিঞায় খাল পেইরে ও-পারের জঙ্গলে চলি গেচে।

কথাটি বইলেই, কী মনে কইর্যে সারেং খালের এ পারেই কিচুটা চলল ডানদিকে। পারে পারে। এই খালটা গিয়ে এই দ্বীপেরই অন্য প্রান্তে পইড়েচে। ডানদিকে শেষ অবদি গিয়ে আবার খোঁচ যিখানে, সিখানে ফিইর্যে এল।

একটু ভাবল, কী যেন।

খালটা তিরিশ হাত মত চওড়া হবে। সারেং বললো, চল, খাল পেরোতি হবে। লুঙি-গেঞ্জী খুইল্যে ফ্যাল। সারেং নিজেও লুঙি খোলার উপক্রম করতেচেল এমন সময়ে কী ভেইবো খালের বাঁ পাশে চলতি লাগল খাল পার ধরি। জোয়ার শেষ হইয়ে গে তখন ভাঁটি দিতি আরম্ভ কইরেচে। ভাঁটাও শেষ হইয়ে গে জোয়ার সুরু হবে দু এক ঘণ্টার মদ্দি।

চইলতে চইলতে হঠাৎ সারেং মিঞা দাঁইড়ে পড়ি বলল, ছাক হোসেন, কত বড় ধূর্ত বাঘ।

বইলতে বইলতেই ঘুইরে দাঁড়াল পারের দিকে। বাঘটা সারেং মিঞাকে বোকা বানানোর জইন্যে ডানদিকে নেমি খাল পার হায় যেয়ে আবার বাঁদিকে যেয়ে খাল পার হইয়ে এই জঙ্গলে এসি ঢুকেচে।

সারেং মিঞা বলল, চল্ চল্। খোঁচ দেইকি দেইকি এগুতেই

দেখা গেল, বাঘ পশ্চিমে ঘুরে যে শিষখালে এরফানকে ধইরেছেল সেই শিষখালেরই দিকে গেচে।

সারেং মিঞার কপালে চিন্তার রেকা দেকা দিল। নিজের মনিই বলল, কলিমুদ্দি মিঞা আমাদের দেরী দেইকি গাছ থেকি নেমি যদি হাঁটাও দে থাকে তবে ডিঙ্গিটা নদীর মাজকানে রেইক্যে থাকলি হয়।

হোসেন ভাবল, রাখলিই বা কি? শুধু বৈঠা দিয়ে বাঘের সঙ্গে কী লড়াই করবে। বন্দুক থাকলি অন্য কথা চেল। সোঁদরবনের বাঘ যদি মনস্থ করে কাউকে নেবে তবে তার পক্ষে বাঁচা ইকেবারেই অসম্ভব। যতই বাপ-মা, বনবিবি, বড়খাঁ গাজীর নাম কইর্যে সি কেইন্দে ভাসাক না কেন! তার উপর সি একা যদি থাকে তবে ত সোনায় সোহাগা। নিশ্চিত নখ-দাঁতের মৃত্যু যখন সামনে আসে তকন দৌড়ে পাইল্যে, নৌকো মাজ-নদীতে রেকে, বৈঠা দিয়ে আপ্রাণ বাড়ি মেরে, নৌকো জলে পইড়্যে কুমীর-কামট-এর ভয় অগ্রাহ্যি করে আপ্রাণ সাঁতরিয়ে গেলিও যমের হাত থেকি রক্ষা লাই। মানুষ যে কত অসহায় এই সোঁদরবনে তা ইকানে না এলি, না থাকলি, কারো পক্ষেই বোজা সম্ভব লয়।

সোঁদরবনে যদি কেউ দৌড়য় তবে বাঘ তাকে ধইরবেই ধইরবে। তার বাঁচন লাই। তাই সারেং মিঞা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোঁচ দেইকি চলতে লাগল। তবে সুবিধে এইটুকুই যে, এই বনের মাটিতে টাটকা খোঁচ খুঁইজে পেতি কোনোই মুশকিল লাই। তেমন আবার জোয়ারে সব চিহ্ন ধুইয়ে নে যায়। জোয়ার এসি গেইলেই সি স্লেট ইকেবারে সাফ সুফ।

সারেং মিঞা তাড়াতাড়ি চললিও ডাইনে-বাঁয়ে সমানে নজর রাকতেচেলো। বাঘ বলি কতা! সোজা গেচে বলিই যে সোজাই গেচে তার পেত্যয় কি? যকন-তখন দিক পরিবর্তন কইর্যে পাশ থেকি আক্রমণ করতি পারে।

যে-খাল পেহর্যে গিয়ে বাঘ আবার ফিরে এচিলো সেই খাল পাড়ে পৌঁচবার আগে অনেকই ঘুরে ঘুরে এবং খুবই আস্তে আস্তে বাঘকে

অনুসরণ করা হইয়েচেল। কিন্তু খালপার থেকি বাঘ প্রায় কোনাকুনি সোজা শিষখাল-এর দিকে এইগেচে বলি একন তার পেচু-করতি সময় বেশি লাগলোনি। যখন হোসেনরা শিষখালের কাচে প্রায় পৌচে গেচে ঠিক তকন গতি ইকেবারে কইম্যে দেল সারেং মিঞা। বন্দুক ইকেবারে তৈরী কইর‍্যে নে চললো। হোসেনকে ইসারায় শড়কি তৈরী রাখতি বললো।

যিকানে কলিমুদ্দিকে ওরা গাছে চইড়ে দে গেচিল সিকানে যেয়ি দেকলো, মিঞা লাই। মিঞা যে লাফ দে' নেমে শিষ-খালের দিকে যেছে তার চিহ্নও পরিষ্কার রইয়েচে কাদাতে।

ঠিক এমন সময়ি হটাৎ একটা আওয়াজ এলো শিষখাল থেকি। মনি হলো, কে যেন বৈঠা দিয়ে নৌকোর খোলে জোরে মাইরলো।

সারেং মিঞা কী বুজলো কি জানে? হোসেন কিছুই বুইজলো না। সারেং মিঞা খালের পানে দৌড় লাগালো সুন্দরবনের সব নিয়ম কাদায় ছুঁইড়্যে দে। চাচার পাচু পাচু খালপারে পোঁচে ছ্যাকে যে কলিমুদ্দি মিঞা তার ডিঙ্গির মদ্দি আধ-শোয়া হইয়ে বইস্যে আচে। চোকের দৃষ্টি ফেলা। মুকে বাক্যি লাই। যেন বোবা হইয়া গিচে।

কলিমুদ্দি! ও মিঞা! বাঘ কোন্ পানে গেল?

কলিমুদ্দি প্রথমে শুনতেই পেল না।

হোসেন ডাকলো, চাচা, এরফান কই?

এরফান-এর কথাতে যেন কলিমুদ্দির সম্বিৎ ফিরে এইলো। আঙুল দে দেকালো শিষখালের ঐ পার।

হোসেন চেইয়ে দেইকলো জল হাঁচোড়-পাঁচোড় কইর‍্যে ঐ পারে বাঘ সম্ভবত এরফানকে মুকে ধরি বনে উট্যে গেচে। এই সবে গেচে। হয়ত সারেং মিঞাদের আসার শব্দ শুইন্যেই তার খাবার মুকে ধরি ঐ পারে যাওয়া মনস্ত কইরেচে।

ডিঙ্গি নে এইসো মিঞা। ডিঙ্গি নে এইসো।

সারেং মিঞা বইললো।

কলিমুদ্দি মিঞা ঘোর ভেঙ্গে, দু হাতে পৈটা বেইয়ে ডিঙ্গি ভেড়াল

পারে। তারপর খপাখপ্ করি পৈটা ফেইলি ও-পারে পৌঁচে দেল ওদের। তারপর বললো, আমারে একা রেইক্যে যেওনি সারেং সায়েব। বাঘটা খাল পার হবার আগে এরফানকে নাইম্যে রেকে, আমার দিকে আইসবার জন্যি জলে নেইমে এসিচেল। কী ভেবি, মন পরিবর্তন কইর‍্যে আবার এরফানকে মুখে তুইল্যে নে খাল পেইর‍্যে গেল।

কতা কোয়োনা কোনো।

বিরক্ত মুখে সারেং মিঞা বললো।

এরফানকে ধইরেচে সেই সকাল বেলা। ঘড়ি তো নেই ইকানে কারোই, এক সারেং চাচার ছাড়া। তখন রোদের বেলা সাতটা-আটটা হবে। আর একন কম কইরে বেলা তিনটে বাইজতেচে। অথচ খিদে তিষ্টা বলতি কিচু লাই। কী কইর‍্যে যে এতগুলোন ঘণ্টা পেইর‍্যে গেল তা বুইজতে পর্যন্ত পারলোনি ওরা।

সারেং মিঞা হোসেন আর কলিমুদ্দি দুজনকেই এ পাশের এক মস্ত কেওড়া গাছে উটতে বললো, ইসারাতে। হোসেন আপত্তি কইরেচেল। সারেং মাথা নাড়লো দু দিকে। শড়কি-খান গাছের গায়ি হেলান দে রেইক্যে উটে পইড়লো গাছে। হোসেন অনেক উপরে উটে একটা খোঁড়ল পেল। তার মদ্দি বইসতে যাবে অমনি ফস্‌স্ শব্দ করি ফণা ধইরলো কাল কেউটে। কিচুই করার লাই। স্টেচু হইয়্যে গেল হোসেন। সাপটা পাখির ডিম খাবার জন্যি খোঁড়লে ঢুইকেচেল। যাই হোক বরাত ভাল যে, সে অন্যদিক দিয়ে সড়সড়িয়ে নেমি গেল এবং না কিছু বলল কলিমুদ্দিকে, না সারেং মিঞাকে।

হোসেনরা ঠিকমতো গাছে উইটেচে দেইক্যে নে সারেং মিঞা বাঘের খোঁচ দেকি এগুল।

খোঁড়লে বসা হলো না হোসেনের। তার পাশে একটা দোডালা দেইকে নে বসলো। সাবধানে, আস্তে, খুউব আস্তে ; মাতা এপাশ থেকে ওপাশ ঘোরাতি নাগলো হোসেন। এতোক্কন সারেং মিঞাকে দেইক্যে শিখে নেচে সে।

ঘাড়টা ঘুরোনো পুরোটা হয়নি ঠিক সেই সময়ে তার পায়ের তলায়

কি যেন কামড়াল। চেয়ে দেকে, কলিমুদ্দি মিঞা চিমটি কাইটতিচে। হোসেন নিচোয় চাইলেই আঙুল দে' মগরীব-এর দিকে দেকালো মিঞা। চেয়ে দেকে সব্বোনাশ। বাঘটো যেখানে বসি এরফানকে খেতিচে, সিটা উঁচু ট্যাকমতো জায়গা, (কেউ বলে ট্যাক, কেউ বলে মাল) ঠিক সেদিক পানেই চলতিচে সারেং মিঞা। বাঘ একনো তাকে দেইকতি পায়নি, শুনতেও পায়নি, বোদয় খুবই খিদে নেইগে থাকবে তার কিন্তু কতাটা হতিচে, সারেং মিঞা কি বাঘকে দেইকেচে ?

হঠাৎ বাঘ ঘুইর্যে দাঁড়াল। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। বৈশাখের বিকেলের রোদ এইসে পইড়েচে পুরো ট্যাকটাতে। আলো আর ছায়াতে পুরো ট্যাকটোকেই মনে হতিচে একটো ডোরাকাটা বাঘ। কালো কাদা আচে ট্যাকের নীচে, যেখান অবধি জোয়ারের জল পৌঁচয়, সেই কালো জায়গাগুলোনকে মনে হতিচে বড় বাঘের গায়ের কাদার দাগ।

বাঘটা ঘুইর্যে দাঁইড়ে জোরে একবার হুংকারও দিল। সে যে কী ডাক কী বইলবে হোসেন। দু বর্গমাইল এলাকায় যত পাকি চেল, এত পাকি যে চেল তা বোঝা পয্যন্ত যায়নি আদৌ; সব একসঙ্গি ডেইক্যি উটলো। হরিণ ডাকলো টাঁউ টাঁউ কইর্যে। বাঁদর চেল উল্টোপাশের জঙ্গলে, খাল পারি। তারাও সব একসঙ্গি কিচিরমিচির কইর্যে উইটলো। ডাক শুইন্যে হোসেনের হাত পা ছেইড়্যে যাওয়ার যোগাড় হচ্চিল। হয়তো সত্যি-সত্যিই পইড়েই যেত গাছ থেকি। যদি না কলিমুদ্দি মিঞা তার পায়ের পাতা চিমটে কেটে ধইর্যে না থাকত।

বাঘের হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে অত দূর থেকিও সারেং মিঞার হুংকারও ভেইস্যে এল। চোপ শালা! আমি বড়খাঁ গাজী। বনবিবির বেটা আমি। আমি তোর যম। বড় খাঁই তোর! নে, শালা খা!

বইলেই, বাঘের দিকে আরো দু'পা এইগ্যে যেয়ে বন্দুক সোজা কইর্যে ধরে দিল চোট কইর্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বড়খাঁ গাজীর

থাপ্পড় খেইয়েই অতবড় বাঘটা মুখ হাঁ করে ভুঁয়ে পইড়ে গেল। তাপ্পর ইক্কেরে কাট। নড়ে না, চড়ে না! যেন কতকালের মড়া!

সারেং মিঞা একটা শুকনো মাটির ঢেলা তুইল্যে নে ছুঁইড়্যে দেল বাঘের দিকে। বাঘ তবুও নট নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু।

সেই না দেকি কলিমুদ্দি আর হোসেন ত পড়ি কী মড়ি কইর‍্যে কেওড়ার ডাল থেইকি নেইমে নিজেদের জান বিপন্ন কইর‍্যে, গুলো বাঁচায়ে, কাঁকড়া বাঁচায়ে, সাপ-খোপ বাঁচায়ে উইড়ে পৌঁচে গেল অকুস্থলে। গিয়ে, সারেং মিঞাকে জড়িয়ে ধরলো তুজনেই। আনন্দে লাপাতে লাগলো।

সারেং বইলল, ছাড় ছাড়।

তবু ওরা ছাড়ে না।

তখন সারেং ওদের ধমক দে বললো, বাঘটা মরেচে কিনা ভাল করে দেখতি দে। অনেক সময়ে মট্‌কা মেইর‍্যে থাকে। কেঁদো ত থাকেই।

হোসেন হাসতে হাসতেই বলল, বলো কি চাচা? মট্‌কা মেইর‍্যে থাকে?

তাইলে আর বইলতেছি কি? আরো ঢেলা দে মার।

বলেই নিজে বন্দুক ঘুরিয়ে আবার ঐ দিকে মুখ কইরে দাঁড়াল।

হোসেন বলল, অত সন্দেহে কী দরকার! দাও না ঠুইক্যে আরেক-খানা চোট।

কলিমুদ্দিও বলল, হ্যাঁ। তাই ভাল। সব সন্দেহের নিরসন হইয়ে যাক।

সারেং বলল, এক একটি চোট, এক একটি বাঘ। এসব রেঞ্জার সায়েবের গুলি। তাই ত এমন মার! তাছাড়া মাছ খেতি খেতি অথবা না খেতি পেইয়ে মুখে যখন চড়া পইড়বে তোদের, তখন হরিণও খেতি পারবি একটা তুটো।

সি ভাল। সি কতা খুবই ভাল। আমি জীবনে হরিণ খাইনি চাচা।

সারেং বলল, জীবনে ত অনেক কিছুই করোনি বাজান। অনেক

কিচুই করতে হবেক এখনও। কিন্তুক এরফানটা যে পইড়্যে রইল ঐ কুলতলিতে তার জন্যে তোদের কুনো দুঃক লাই ? তোরা বাঘ মারার আনন্দে আটখান হইয়ে লাপাতি'চস !

ই কতাটা বলার সঙ্গি সঙ্গিই এক গভীর নিস্তব্ধতা নেইম্যে এল সিকানে। মৃত বাঘ, মৃত এরফান আর মানুষের মৃত-বিবেক পাশাপাশি শুয়ি রইলো সেই ফুলতলির কাদার উপরে।

কিছুক্ষণ মাতা নীচু করি রইলো ওরা তিনজনেই।

সারেং বললো, আজ বাঘ ইকানেই পড়ি থাক। কাল ভোব ভোর আসি নে গেইল্যেই হবে সকলি মিল্যে।

শুকুন পইড়্যে যাবে না ?

না। উপর থিকে কি যাচ্ছে দেকা বাঘকে ?

আমরা ত গাছে বসি দেকতে পেইচিলাম।

তোরা পাশ থেকে দেইকেচিস। শুকুন ওড়ে সোজা উপরে। তা ছাড়া সুন্দরবনে শুকুন নাইই বলতি গেলি। আবাদ যিখানি হয়, সিখানি আচে অনেক। ইদিকে খুবই কম।

ইটা কি সেই বাঘ যে গোবিন্দকে নেচিল ?

মনি ত হয়। যারা একে আগেও দেইকেচে তাদের দেকালিই তারা চিনতে পাইরবে।

তাপপর ওরা এরফানের রক্তাক্ত মৃতদেহ তিনজনে বয়ে নিয়ে চললো শিষখালের দিকে। বিকেল হইয়্যে গেছে। ওদের বহরের অন্য নৌকোরা সব এ পথিই ফিরবে। সারেং আর কলিমুদ্দির শূন্য নৌকো দেইক্যে ওরা এমনিতেই থেইম্যে পড়ি তত্ত্বতালাশ কইরবে।

ছায়ারা দীর্ঘ হলো। বনের মদ্দ্যি কেমন একটা ছমছমে ভাব। এখন সূর্য পশ্চিমে ঘুরেছে। অন্য পারে একটি জায়গাতে কেবলই কেওড়ার গাছ। জোয়ার পেরায় পুরো হয় হয়। জল ভেইঙ্গে ভেইঙ্গে আন্দাজি যেতি হচ্চে ওদের। ওদের সঙ্গীরা কেউ পৌঁছে না এসি থাকলি সাঁতরে যেতি হবেক এরফানকে সঙ্গে নে।

কলিমুদ্দি বইললো, এক কাজ করি সারেং সাহেব। তোমরা

ইকানেই থাকো। আমি গিয়ে দেকি, কেউ এলো কী না।

এলে কি হবে ?

এলে ওদের বলবো ডিঙ্গি নে যতখানি পারে এইগ্যে এসি আমাদের নে যাবে। জোয়ারের জলে জলে যতখানি ভেতরে আসা যায়, আসতি ক্ষেতি কি ?

তাপপর ?

তাপপর মানে ?

এরফানকে কি নদীতেই গোর দেওয়া হবেক ? না হলে ? সিটা স্থির করো। আর মাটিতে দেতি হলে ত পরের ভঁাটা অবদি অপেক্কা করতি হবে। নইলে এখুনি দেতি হয় ঐ ট্যাকে, যিখানি জোয়ারের জল পৌচয় না। কিন্তু সিখানি মাটি ত অত নরম লয়। কবর খুঁইড়বে কি দে ? গর'মর দিন। লাশ পইচে যাবে যে !

কলিমুদ্দি বলল, অনেক সময়ে আমরা ত জলেই গোর দি। জলের বিবি বাবারাও খুসি হন তাতে, কামট-কুমীরেরও পেট ভরে। এই লাশ নে-যাওয়াও যায় না গেরামে। তাইলে তা নিয়ে আর কীই বা করা যায়। অদিকাংশ সময়ে ত লাশ কেন, লাশের কোনো অংশই পাওয়া যায় না। বাঘের মুখ থোক কে আনবে ছিনিয়ে তা নিজের জান কবুল করে ?

সারেং মিঞা বইলল, তোমরা গাচে ওঠো। আমি দেইকে আসতিচি।

আবার গাচে কেন ? বাঘ ত মুখ হাঁ করে বড়খাঁ গাজীর নাম করতিচে। মালা নে ছিনিমিনি খেলতিচে।

বাঘ কি এই জঙ্গলে ঐ একটোই ? কোন গ্যারান্টি আচে যে আরও বাঘ নাই, বা গুলির শব্দে খাল পার হইয়ে এপাশ-ওপাশের ব্লক থেকি চইলে আইসবে না। আসি এরফানকে তুইল্যে নে যাতি পারে। তুমাদেরকে লিবার চিষ্টাও কইরতে পারে। যা বলি, তাই কর। উইট্যে পড গাছে।

সারেং চলে গেল। সটান, ঋজু চেহারা তার, দাড়িটা যেন

আসমানের সঙ্গি কতা কয়। চোখ দুটা জ্বলজ্বল করে, অথচ বাঘের মতো লয় সেই জ্বলজ্বলানি। মনি হয়, এক জোড়া সইন্ধ্যেতারা। ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ। কিন্তুক সাপের চোখের মতো ঠাণ্ডা লয়। ই চোখ শান্তি দেয়, ভয় দেকায় না।

সারেং মিঞা জঙ্গলের মদ্দি অদৃশ্য হতি-না-হতি কোতা থেকি যেন একটি মস্ত শিঙ্গাল হরিণ দৌড়তি দৌড়তি এইস্যে ট্যাকের উপরে দাঁইড়ে পড়ল। তারপর ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পশ্চিমের বিদায়ী সূর্য এসি তার গায়ে পড়েচে। হলুদের উপর কালো বুটিগুলো ঝলমল কইরচে। যেন বসরাই গালচে কোনো, কোনো আলিজার মনপসন্দ কারিগর বহু যত্ন করি বহুদিন ধইরে বানিয়েচে। ফরমাস পেয়ে। তার চারধারে কেওড়ার শুলো। শুলোগুলোর ছায়ারাও এখন লম্বা হয়ে শুইয়ে পড়িচে। চারধারে ছায়া-আলো, আলো-ছায়া, সাদা-কালো, কালো-সাদা। তার মদ্দিখানে সেই শিঙ্গাল দাঁইড়্যে আছে, মাতার উপরে শিঙের ডালপালা ছইড়্যে দে। হোসেনের মনি হল, বাঘেরই মতো এও খুদাহ্‌র আরেক কেরামতি। আরেক কুদরতি। ভাবতে ভাবতেই নীলমণি সারেং-এর খাদ্য-খাদকের কতা মনে পইড়্যে গেল।

পরক্ষণেই মনে পইড়ল এরফানের কতাও। শুয়ে আচে এরফান। বিধবা মায়ের একমাত্র পুইত্র। সংসারের রুজির মালিক। তার ছোট বুন তার ফেরার পথ চেয়ি বইস্যে আচে। কত স্বপ্ন তার। তার মিঞার ক্ষেত, জমি, সাইকেল, দু'বেলা ভরপেট খেতি পাওয়ার নিশ্চিন্তির স্বপ্ন। সে কী যে-সি স্বপ্ন! এই সুন্দরবনে না এলি সে কিছুতেই এই সব দুঃখকষ্টের কথা জানতিও পেত না। অন্যের দুঃকের কথা জানলি পর নিজের দুঃকটা যে দুঃখ লয়, যাকে নিজের দুঃক বলি জানে তাই যে অন্যর চোকে কতবড় সুক. ই-কথা ভোরের আলোর মতো পোষ্কার হইয়ে যায়। কোনো সন্দ-ধন্দ থাকে না আর মনি। সারেং মিঞা ঠিকই বলে। মানুষ তার সব দুঃক নিজেই যেচি-সেধি আনে। নিজের পেয়োজন কমায়ে ফেলার মত সুক আর কিচুই লাই। যার

বেশি কিছুর পেয়োজন লাই তার দুঃখও লাই। যার লোভ লাই তারও দুঃখ লাই। এরফানরা যেভাবে বেঁচে থাইকে তাপপরও যদি সবসময় হাসতি পারে, রসিকতা কইরতে পারে তবে আরও সুখের পেয়োজন-টাই বা কি ?

কিন্তু এই অল্প সুখের জীবনও বড়খাঁ গাজী ছিনিয়ে নিলেন!

একটু পরই মানুষের গলা শোনা গেল। কলিমুদ্দীর বহর ফিইরচে। উত্তেজিত গলাতে কথাবার্তা বইলচে ওরা। বহুদূর থেইকিও চেনা মানুষের গলা চিনতি পাত্তিচে কলিমুদ্দী। এটা সুলেমান, ইটা যতীন, ই শালা হারুণ, পাঁচটো শব্দর মদ্দি তিনটে করি শালা না বললি ওর ভাত হজম হয় না। ঐ ছ্যাকো নাসিরুদ্দিনের গলা, পেট-পাতলা লোক। পেইটে যে কতা রাইকতে পারে না তাই লয়, রোজ আবার পাতলা হাগে।

হোসেন ভাবতেচেল, এই যে হটাৎ-খুশি কলিমুদ্দি মিঞা এর পেচনে গভীর দুঃকুও আচে। দুঃকুটা হল গিয়ে এই যে, সি এরফান-এর মৃত্যুটা মেইনে নিতে পারতিচে না। আবার সুখও আচে। সুখটা এই যে, বাঘের হাতে তার নিজের পরানডা যায় নি। আসলে সব মানুষেরই সুক-দুঃকু নিজের স্বার্থ জইড়েই আচে। তার বেতিক্করম্ হতি পারাটাই "মনুষ্যত্ব"। সারেং মিঞা বলে। সিটা যে ঠিক কী তা আইস্তা আইস্তা বুঝতে পারতিচে হোসেন। তবে বুইঝতি আরও ঢের ঢের সময় লাইগবে।

আজ সারাদিনে নামাজ পড়া হলোনি। সেই ফজিরে নামাজ পইড়েছিল। একনো আলো আচে। গাছ থে নেইমি মগরীব-এর নামাজটা কি পইড়ে নেব ?

যদি বাঘ আসে ? যদি মড়া-বাঘ হঠাৎ জেগে উইট্যে পড়ে ?

থাক তাহলি।

হোসেন রোজ নামাজ পড়ে না। মাঝে মাঝে পড়ে কিন্তু তার মত বিশ্বাসী মানুষ খুব কমই আচে। ও জানে যে, কমই আচে। না হলি এতো মনুষ্যি থাকতি সারেং মিঞার মত ফকীর-পীরেরও বাড়া

মনুষ্যি তাকে সাঙাত বানাতনি। খুদাহ্‌র উপর বিশ্বাস যদি পুরোই থাকবে কলিমুদ্দি মিঞার, তবে বাঘের ভয়ে নামাজ পড়া বন্ধ থাকবে কেন? সারেং মিঞা প্রায়ই বলে, বিশ্বাস এমনই এক চিজ; পেয়ারেরই মত, তাতে ঝুটা মিললে তার কিম্মৎ থাকে না এককণাও। হিন্দুরা একটা কথা বলে, "এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা।" অনেকটা সেই রকম।

আইস্তা আইস্তা হোসেন এই বাঘের আর বড়খাঁ গাজীর জগতেরই মতো বিশ্বাসের জগতেও পরবেশ করতিচে সারেং মিঞার হাত ধইর‍্যে। এই দুই-জগতের মদ্দি কেমন যেন এক মিলও আচে। মিলটা যে ঠিক কোতা তা বলতি বা বুঝতিও পারে না। সকলি এলি পর এই সাব্যস্ত হলো যে, এরফানকে বয়ে নে যেয়ি পাশ-খালের পাশের পোষ্কার ট্যাঁকে গোর দেওয়া হবে। আর বাঘ এখন থাক পড়ি। কাল সকালেই ভাঁটার সময়ে বাঘ তুলে নে যেয়ে সবাইকে খপর দেতি হবে। বাঘ কলিমুদ্দি নে যাবে সজনেখালির ফরেস্ট অফিসে। পেরাইজ-ফেরাইজ যা পাবার পাবে। সারেং ডিঙি বেইয়ে যাবে উল্টোদিকে। আর ভীড়ের মদ্দি লয়! সুন্দরবনে পৌঁছতি হলি ভীড়ের সঙ্গি মোলাকাৎ হবেই। না হইয়ে উপায় লাই। তবে এই মনুষ্যিও সব নদীরই মতো। কত বাঁক, কত পেকার; কোথাও চড়া, কোথাও ভাঙ্গন। কিন্তু সোঁদরবনের খাঁড়ির মুখের ছোটবালি বড়বালি ছাড়া অমন বালি বা খটখটে শুকনো ডাঙ্গা জমি নদী পারে কমই দেখা যায়। চড়া বা ভাঙনও তেমন চোখে পড়ে না। দিনে এতবার জোয়ার ভাঁটা খেলে যে তাদের হিপাজতেই সব চর আর ভাঙন জমা পইড়্যে গেচে।

সারেং এলি'-ওরা নামলো। তকন আলো বিশেষ লাই। বাঘ যিখানে থাকার সিখানেই পইড়্যে রইলো। বাঘকে গুলি করার পর থেকি ওদের সকলের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সবশুদ্ধ ঘণ্টাখানেক সময় কেটেচে। আগে বাঘের সঙ্গে এরফান ছেল, এখন বাঘ একলা।

রাতে হয়ত বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়, কালু রায় বা বড়খাঁ গাজী কেউ এসি বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে যাবেন। বলবেন, বড় বেথা পেলি বেটা।

এই বাঘ কার সৈন্য কে জানে।

॥ ১১ ॥

রাতেরবেলা সুন্দরবন সত্যিই রহস্যময়ী হইয়ে ওঠে। এমন গা-ছমছম, ভয়-ভয় ভাব, এমন নির্জনতার কতা অন্য কোনো বনে ভাবাই যায় না। সব বনেই দিনে ও রাতে নানা শব্দ হয়। সুন্দরবনে পাকি খুব কম। এই আসল সুন্দরবনে। অন্য জানোয়ারও কম। মানে শব্দ করে চরে-বেড়ানো বড়-ছোট জানোয়ার। অন্য বনে পাতা খসে পড়লেও, নীরব রাতে শিশির ঝরলেও তার শব্দ হয় নীচের ঘন ঝোপঝাড়ে। সুন্দরবনের নীচে আগাছা বলতে কিছুমাত্রও লাই। সব সাফ-সুক করা, নিকোনো।

শুনেচে, রাতেরবেলা বাঘ দূরের বন থেকে ডাকলিও তার অনুরণনে এক মাইল দূরের বন গমগম কইরে ওটে। বাঘের একটো হুংকার শুইনে নিয়েচে হোসেন। আর শুনবার কুনোই ইচ্চে লাই।

এখন খাওয়া-দাওয়া হইয়ে গেছে সকলেরই। এরফান যে অন্ধকার রাতের তারা-ভরা আকাশের নীচে শুইয়ে আচে কবরে তার কথা কেউ আলোচনা পর্যন্ত করতিচে না। কেউ তামাক খাতিচে, কেউ বাঁশি বাজাতেচে। সেই অ্যাকর্ডিয়ান-ছোঁড়া প্যাঁ-প্যাঁ করতি ধইরেচেল, তাকে কে যেন ধমক দে থামায়ে দেচে। একটা মানুষ, তাদের সাথী যে মইর্যে গেল, তারে যে এই বনেই ফেইল্যে সঙ্গীরা কালই এই এলাকা ছেড়ি চইলে যাবে, ই কতাটা ভাবতিও খারাপ লাইগতিচে হোসেনের।

এরাই আসল মরদ। মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি, পেচু-

টানে ওরা বিশ্বাস করে না। সাপ-বাঘ-কুমীর-কামটের সঙ্গে যুদ্ধ কইর‍্যেই এরা বহুযুগ হলো বেঁইচি আচে। তবু মৃত্যুর ভয়ে বাড়িতে বইস্যে থাকেনি। পেতিবছর আবার এসিচে। মা, চেলেকে বিদায় দেচে দোরে দাঁড়ায়ে; স্ত্রী, স্বামীকে; ফিরবি না যে, তা জেইন্যেও। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। ক্ষিদে যে কত মারাত্মক হতি পারে তা একানি এইসেই পেরথম বুঝতি পারলো হোসেন। ই কতাটা বারবারই বুজ্‌তিচে। ক্ষিদের দাঁত সাপ-বাঘ, কামট-কুমীরের দাঁতের চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর, অনেকই বেশি ধারালো। এই মানুষগুলোনের প্রত্যেকে তা জানে। আর জানে বলিই আসে। আসতে হয় বাধ্য হয়ি, পেতিবছর।

সকলেই যে ভয়ে ভয়ে আইস্যে এমন লয় কিন্তুক। অনেকেরই কাছে এই বিপদ, এই যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণ চলে যাবার আশংকা, এই সবই আকর্ষণ! বিপদের মদ্দি থেইকি থেইকি ওদের এমনই অব্যেস হইয়ে গেচে যে, বিপদ না থাকলি ওদের ভাত হজম হয় না।

এখন গভীর রাত। সকলেই ঘুমায়ে আচে। তবে পেতি নৌকোতেই একজন করে সজাগ থেকি পাহারা দেয় পালা বদল কইর‍্যে। এই সুন্দরবনের লিয়ম। ইকানে ঘুম মানেই মৃত্যুর দোরের খিল খুইল্যে দেওয়া।

ফিতে-কমানো লণ্ঠন জ্বলতিচে কুনো কুনো ডিঙ্গিতে। যারা কেরোসিনের খরচ যোগাতি পারে, তারাই পারে, সারারাত বাতি জ্বেইলি রাখতি। যারা পারে না, তারা বনবিবি আর বড়খাঁ গাজীর ভরসাতে রাত কাইট্যে দেয়।

হোসেনদের নৌকোটা বাঁধা আছে পাশখালের একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে। কী গাছ, চেনে না হোসেন। লম্বা কাছি ঢিইল্যে দে ডিঙ্গিটাকে পার থেকে হাত বিশেক ভিতরে জলের মদ্দি বেয়ে এইসেচে। সকলেই তেমনই কইরেচে। বাঘ, মাজ-নদীতে সাঁতরে এইসি মানুষ নে যায় নৌকো থেকি। কিন্তু মাজ-নদীতে তো ছোট ডিঙ্গি নোঙর করতি পারে না, মাজ-খালেও পারে না। তাদের ত নোঙরই থাকে না। তাই তাদের লম্বা কাছি গাছের সঙ্গে বেঁধে লোঙর

করা ছাড়া উপায় লাই। এমন কি বড় লঞ্চও পারের খুব কাছে নোঙ্গর করে না। তারাও পারের থেকে একটু ভিতরে নোঙ্গর করে। অনেক সময়ে নোঙ্গর হেঁইটে যায় জোয়ারের সময়ে তাই বারবার পরীকে করে তারা নোঙ্গর ঠিকমতো করা হলো কী হলো না।

হঠাৎ হোসেন দেকলো টোঙের ভিতরেই শুয়ে যে, লাল একজোড়া চোক জলের উপর থেকে তার দিকে একদৃষ্টে চেইয়ে আচে। লাল মানে, ঠিক লাল লয়, কাঠ-কয়লার আগুন নিবে এইল্যে যেমন দেকতি হয়, অঙ্গার ; ঠিক সেই রকম। নড়ে না, চড়ে না, স্থির হইয়ে হোসেনরে দেখতিচে। লণ্টনের আলোটা তার চোখে পইড়্যেই চোখ দুটোকে অমন রঙ ধরাইচে।

উট্যে বসল হোসেন। তারপর টোঙ এর ভেতর থেকি বেইর‍্যে এসি নৌকোর পৈটাতে বসি ভাল করি নিরীক্কন করতি গেল। আর অমনি চিৎকার কইরে উটলো সারেং মিঞা। খবর্দার! নেইমে পাটাতনে বোস্।

সারেং মিঞার চিৎকারও হল্যো আর তারই সঙ্গি সঙ্গি নৌকোর পৈটার পিটে কী যেন ভারী একটা জিনিস আছড়ে পইড়লো। নৌকো টলমল কইর‍্যে উইটলো। লণ্টনটা আট্টু হলি লগি থেইক্যে খুইল্যে যেয়ে জলে পড়তিচেলো।

সারেং চাচার চিৎকারে সব নৌকোতে তার গুঞ্জরণ উঠলো। কী হল্যো চাচা ?

আরে কুমীর। বড়টা। আর এ ছোঁড়া গেচে পৈটাতে বসি কুমীরকে ভাল করি দেখতি।

কেউ কেউ হেসে উইটলো।

পাশের নৌকো থেকে কে যেন বললো, আজ ভাল কইর‍্যে মামাকে দেইক্যেও সাধ মেইটেনি গো ?

সারেং মিঞা বললো, ককনও নৌকোর পৈটাতে, কানাতে, অমন করে বসবি না। ন্যাজের এক বাড়িতে তোরে জলে ফেইল্যে মুকি কইরে নে যাবে জলের গভীরে।

কুমীর কোতা থাকে চাচা ?

কেন ? জলে।

না। জলে ত অবিশ্শ্যিই! কিন্তু তাদের বাড়ি-ঘর-ডেরা বলে কি কিচু নেই ? বাঘ যেমন "খাল"-এ বা "ট্যাঁক"-এ থাকে!

আচে। খালের বা নদীর দু'পাশের যে-কোনো পাশে খোঁড়লের মতো করে তাতে তারা থাকে। কাদার মদ্দি। ছানাপোনা নিয়েও থাকে। তবে, কুমীর ডিম পাড়ে ডাঙ্গাতে। ডাঙ্গাতেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। হয়তো তাপ লাগে ডিম ফুটতে, সে জন্যিও। বন-বিড়ালে ও বাঘে এবং অনেক সময় বড় সাপেও তাদের ডিম খেইয়ে যায়।

তুমি কি কখনো খেইয়েচো ?

কি ?

কুমীরের ডিম ?

খেইয়েছিলম ইকবার। ঐ যখন সারেং-গিরি কইরতাম। ঐ নীলমণিই দেইকেচেলো এপ্তিন ঘর থেকি। বোট থামায়ে, নিয়ে এইসেচিল দুটি ডিম। ইয়া বড় বড়। ডিম যখন তুলতিচে তখন কুমীর ছেল কাচাকাচিই ঝোপের আড়ালে। সি তো এইক্যেঁ বেঁইক্যে তাড়া কইরে এইসেচেল নীলমণিকে। কিন্তুক এক লাপ্যে সে বোটে।

কী খেইয়েচিলে ? ঝোল ?

না, না ঝোল লয়। ঝোল খাব কি করে ? অতবড় ডিম তো দুহাতে ধরি নেইতে হতো। মামলেট ভেইজেচেল নীলমণি। কইষে পঁ্যাজ রসুন, শুকনো লংকা দে। বোটসুদ্ধ সকলি মিল্যে খেয়েও শেষ করতি পারি না।

দুটো কুমীর হতি পারতো ডিম ফুইটে তা থেইক্যে।

তা হতি পারতো। তবে বইলেচি ত! সবই খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। খুদাহ্‌র দুনিয়াতে কোনো কিছুরই কমতি লাই। আজ যে বাঘে এরফানকে খেল, না খেলি ত এরফানেরও আরও ছেলে-মেয়ে হতি পারত। তাতে কি মনুষ্যির সংখ্যা কিছু কইমবে ? সব হিসেবেই

হরে-দরে সমান হইয়ে যায়। তাঁর হাতে দাঁড়িপাল্লা। তিনিই জান দেন; তিনিই নেন। উ সব হিসাব-কিতাব বড় গোলমেলে। অত সহজ নয় বুইজ্যে ফেলা।

তারপর বললো, নে, এবার ঘুমো দেকি। কাল বাঘটাকে এইনি দেই আমার ছুটি। আমি বেইর‍্যে পইড়ব আমার পথে।

সে পথ কোথায় নে যাবে তোমারে চাচা?

সে পথই জানে! মানে, জল।

তুমি একা একা থাকো কি করে এই ভীষণ বনে আর জলে?

যে মনুষ্যি একা থাকতি না পারে সে মনুষ্যির মনুষ্য-জন্মই বেথা। আখরতের দিনে তাকে আবার ফিরৎ পাইট্যে দিবেন খুদাহ! ইতে কুনোই সন্দেহ লাই। একাই যদি না থাকতি পাইরব ত মনুষ্য হইয়ে জন্মাইচি কী কইরতে। দলে তো থাকে জন্তু-জানোয়ার। শুয়োর, বকর, মোরগা, হরিণ, বাঁদর, মাছ সবাই। সেই সব দলের ইকজন কইর‍্যে 'গোদা' থাকে। "পালের গোদা।" সি, দলের হাততালি আর আর বাহবা আর মোসাহেবী পেইয়ে পেইয়ে ভাবে, আমি কী হনু! ল্যাজ মোটা হইয়ে যায় তার। কিন্তু সি হতভাগা জানে না পয্যন্ত যি তার মনুষ্যি হইয়ে উইটতে ইকনো ঢের বাকি। তার জন্ম-থেইকি মৃত্যু ইস্তক মিথ্যেই হাঁটাহাঁটি, চেল্লাচেল্লি। এই সব গোদারাই মনুষ্যের মতো মনুষ্যিদের ইকানে শান্তিতে থাকতি দেয় না।

হোসেন চুপ কইর‍্যে রইল। সারেং মিঞার সব কতাই যে সি বোজে এমন লয়। দিন কয় হল্যো দেকতিচে, সব কতার সঙ্গি সায়ও দিতি পারে না। একা একা, কী খায়, কী করে মানুষটা; ভেবি পায় না। সঙ্গের চাল ডাল নুন আর কদ্দিন! মিষ্টি জলও ত শেষ হয়ি যাবে। তাপ্পর?

কথাটা মাতায় আসতিই বইললো, তুমি খাও কি?

মানে?

মানে, তুমি যে একা-একা নিরুদ্দেশে চইল্যে যাও, তা তুমি খাওটা কি? খাদ্য-খাদকতা সবই শেষ হইয়ে যাবে কদ্দিন পরই।

হাঃ। সারেং মিঞা হাইসল। বলল, খুদাহ্‌র দুনিয়াতে খাদ্য-খাদকের অভাব আছে নাকি কুনো! জাহাজডুবি হল্যি, মন্নুষ্যিরা কোনো জনবসতিহীন দ্বীপে গিয়ে উইটলে সিকানে তারা খায় কি? কীড়ে-মাক্‌ড়ে, মাছ, সাপ, গিরগিটি, স্যালামাণ্ডার, কামট, কুমীর, হরিণ, বাঁদর, কিচু ধইরে খেলিই হয়। পাতা-পুতা, বনের রকমারী ফল। হ্যাঁ. সঙ্গি এট্টা জিনিস থাকলি ভাল হয়, তা হতিচে দেশলাই। আগুনটা মস্ত দরকার। সবচাইতে বেশি দরকার। তা নৌকাডুবি হলি ত আর দেশলাই সঙ্গে নে পৌছয় না তারা বসতি-হীন দ্বীপে। তাও ত তারা বেঁইচি থাক্যে, না কি? শরীলের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। বুয়েচো বাজান!

আর মিষ্টি জল?

সেও আচে। অনেক আচে। খুঁইজে বের করতি হয়। বালির মদ্দিও মিষ্টি জল আচে। কিচুর জন্যিই কিচু ঠেইক্যে থাকে না। আসল হলো গে মনের জোর। যা চাইতেচ তা পাবার ইচ্চে। একা না থাকলি নিজেকে আবিষ্কার কইরবে মন্নুষ্যি কী করে। আমরা হলাম যেয়ে এক-একটা দ্বীপ। চারদিকে বেনোজল। নোনা জল। এই দ্বীপের মদ্দ্যি সবই আচে। মিষ্টি জল, খাদ্য-খাদক। কিছুরই কমতি লাই। কিন্তু মন্নুষ্যির অঙ্গ-পেতঙ্গের মদ্দি সব কটিরই পেয়োজন আচে অবিশ্যি, কিন্তু সবচেইয়ে বেশি যার পেয়োজন সেই জিনিসটার ব্যাপারই কেউ জানে না।

সেটা কি?

সারেং মিঞা বালিশে-সোয়ানো তার মাথাতে আঙুল দে বললো, এই! এই মগজ। যারা তা ব্যাভার করে তা তাদের নিজেদের সুখ-সুবিধে, খাদ্য-খাদক বা অন্যকে মাইরবার হাতিয়ার তৈরি করতিই তাকে কাজে লাগায়। নিজেকে আবিষ্কার করার মগজকে কাজে লাগায় কই? নিজের শরীরের রহস্যের কতা কতিচি না, কতিচি নিজের মনুষ্যত্বর রহস্যর কতা।

হোসেন চুপ কইর্যে থাকে। সারেং মিঞার কিচু কথা বোজে,

কিচু বোজে না। এমন সময়ে ফটাফট শব্দ আসে শিষখালের দিক থেইকে। এই শব্দের কথা আজই সকালে মাছ ধরতি ধরতি এরফান তাকে বইলেচেলো। একটা গোসাপ দেইকেচেল সকালে, শিষখালের পাশের ঝোপে। এরফান বইলেচেলো, ছ্যাখো হোসেন, এ ব্যাটা মনমরা হইয়ে চলি যাতিচে। এই খালে জোর জোয়ারের জল ঢুকতিচি। মাছে ভইর্যে যাবে ইকেবারে। এই খাল, মনি হয়, এই ব্যাটারই জমিদারী। নেমে এইসি পেট ভরি মাছ খায়, তাপ্‌পর আবাব শিষখালের আশেপাশের ঝোপে-ঝাড়ে গিয়ে শুইয়ে থাকে। শীতকালে রোদে শুয়ি রোদ পোহায়। কুমীরের মত। ভারী সুন্দর দেখতি গোসাপকে। কী সুন্দর চকচকে চামড়া। মস্ত বড়ও হয়।

হোসেন ভাইবতেচেল, কী কইরে প্যায়দা হওয়ার পর ইন্তেকাল অবধি এরা কাটিয়ে দেয় জীবন! শুধু এরাই বা কেন? সব জন্তু-জানোয়ার এবং সত্যিই অধিকাংশ মনুষ্যিই! জন্মাবধি খাওয়া-খাওয়া কইরে মরে। খাদ্য-খাদকের ধান্দাতেই জিন্দগী বরবাদ কইর্যে চইল্যে যায় তারা। খুদাহ্‌র কী বিচিত্র লীলা। ওদের না হয় মগজ লাই মনুষ্যির মতো। কিন্তু মনুষ্যিরাও কেন এমন করে সিটা বুঝা ভারী মুশকিল। হয়তো সারেং চাচা ঠিকই বলে।

গোসাপটা আবারও ফট্‌ফট্‌ শব্দ করলো। তারপরই রাতের নিস্তব্ধতা খানখান কইর্যে দে জোয়ারি পাখি ডাইকতে থাকলো পুত-পুত্‌-পুত্‌-পুত্‌ কইর্যে। কে জানে, কবে নদী আর জোয়ার তার পুতকে ফিরায়ে দিবে!

॥ ১২ ॥

ভোরের আলো ফুটতি না ফুটতি সকলে মুকে সামান্য কিছু ফেইল্যে দিয়েই চললো বাঘ আনতি।

কাল সন্ধ্যের মুকে যি সব ডিঙ্গি বা নৌকোর সইঙ্গে ই-বহরের কোনো নৌকো বা ডিঙ্গির দেকা হয়েচেল, তারাও খবরটা পেইয়েচেল। তাই আরও অনেক ডিঙ্গি ও নৌকো এসে ভিড়ল। এই বাঘই গোবিন্দকে নেওয়া বাঘ হলি, কিছুদিনের জন্যি সকলেই একটু নিশ্চিন্ত হয়ি যার যার কাজ করতি পারে।

ডাঙ্গায় উইট্যে সকলের আগে আগে চইললো কলিমুদ্দি মিঞা।

সারেং মিঞা ইকবার বইলেচেল যে, সে যাবে নি। তার কাজ তো ফুইর‍্যেই গেচে। বাঘ আনতে আবার শিকারীর দরকার কি? কিন্তুক সকলেই আপত্তি কইরেচেল। অন্য বহরের এক ছোঁড়া "বক্স-ক্যামেরা" নে আসিচে কোডাক কোম্পানীর। সি বইললো, শিকারীর সঙ্গি বাঘের ফোটো খিঁচবে সে। সারেং মিঞা শুইন্যে হেসি বাঁচে না। বলে, জিন্দগীর আখরি ওয়াক্ত এ পৌঁচে একন "বাক্স-বন্দী" হবার কুনো ইচ্ছাই নেই গো আমার।

এই নে খুব হাসাহাসি হল্যো কিছুক্ষণ। তা যাই হোক, সকলেই যেত্তিচে। সারেং মিঞা পেচনে পেচনে। আধা পত গেচে ওরা, এমন সময়ে সামনে যারা ছেলো তাদের মদ্দ্যি একজন এইসি শুদোল, বাঘ ঠিক কোতায় চেল? এই হোসেন, তুই চল তো। কলিমুদ্দি মিঞা এমন তামাক টেইনেচে, কে জানে ছিলম-এ কী ভরা ছেল, বাঘ খুঁইজ্যে

পেতিচি না।

হোসেন হেইস্যে উঠলো সি কথাতে।

বইললো, বাঘ কি শর্ষে দানা যে খুইজ্যে পেতিচে না!

বলে, তার সঙ্গি দৌড়লো।

বনের মদ্দি যেন উৎসব লেগেছে। হাসির হররা উইটচে থেকি থেকি। কেউ হাতে হুঁকো নে আইসচে। কেউ বিড়ি ফুঁকতিচে।

হোসেন যেয়ে পৌঁছে দেইকল কলিমুদ্দি মিঞা দাড়ি চুলকোতিচে।

হোসেন হেসে বইলল, কী মিঞাজান। বাঘকে গায়েব কইর্যে দেলে নাকি?

কিন্তু মিঞাজান নীরব।

বলল, ছাকো তো হোসেন। বাঘ ঠিক ঐ গাছতলাতিই মুখ হাঁ করি পইড়্যে ছেল না?

হোসেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়ে গেল।

ধড়ফড়ানো বুকের মদ্দি থেকে একটো আওয়াজ বেরুলো। বললো, ছেলো ত!

তবে?

তবে? ডাক, ডাক, সারেং চাচাকে ডাক।

সারেং মিঞার কাছে যখন খবর পৌঁচলো তখন সে বিশ্বাস কইরতে পারে নি প্রথমে। তারপর বড় বড় পা ফেলি সিখানি পৌঁছি উবু হয়ে বইস্যে হেঁকে বইললো সকলকে, তুমরা পেত্যেকে একুনি ফিরি যাও যার যার ডিঙ্গিতে। অন্যরা যেয়ে যার যার কাজ করো। বাঘ বেঁইচে আচে।

ইটা কি কতা বইললে চাচা?

কলিমুদ্দি অবিশ্বাসের গলাতে বলল।

হোসেনের মুখটা হাঁ হইয়ে গেল। তার বাক্যি সইরচেলো না মোটে।

হঠাৎ সারেং বললো, হোসেন, তুই ঐ গর্জন গাছটাতি চইড়্যে বইস্যে থাক। আমি বন্দুক গাছ নে আসি।

কলিমুদ্দি বললো, বন্দুক-গাছও সঙ্গে নে আসোনি?

মরা-বাঘ আনতি বন্দুক কোন কাজি লাগতো? সামাল তুমরা সক্কলে। খুব সাইবধানে হল্লাগুল্লা না কইর্‍যে চইল্যে যাও। গুলি খাওয়া বাঘ কোতায় ওৎ-পাতি বসি আচি তা কে জানে! তার উপর তার শিকার পর্যন্ত আমরা নে এইসেচি।

হোসেন গাছে উইট্যে পড়লো লুঙ্গি মালকোঁচা মেইর্‍যে। আর সকলে হতবাক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নীরবে ফিরে চললো। কারো মুকে কোনো বাক্যি নেই। সব কতা ফুইর্‍যে গেচে। সকলেরই একন চিন্তা, মানে মানে যে যার ডিঙ্গিতে গিয়ে উইটতে পারলি হয় কোনোমতে প্রাণ বাঁচায়ে।

সারেং মিঞার মাথা হেঁট হইয়ে গ্যাচে। ভাগ্যে সঙ্গে হোসেন আর কলিমুদ্দি চেল সাক্ষী। নইলে সে ইকেবারেই বে-ঈজ্জৎ হইয়ে যেইতো। সারেং মিঞা ভাবতেচেল, কী হতি পারে! এমন ঘটনার কতা তো কককনো শোনেনি। কত বাউলে, শিকারিকেও ত চেনে, কতদিন হয়ি গেল আসতিচে এই সোঁদরবনে কিন্তুক এমন ভোজবাজি, বহুরূপীর খেল-এর কতা তো কেউই বলেনি!

হোসেন একা একা বসি আচে গর্জন গাছের উপরি। আবার সোঁদরবন, সেই সোঁদরবন। ডানহাতি জঙ্গল থেকে খুব জোরে জোরে বাঁদর ডাকতিচে। হরিণ ডেইক্যে উইটল এ জঙ্গল থেইক্যে। হোসেন কোন্ দিকে যে তারা আচে, তা ঠাহর করতি পাইরল না ঠিক। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ করি ডাকতেচেল। বোধহয় শিঙালের ডাক এ। ঠিক ওমনি সময়ে সেই বড় শিঙালটা, কাল যাকি দেইকেচেল সি আসি কাইলকেরই মতো শিঙের বাহার মেলি ঠিক একই জাগাতে দাঁইড়ে রইল। কাল বিকেলে আর আজ সকালে। এই কী সেই দোজখ-এর হরিণ? হিঁদুদের মায়ামৃগ! খুদাহ্ই জানে!

অনেকক্ষণ পর দেইকতে পেল সারেং মিঞা বন্দুক হাতে ধরি আসতিচে। খুব সাবধানে এক এক পা ফেইলতিচে। কুত্তা গেল যে

মরা বাঘ। এ কী কারবার!

চাচা গাছতলিতে পা ফেইল্যে এইসে পৌঁচলে পর নামলো হোসেন। সারেং চাচা কাঁধের উপর একটা কুড়াল ফেইল্যে নে এইসিচে। কুড়ালটা হোসেনের দিকে এইগ্যে দে বইলল, ইটা রাক্। মরার আগে মেরে মরবি। ভাল করে যদি মাতাতি এক কোপ বসাতি পারিস তো মামার দফারফা হইয়ে যাবেক।

কিন্তু সে গেল কোতা চাচা? নাকি সব ভুল! সব হেঁয়ালি!

কাল এরফানকে যে কবর দেওয়া হল? সিটাও কি হেঁয়ালি? বাস্‌স্। আর একটিও কতা লয়। ইসারাতে যা বইলব তাই কইরবি।

এমন সময়ি ওরা দেইকলো যে হাতে বড় শড়কি নে একটি অল্পবয়সী ছেইল্যে, এই হোসেনদের বয়সীই হবে, একা একা ইদিকে আসতিচে। সারেং মিঞা বিরক্ত মুখে সেদিকে চেয়ি থাকলো। কাছে এলি পর বোঝা গেল, এ সেই বক্স-ক্যামেরাম্যান যি সারেং মিঞাকে বাক্সবন্দী কইরতে চেইয়েচেল। তার ক্যামেরাটিও ঝুইলতেচে গলাতে।

সারেং বইললো, তোমার দায়িত্বটা লিবেটা কে?

ছেলেটি হাইসলো, বুলল, বনবিবি লিবে। আবার কে?

তোমার নাম কি?

মতি দাস।

আবার ক্যামেরা কেন?

বাঃ। ভূত-দানো যদি সে না হয় তবে তাকি তো মরতি হবেই সারেং মিঞার বন্দুকে।

তুমি শিক্কার কইরেচ ককনো আগে?

না সারেং মিঞা। শিকার করিনি, তবে, বাঘের কুমীরের শিকার হত্তি-হতি বেঁইচে গেচি অনেকবার।

সারেং মিঞা হেসি ফেইললো।

মনে মনে বলল রসিক আচে ছোঁড়া। সাহসও আছে অবশ্যই। অতগুলোন জোয়ান-মদ্দ-প্রৌঢ়-বুড়ো সুড়সুড় কইর্যে চইল্যে গেল এই কাণ্ডর কতা শুইন্যে আর এ ছোঁড়া একা একা শড়কি হাতে ফিরি এলো।

বাঘের হাতে যিখানি-সিখানি খাদ্য হতি পারত, সি কতা জেইনেও।

আসলে এই বয়সটাই মারাত্মক। এই বয়সের ছোঁড়ারাই সারা দুনিয়াতেই যা করার তা করে। এর চেয়ে ছোটরাও করে। যতই বয়স বাড়ে মানুষের, ততই সে ভীতু হতি থাকে। কেউ সংসারের চক্রে জইড়্যে পড়ে। কেউ টাকার চক্করে। যার যত বেশি টাকা তার মরতি তত ভয়। ইসব সারেং মিঞার পেত্যক্ক অভিজ্ঞতাই বলে।

এবার কোনো কতা লয়।

এই বলি সারেং মিঞা কার্ল বাঘ যিখানে শুইয়েচেল সিখানে গিয়ে দাঁইড়াল। রক্তে মাটি ভিজে আচে। এরফানের রক্তের দাগ আর বাঘের রক্তের দাগ আলাদা আলাদা। বাঘ যে উইট্যে দাঁইড়েচে তার খোঁচ দেকা গেল। এবং বাঘের রক্তে ভেজা মাটিতেই একটো সাদা চৌকো মত জিনিস পইড়্যে আচে দেখে সারেং মিঞা উবু হইয়ে বসি সিটা পরীক্কা কইরতে লাগলো।

ইটা কি? এত্ত বড় ছক্কা? লুডো খেলার?

কতাটা মন্দ বলেনি মতি। জিনিসটা লুডো খেলার ছক্কার মতোই দেখতি বটে। তবে, মদ্দি কালো বা লাল ফুটকি ফুটকি দাগ লাই। আর সাইজে তার চেয়িও কুড়ি-পঁচিশ গুণ বড়।

জিনিসটা হাতে তুইল্যে নে' নেড়েচেরি দেকে সারেং মিঞার চোক কপালি উইট্যে গেল।

নিজের মনেই বলল, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

কি?

হোসেন আর মতি একসঙ্গি বইললো।

বাঘের মাথার হাড়।

সারেং মিঞা বইলল, সামনে মুক কইর‍্যে চেল চোট কইরবার সময়ে। বাঘকে কখনো সামনাসামনি মারতি লাই। বড় শিকারিরা তাই বলেন। কিন্তু আমার উপায় ছেলোনি। ভাইবছিলাম যদি এরফান তখনো বেঁচি থাকে, যদিও বেঁইচে থাকার কোনোই সম্ভাবনা ছেলনি; তবু। কপালে বুলেট লেইগ্যেচেল। তাতেই বাঘ অজ্ঞান হইয়ে

পইড়্যে যেইচেল। কিন্তু অতক্ষণ অজ্ঞান হয়্যে পইড়ে যে থাকবে তা তো চিন্তাই করা যায় না। জ্ঞান আসতি, মাতায় অতবড় ছ্যাঁদা নিয়েও সে বাঘ উইট্যে চইলে গেল! কী জানোয়ার বল ত দেকিনি।

শুনিচি, ওদের চামড়ার ফুটো ঢেইক্যে যায়, তাই রক্ত পড়াও বন্ধ হইয়ে যায়।

মতি বললো।

তা আমি জানি। রক্ত পড়া না হয় বন্ধ হল কিন্তু বুদ্দি পড়াও কি বন্ধ হবে? মাথার অতবড় ফুটো দে সব বুদ্দিও তো বেইরে যাবার কতা।

ঐ অবস্থাতেও হেইস্যে ফেললো সারেং মিঞা।

হোসেনও হাসল।

বাঘটা পরথমে টলতে টলতে যেইচে।

পায়ের খোঁচ দেখি বলল, সারেং।

বেশ অনেকক্ষণ পরে তাব পা সমান পইড়্যেচে।

এবারে সাবধানে খোঁচ দেইকি দেইকি এগোলো ওরা। আগে সারেং, পেচনে সারেং মিঞার কথামত ওরা দুজনে। পাশাপাশি।

চলতি-চলতি দেইকলো হোসেন, আশ্চর্য! বাঘটা এরফান আর ও যেকানে সকালে মাছধইরতেছেল আর যেকান থেকে এরফানকে নে গেচিল সেইখান দেই শিষখালটা পেইরেচে। খাল পেইরে যেয়ে সে ওদিকের জঙ্গলে পৌঁচেচে। ও-পারে কিছুটা যেয়েই দেখতি পেল এট্টা গোসাপ ধইরে খেইয়েচে সে। বাঘটা কোন্ সময়ে যে সে খালটা পেইরেচে তা টিক ঠাহর করতি পারলো না সারেং মিঞা। গোসাপটাকে প্রায় পুরোই খেইয়ে ফেইলেচে সে। সিকানে মাটিতে একটু ঝাপটা-ঝাপটির চিহ্ন রইয়েচে। সিখান থেইকি খোঁচ দেইক্যে দেইক্যে এগিয়ে চললো সারেং মিঞা। তার পেচন পেচন ছায়ার মতো ওরা দুজনে।

বাঘটা গিয়ে "মাল" এর উপরে শুইয়ে পইড়েচেল। সম্ভবতঃ সকালে ওরা শিষখালের অপর পারের জঙ্গলে যখন বাঘ আনতি আসে তকন বাঘ এইকানেই শুইয়েচেল। ভাগ্যে কারেও ধরেনি পেছন থেকি এইস্তে। কথাটা ভেইবেই রোম খাড়া হয়ে উটলো ওদের।

বাঘ কি তাদের একন আসতি দেইকেচে ?

মনে হল তাই। তকনও সিকানে বাঘের লোম পইড়্যেচেল।

সারেং মিঞা মাটিতে হাত দে দেকল।

এমন সময়ে ওদের নাকে বিচ্চিরি দুর্গন্ধ লাগলো। বাঘ পেচ্চাপ কইরেচে একটা পশুর গাছের কাণ্ডে। সিখানে তখনও পেচ্চাপের দাগ ছেল। ভিজে ছেল কাণ্ডর সি জায়গাটা। সারেং মিঞা হাতের পাতা ছুঁইয়ে দেকলো গরম তকনো জায়গাটা। ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইসারাতে আঙুল ছোঁয়ালো ঠোঁটে। তারপর আবার এগোল।

বাঘের খোঁচ দেইকে এগোতি এগোতি আবার কালকের মতো অবস্তা হল্যো। চলেচে ত চলেইচে। মাইল দু-তিন সমানে চলেচে বাঘ। ওরা যে তার পেচু নিয়েচে সি কতা বাঘ বুঝতে পেইরেচে। কাল গুলি খেইয়ে, গুলি যে মোটেই সুখাদ্যর মদ্দি গণ্য লয়, সি-কতা সি ভালমতোই বুইজেচে।

একটা জোয়ারি পাকি ডাকতিচে পুত-পুত-পুত-পুত-পুত। কোথাও আর কোনো শব্দ লাই। বাঘও চলেচে, ওরাও চলেচে। সময়ের কোনো মা-বাপ লাই। সোঁদরবনের গভীরে গুলি-খাওয়া বাঘকে পিছা যারা কইরেচেন তাঁরাই জানেন যে, সময় সেইসময়ে মরি থাকে। সে যে আচে, সি কতা বোজা পযযন্ত যায় না। কোতাও দাঁড়াবার জোটি লাই। বাঘ চলেচে তারাও চলেচে। যমের পিচে যম ; তার পিচে যম।

দেকতি দেকতি বেলা দ্বিপ্রহর হলো। এই সময়ে বন সবচেয়ে সুনসান। ছায়ারা সবচেয়ে ছোট। চারদিকের বনকে দেকায় যেন একই রকম—বনের মদ্দি চলতি চলতি কোতা দিয়ে এইসেচে, কোথায় যেতিচে তার কোনোই হিসাব থাকে না। সোঁদরবনের গাছেরও কোনো বৈচিত্র লাই। কেওড়া, কেওড়ার শুলো, গরান, গেঁয়ো, মাঝে মাঝে হ্যাঁতালের ঝোপ, দু-একটি সুন্দরী, টক-সুন্দরীর ঝাড়, গর্জন, পশুর, ইত্যাদি। হোসেনের মনে হতিচেল তারা যেন শিষ-খাল পেইর্যো

আসার পর থেকি একই জায়গাতি এতক্কন ঘুরতিচে।

যেমনই এমন মনে হওয়া অমনি সারেং মিঞা খুবই চিন্তিত গলায় বইললো, সাবধান! সাবধান! বাঘ দণ্ডী কাটতিচ হোসেন। খুব সাবধান!

সোঁদরবনের বাঘের মতো ধূর্ত বাঘ দুনিয়ায় লাই। পেছু-নেওয়া শিকারিকে খতম করার জন্যি তারা চক্র করে ঘুরতি থাকে। কেরেমে কেরেমে সেই চক্র বা দণ্ডী ছোট কইর্যে নে আসে। পায়ের খোঁচ দেইক্যে, একইরকম বনের মদ্দি ক্রমান্বয়ে চইলতে থাকা শিকারিকে বুদ্ধু বাইন্যে দণ্ডী ছোট কইর্যে আনতি আনতি একসময়ে বাঘ শিকারির পেচনে চলে যায় আর পেচন থেকি কোনাকুনি তার ঘাড়ে লাইপ্যে পড়ে।

একটা বড় কেওড়া গাছের তলাতি পোঁছতিই তার কাণ্ডের গায়ে হেলান দে দাঁইড়্যে পড়ে খুব সাবধানে সারেং পেছন দিকে দৃষ্টি চালাল।

ছুরির দে' ফালা ফালা কইর্যে দেইকে, কিচু দেখতি পায় কিনা! বাঘ যে কত ছলাকলা জানে! কত সামান্য আড়ালে যে অতবড় শরীল-টাকে লুইক্যে ফেলি সে বেপাত্তা হইয়ে যায় তা কহতব্য লয়।

সারেং ফিসফিস কইর্যে বইললো, তোরা দুজন শিগগিরি উইট্যে যা। দুজনে দু দিকে দেকবি আর কোথাও সন্দেহের কিচু দেখলিই আমাকে বলবি। যা, উট্যে যা এই কেওড়া গাছে।

তখন ওদের দুজনের অবস্থাও সঙ্গান। সারেং-এর বলার অপেক্কাতেই যেন ছেল। বলতি না বলাতি দুজনেই তরতর করি গাছে উট্যে যায়। তবে আজ কুড়ালটাকে সঙ্গে নে' ওঠে হোসেন। মতিও শড়কিটাকে হাতছাড়া করেনি।

ওরা গাছে উঠলে পরও সারেং তবু কিছুক্কণ গাছের গুঁড়ির কাচে দাঁইড়্যে থাকে।. ঠিক সেই সময়ি পেচন থেকি, যেদিকে সারেং মিঞার চোখ সেদিক থেকি হরিণ ডাকতি থাকে খুব জোরে জোরে। সারেং মিঞা বড় বড় পা ফেলি এইগ্যে যায় সে দিকপানে তাপ্পর একটা গর্জন গাছের সঙ্গে সেঁইটে দাইড়্যে পড়ে।

কোথাও আর কোনো শব্দ লাই। হঠাৎ পিঠেম বাতাস দিতে

থাকে। আর জোয়ারি পাকি ডেইকে ওঠে পুত্-পুত্-পুত্-পুত্-পুত্। হঠাৎ জোয়ারি পাকি খুব ভয় পেয়ি ডাকতি ডাকতি উইড়্যে যায়। আর টিক সেই সময়ি বাঘটা একটা হ্যাঁতাল ঝোপের মদ্দি থেইকে বেইর‍্যে এসে কেওড়া গাছের উপরে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বইস্তে-থাকা হোসেনদের দেখতি পেয়ে দু'পা এগিয়ে এসি খুব মনোযোগের সঙ্গি তাদের দেখতি থাকে। তারপয় ফাঁকা জায়াগাতি বেইরে এসি গাচের দিকে এইগ্যে যায়।

মতি চেঁচিয়ে বলে, বাঘ! বাঘ! সারেং মিঞা, বাঘ!

হোসেন বলে, চাচা, বাঘ!

কিন্তু সারেং-এর কী হইয়েচে, কে জানে! সে যেমনটি দাঁইড়্যে চেল তেমনটি দাঁইড়্যে থাকে। অথচ বাঘ তার বন্দুকের পাল্লার মদ্দি। বাঘ গুটি গুটি গাছের দিকে এগোয় মুখ উপুরে তুইল্যে। সে হয়তো ভেবেছেল কাল দুজন শিকারি চেল, আজও দুজনই এইসেচে। আর তাদের কারো হাতেই যে বন্দুক নেই তা সে দেইকে নিয়েচে। বন্দুক সে খুব ভালোই চেনে!

তাড়াতাড়িতে হোসেনরা বেশি উঁচুতে উইটতে পারেনি। মতি ও হোসেনের দু'পা ড্যাং ড্যাং করি ঝুইলতেচেল। তারা দুজনে চেঁচায়ে ওটে, বাঘ। চাচা। মিঞা। বাঘ। মারো মারো। গাছে উইট্যে ধইরবে আমাদের।

তবু চাচা শব্দ করে না।

এখন সারেং বাঘের ঠিক পেচনে। বাঘ আরো কয়েক পা এইগ্যে এসে কেওড়া গাছের নীচে পেছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁইড়্যে পড়ে সামনের দু থাবা দে' মতিকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ততক্ষণ মোতি পা তুল্যে নে তার শড়কিটা বাঘের দিকে জোরে ছুইড়্যে দেচে। কিন্তু তা বাঘের গায়ে না লেগি মাটিতে পইড়্যে গেঁথে গেল। তকন বাঁ হাতে ডাল আঁকড়ে হোসেনও তার কুড়াল ছোঁড়ে। কুড়ালটা লাগতো বাঘের মুখে। কিন্তু কানঘেঁষে যেয়ে তা মাটিতে গেঁথে যায়। মাথাটা কাদাতে গেঁথে যায় আর হাতলটা দুলতে থাকে। ঠিক সেই সময়ে

সারেং দু-তিন পা এইগে এসে বাঘের ঘাড় লক্ষ্য কইরে চোট করে। পেকাণ্ড এক লাপ মেইর‍্যে বাঘ উপরের দিকে উইট্যে এসে প্রায় মতিকে ধরতি-ধরতিও ধরতি না পেয়ে চিৎপটাং হইয়ে মাটিতে পড়ে। মাটিতে পইড়্যেই মুখ ঘুইরে সারেং মিঞার সামনা-সামনি হয়। কিন্তু সারেং মিঞা বইলল, তোর বড় খাঁই হইয়েচেল শালা! বড় খাঁই। কাল মইর‍্যে বেঁইচেচিলি কিন্তুক আজ? এই বলতি বলতি বাঘের দিকে দৌ়ড়ে আসে বন্দুক সামনে করি। বাঘের ঘাড়ের গুলি তার মেরুদণ্ড ছিনিমিনি কইরে দেচিল কিন্তু তবু বাঘ পেছনের দু পায়ে দাঁইড়ে উঠে সারেংকে থাবা মারতি চায়। বাঘ দাঁইড়্যে উটতিই ইকেবারে চিতোনো-বুক লক্ষ্য করি সারেং মিঞা আরেকটা গুলি কইর‍্যেই এক লাপে বাম পাশে সইর‍্যে যায়। বাঘ লাপ দিল যদিও কিন্তু ঐ গর্জন গাছের আধাআধি দূরত্বে গিয়ে কাদায় পইড়ে গেল।

সারেং মিঞাকে যেন জিন-এ ভর কইরেচে। সে, লুঙির কষি খুলি আরো দুটি টোটা নে' আবার বন্দুকে ভইরে নে' বাঘের পাশ দিয়ে যেয়ে তার কানে গুলি কইর‍্যে দিল একটা। আবার দৌড়ে ওপাশে যেয়ে বাঁ কানে আরেকটা। বাঘের মুখটা কাদার মদ্দি নেমে গেল। সামান্য সময় থরথর কইরে কেঁইপ্যে উট্টে বাঘ নিশ্চল হইয়ে গেল।

গাছ থেকি মতি চিৎকার করে, সারেং মিঞা, বন্দুকটা নে বাঘের গায়ে পা ঠেকায়ে ইকবার দাঁড়াও। আমি ফোটোক তুলি।

বলেই, সি তার গলায় ঝোলানো বাক্স ক্যামেরা ঠিক করে।

সারেং মিঞা তাকে ধমকে বলে, না, না। একদম লয়। বনবিবির বাহনরে আমি মাইরব সি ক্ষেমতা আমার কুতায় রে? ক্ষেমতা ত এই বিলিতি বন্দুকের। আমি কে?

তারপরই বলে, নে। নে। চল্। শিগগির যাই। নাম, গাছ থেকি। কুড়াল আর শড়কি যা চালাচ্চিলি তাতে ত বাঘ ফওত্ এমনিতেই হইয়ে যেত।

লজ্জা পেয়ে হোসেন বলল, বড্ড ভয় ধইরেচেল চাচা!

মতি হাসতি হাসতি বলে, ভয়, বলি ভয়!

॥ ১২ ॥

কে যেন জেইগে থাকি সারারাত।

আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। পনেরো দিন হইয়ে গেচে হোসেন এইসেচে এই সোঁদরবনে কিন্তু ওর মনে হতিচে যেন ও এখানকারই একজন। শুধু এখানকার একজনই নয়, এই কলিমুদ্দিন, এরফান, কালু মিঞা, অছিমুদ্দি, নীলমণি সারেং, যোগেন দাস এবং আরও কত অগণ্য হিঁদু-মোচলমান মনুষ্যিরই একজন। সারেং মিঞার ভাষায় বলতি গেলে "যূতবদ্দ জানোয়ারের"ই একজন।

বাঘটা শুয়ে আচে। মানে, তার খুলে-নেওয়া চামড়াটা, কলিমুদ্দি মিঞার ডিঙ্গিতে। পাটাতনের নীচে। বিস্তর লুন তার চামড়ার ভিতরের কাঁচা দিকটাতে ছিইট্যে দেওয়া হইচে কালই দশটা ডিঙ্গির লুনের র‍্যাশান থেকি। লইলে নাকি চামড়া খারাপ হইয়ে যাবেক।

মুকে মুকে ওই সাংঘাতিক বাঘের কতা আজ সাঁঝেই ডিঙ্গি থেকি নৌকোয়, নৌকো থেকি গোলপাতা-কাটা বড় বড় মহাজনী নৌকোতে ছইড়্যে গেচে। কাল সকালি কত যে মানুষ এসি পইড়বে তাদের নিজ নিজ নৌকোতে তার কোনো গোণা-গুণতিই লাই। "জলপিপির জলা"র পাশে, পীরের জঙ্গুলে-দ্বাপে যেমন মদনটাকি পাকি ঢিইপ্যি মেরে বইস্যে থাইক্যে তেমনই ডিঙ্গিগুলোন ঢিইপ্পি মেইর‍্যে বইস্যে থাইকবে কাল সকাল হতি না হতি এইকানে।

কলিমুদ্দি আর কালুমিঞারাই নে যাবে বাঘের চামড়া আর মাতাটা সজনেখালির ফরেস্ট আপিসে। হাততালি আর মালার কুনোই

লোভ লাই এ জীবনে আর সারেং মিঞার। আর কুনোই "চাওয়া" লাই তার এই জিন্দ্‌গীতে। "চাওয়া-পাওয়া" "খাইদ্য-খাদক" সবকিচুরই পেয়োজন শেষ হইয়ে গেচে।

চাওয়া যে লাই ; তা লয়। একটা চাওয়া, আখিরের চাওয়া এখনও বাকি আচে। কিন্তু সিটা ঠিক্ কোন্ পেকারের চাওয়া, সিটার কথা হোসেন আন্দাজই করতি পারে শুধু ; বুজতি পারে না।

বাঘের গোঁফ আর চর্বি হাতি-হাতিই লোপাট হইয়ে গেচে। কলিমুদ্দি নেচে বাঘের বুকের হাড়। নিজের বুকে মাতুলী কইর‍্যে পইড়্যে থাকবে সি আজীবন, মানে, জীবন ইকানে যদ্দিন থাকে। তালে নাকি বাঘ কুনো ক্ষেতি করতি পারবে না।

বাঘের চর্বিতে বাত সারে তাই বুড়োরা কাড়াকাড়ি করে নেচে চর্বি। গোঁফহীন বাঘের মুখটাকে কেমন চোর-চোর দেকাচ্চেন্স। কারণ মৃত্যু তো এমনিতেই যথেষ্ট দুঃখের। এমন এক জানোয়ারের পক্কে কিন্তু গোঁফগুলোন লোপাট হইয়া যাওয়ায় সেই দুঃকে অপমানও নেইগেচে।

অন্ধকার রাত। ঘোর অন্ধকার। অগুনতি তারা জলের উপরে তাদিগের মুক দেকতিচে। সামান্য হাওয়া বইতিচে একটো। তাইতে ভরা জোয়ারের জলের উপর তারাদের নীল-সবুজ ছায়া কাঁইপ্যে কাঁইপ্যে উটতিচে। গোসাপের শব্দ হতিচে আজ রাতেও। ফটা-ফট ফটা-ফট। কে জানে! ইটা কি, যে সাপটাকি কাল বাঘে ধইর‍্যে খেইল তারই জোড়াটা ?

হরিণ ডাকতিচে মাঝেমদ্দি। কিন্তু আর কোনোই আওয়াজ লাই। খালের উইপারে একজোড়া হট্টিটি পাকি হট্টি টি-হুট্ হট্টিটি-হুট্ করি লাপায়ে লাপায়ে ডাকতিচে। কে জানে, কী দেইকেচে তারা!

জলির তলার মদ্দি অনাদিকাল থেকি, এই আদর্শ ভয়ংকর বনের মদ্দি, যুগ যুগ ধইর‍্যে শিষখালে শিষখালে পুঁইত্যে রাখা মলিন হইয়ে যাওয়া, ছিঁইড়্যে-যাওয়া, অগণ্য ঝামটির পত্‌পতানির মদ্দি এই সুন্‌সান রাতে দীর্ঘশ্বাস ফিস্‌ফিস্ করে। কত শত এরফানের, কত শত

এরফানের অল্পবয়সী বিবির, তাদের বাল-বাচ্চার, তাদের বিধবা আম্মীদের দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়ে আচে এই অমাবস্যার অন্ধকারে। কে জানে তা!

অন্ধকারে ধানীঘাসের বনের মদ্দি হরিণের দল এইস্থি দাঁড়ায়। হাওয়ায় সে বনে আলোড়ন ওট্যে। হরিণের দল বুজ্জি বাঘের গন্দ পেইয়ে শিষখালের মদ্দি কুমীর-কামটে তাড়া-করা পার্শে মাছের ঝাঁকেরই মতো ছিনিমিনি হইয়ে টুকরো হইয়ে ভেঙ্গি যেতি যেতি দলছুট হতিচে।

হাঃ হাঃ হাঃ কইরে বনের মদ্দি যেন কে হেইস্যে উইট্যেই থেমি যেতিচে পরক্ষণেই। রাজা প্রতাপাদিত্যর কুনো পর্তুগীজ জলদস্যুর প্রেতাত্মা?

ইসব এরফানই তারে বইলেচিল।

এও বইলেচে যে, মাঝে মাঝে মেয়েচেলের পেচণ্ড ভয়-পাওয়া চিৎকার ভেইস্যে আইস্যে রাতের নিস্তব্ধতা খান-খান করি দেয়। তখন কুনো কুনো মাঝি, পাশ ফিইর্যি শুয়ি, টোঙের মদ্দি চক্ষু মুইধ্যে বনবিবির মইন্ত্র পড়তি থাইকবে ঘুমেরই মদ্দি।

একন জোয়ারের সময়। কলরোলে জল চলতিচে নিজের সঙ্গি নিজে কতা ক'তি ক'তি। কুলকুল শব্দ হতিচে নৌকোর খোলে। মাঝিদের ওই ঘুম-পাড়ানী গান। আবার ভাঁটির সময়ে সরসর খড়খড় কইর্যে কাঠ-কুটো পাতা-পুতো-ফুল, ডিঙ্গির খোলে ঘষটানি দেতি দেতি সমুদ্দুরের দিকে ভেইসি যেতি ধইরবে।

তকন আবার অইন্য গান।

রাতে আজ রান্না কইরেচেল সারেং মিঞাই। মসুর ডালের খিচুড়ি আর আলু ভাজা। সঙ্গে কাঁচা প্যাঁজ আর শুকনো লঙ্কা ভাজাও চেল। বড় ভাল খেছিলো হোসেন। সারেং-এর রান্নার হাতই আলাদা।

খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য সব ডিঙ্গিতে এখনও পুটুর-পাটুর কতা চালাচালি হতিচে আর সেই মদনপুরের চিংড়ি-ছোঁড়া তার সেই মাউথ-অর্গ্যান না কী যেন আজও জোরে এবং বেসুরে বাজাতিচে। কেউ আজ তারে মানা করে নাই। আজ সকলের মনিই আনন্দ। এই

বাঘটা যদি সেই বাঘ হয়, তবে বেশ কিছুদিনের জন্যি হয়ত নিশ্চিন্তি।

তবে বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষেরা কতিছে, আনন্দ আর কদিনের! ফরেস্টডিপার্ট যাই বলুক না কেন, সোঁদরবনের সব বাঘই মানুষখেকো!

একটা ছোট্ট ঘুম দে উইট্যে পইড়েচে সারেং মিঞা। ঘুটুঘুট্যে অন্ধকারের মদ্দি তারার চাঁদোয়ার নীচে বসি তামাক খেতিচে। খাম্বীরা তামাক শেষ হইয়ে গেচে। এখন সি তার নিজের তামাকই খেতিচে।

টিকের আগুনটা টেমির আগুনেরই মত অন্ধকারে কুমীরের চোকেরই মত লালচে দেকাতিচে।

ডুবার গলাটা খাঁকড়ে নে' সারেং মিঞা বইললো, কা কইরবি তুই হোসেন? কী ঠিক করলি?

কিসের কি?

কেমন লাগতিচে তোর এই জীবন? এই লোকজন? অনেক-গুলোন দিন ত কাটায়ে দেলি দেখতি দেখতি। এবার আমারও যাবার সময় হইয়ে এল। আমার সঙ্গি যাবার টাইম তোর হয়নি একোনো। হলি, আমি নিজেই এইসি তোরে নে' যাব।

সঙ্গি নে যাবে বলি ঘর ছেইড়্যে এনু আর একন বলতিচ, নে যাবেনি। বাঃ। তা কেন! আমাকে নে চল। তুমি কুন দিকে যেতিছ চাচা? কিসের খোঁজি যেতিচ?

হোসেন বলল।

আগে ত কতবারই বইলেচি। আমি নিজের দিকে যেতেচি। বাইরে থেকি ভিতরপানে। অন্ধকার থেকি আলোয়।

কি খুঁইজতে যেতিচো তুমি চাচা?

আমি আমাকেই খুঁজতে যেইতেচি।

আবারও সেই হেঁয়ালি তোমার?

জীবনটাই হেঁয়ালি রে হোসেন। সত্যিই বলতিচি। বড় নদীর উপরে ভোরের কুয়াশার মতন জীবন। চেনা যায় না কিছুই। দেকা যায় না। সাদা রঙ নীল হইয়ে যায় আর নীল সবুজ। সব জানা জিনিসই অজানা হইয়ে যায়, চেনা জিনিস অচেনা।

জীবনও এক হেঁয়ালি।

তুমি কি পাইরবে একা একা ওই কুয়াশা কাটাতি? এই হেঁয়ালির শেষ দেকতি?

আমি নিজেই ত হেঁয়ালি রে। হেঁয়ালি দিয়েই হেঁয়ালি কাটতি পাইরব হয়ত ইকদিন। কে বলতি পারে? ইনশাল্লা!

তুমার মাথাতি কোনো গোলমাল হয়নি ত চাচা? ওই এতো মনুষ্যি আছে, সকলিই তো যে যার কাজ নে' ইকানি এসিচে, তা তুমি একা একা অদ্ভুত একষেঁড়ে।

আমি যে সকলের মতো লই হোসেন মিঞা: আমি যে আমারই মত। যাদেরই করার মতন কিছু থাকে এ জীবনে তারা সকলেই যে একাই! ওই একা হয়ি যাওয়াটাই আল্লার অভিশাপ, আবার ইটাই আশীর্বাদ।

তালে তুমি বরং ভাল কইর্যে ঘুইম্যে লাও কটা দিন। আমিই রেঁইধ্যে-বেইড়ে তুমাকে খাওয়াব, পা টিপি দেব। তামাক সেজি দেব। তুমি ঘুমোও। দিন-পর-দিন কেবলই ঘুইম্যে থাকো। কোনো রাতেই ত তুমি ভাল করি ঘুমোও না। এত কম ঘুমালি কি চলে চাচা?

কুনো মনুষ্যিরই বেশি ঘুমুনোটা উচিত কম্ম লয় রে বাজান। এতো ঘুমই যদি ঘুমুতে হবেক তো মনুষ্যি হইয়ে জন্মানো কেন?

তাইলে চলো ফিইর্যে তোমাকে গোসাবার হাসপাতালে ভর্তি কইর্যে দি।

তাতে কি হবে? হাসপাতালে?

তোমার মাতাটা এট্টু বিশ্রাম পেইয়ে যাবে। এই যি সারাটা ক্ষণটা তুমি ভাবতিচো, আর ভাবতিচো, উলটো-পুলটো সিদ্ধান্ত নিয়িচো, এমন করলি ত পাগলই হই যেবে তুমি।

সারেং মিঞা তামাক খেতি খেতি হাসলো।

সিটা তামাকেরই ভুরুৎ না হাসির ভুরুৎ তা স্পষ্ট বোঝা গেল নি।

তারপর বলল, জনাব, মনুষ্যি হইয়ে জন্মানো মানেই পাগল হইয়েই জন্মানো। তুমি ভাইবতেচে, হাসপাতালের শয্যাতি শুয়ে থাকলিই

ভাবনাচিন্তা সব সইঙ্গে-সইঙ্গেই থেইম্যি যাবে? মনুষ্যির মগজ হতিচে কারখানার ফারনেসের মতন। যেই একবার পরিণত হইয়ে উটলো, অমনি আগুন জ্বলতি শুরু কইরল তার মস্তিষ্কে। একদিনের জন্যি, একঘণ্টার জন্যিও সি আগুন নিবোনো যাবে না কুনোমতেই। সি আগুন যেদিন নিবলো ত মনুষ্যিও চোখ মুইদল। মনুষ্যি হইয়ে এই তুনিয়ায় আইসবে আর চিন্তা-ভাবনার হাত থেকি বেঁইচে যাবে সিটা কি কুনো কথা হল বাজান?

হোসেন বলল, চাচা, এই মনুষ্যিগুলোনের তুঃক দেইক্যে, ইদের সাহস দেকে আমারও খুব ইচ্ছে হতিচে যে, আমি এদেরই একজন হইয়ে যাই। উদের তুঃকের বোঝ ওটাই।

বাঃ বাঃ। ইতো ফাসকিলাস কতা। তবে ই কতাটাও মনি রেইক্যো যে এদির শুধু তুঃকই নেই, আনন্দও কিচু আচে। আর সি কারণেই এরা মানুষ হিসেবে এত বড়। কারু কাচে না কেইন্দে নিজেদের তুঃক্কুর বোঝ যে নিজেরাই উইট্যে আইসতিচে যুগ যুগ ধইর্যে এইটেই ইদের মনুষ্যত্বর সবচেয়ে বড় দিক হোসেন। এই তুঃকের মদ্দি মস্ত গর্ব রইয়েচে; মস্ত সুখও। লইলে এতদিন ধইর্যে এত তুঃক ওরা বইতি পারতো!

আমার কেবলই ইচ্চে করতিচে, কালকের ঘটনার পর, মানে, এরফানের ইন্তেকালের পরই যে, আমিও খুব সাহসের কাজ করি এট্টা তুমারই মত চাচা। তুমি যেমন করি বাঘটারে মাইরলে, সারা সোঁদরবনের জেলে-মউলে-বাউলেরা যে জন্যি আজ তুমার নামে জয়ধ্বনি দিতিচে তার চেয়েও বেশি কুনো সাহসের কাজ কইর্যে দেকিয়ে দি সক্কলকে যে, আম্মো পারি। সবাই যেন বলে। সারেং মিঞার সাঙাতও ফালতু লয় হে!

উস্তাদকা চেলা
সিপাহিকো ঘোড়া
কুচ নেহিতো
থোড়া থোড়া।

এই কথা শুনি হঠাৎ সারেং মিঞা তামাক খাওয়া বন্দ রেইকে বইলল, আমি যে কাজ কইরলাম সিটা কুনো সাহসের কাজই লয়। সোঁদরবনে একশ বাউলে, আচে, যারা এমন বাঘ আকছার মেইর্যে আসতিচে। তুমি যদি আমার ঠেঙ্গেও বড় সাহসের কাজ কইরতি চাও তো তুমাকে এট্টা কাজের কতা বলি। কিন্তু তোমার সাহস কি হবেক ?

একবার বইল্যেই দেকো না!

হোসেন বলল।

তুমি কলিমুদ্দি মিঞার দলে ঢুইক্যে এরফানের জাগাটা লও।

হোসেন একটুখানি ভাবল। তারপর বলল, তাপ্পর ?

তাপ্পর ওদের বহরের সঙ্গে এরফান-এর গাঁয়েই ফিইর্যি যাও।

আরও একটু ভেবে নিয়ে হোসেন আবার বলল, তাপ্পর ?

তাপ্পর এরফানের বিবিরে নিকাহ্ করো। সঙ্গে সঙ্গেই লয়। এরফানের শোক বিচারিকে ভুইল্যে যেতি দিতে হবেক। তবে গরীবের শোক করার ওয়াক্ত লাই। তাছাড়া, আল্লাই শোক দেন, আল্লাই ভুলিয়ে দেন। এরফানের বুনের শাদী দাও। তারপর এরফানের বিবিরে তুমার বিবি কইরে নে তার বাচ্চা দুটোরে আব্বার দুলহার-পেয়ার দাও। তার বিবিরে মরদের-পেয়ার দাও। খুদাতাল্লার দোয়ায় তার আর তুমারও বাচ্চা হোক একটো দুটো।

আমার মা, আমার বাবা, আমার বন দাদা ভায়েরা ?

· হোসেন উদ্বিগ্ন হয়ে বইলল।

খুদাহ্‌র দুনিয়াতে সকলেই সকলের ভাই বুন হোসেন। এই রিস্তাই হতিচে আসল রিস্তা। বিধবা-পল্লীর বিধবারা যে চিরটাকাল বেওয়াই থেক্যি যাবে যুগ-যুগান্ত ধরি, ই ভাবনাটাই আমাকে বড়ই দুক্কু দেয়। তুমি যদি ই কাজটা কইর্যে দেকাতি পারো তবে ই মনুষ্যিগুলোনের সবচি বড় উপগার হতি পারে। তুমি পথ যদি ইকবার দেইক্যে দেতি পারো, তবে এরফানের মত হাজার জওয়ান মইরবার সময়ে বড় সুখে মইরতি পারবেক।

তারপরে একটু চুপ করে থেকি বললো, শোনো হোসেন! আমি কলিমুদ্দির ঠেঙ্গে সব খপর নেচি। এরফান আর তোর বয়স প্রায় একই। এরফান-এর বিবির নাম ফতিমা। ভারী সুন্দরী কন্যে! শাস্ত স্বভাবের। ঘর-গৃহস্তির কাজেও খুবই ভাল। সি তুমারে অনেক পেয়ার দিবে। তারে তুমি এই সাহায্যটুকু যদি দেতি পারো ত জাইনবে একশটা মানুষখেকো বাঘ মারার সমান হইবে সি কাজ।

একটু থেমি বলল সারেং মিঞা, তুমি কি মনে কইরলে বাঘটা আমি ব্যারিস্টার সায়েবের খয়রাতি-করা বিলিতি বন্দুক দে মেইরেচি বইলেই আমি বেশি সাহসী? যে মনুষ্যিরা খালি-হাতে, খালি-গায়ে দিনে-রাতে এমন গোণা-গুণতিহীন বাঘের মোকাবিলা রোজ করতিচে কাঠ কাইটতে যেইয়ে, মধু পাড়তি যেইয়ে, মাছ ধরতি যেইয়ে, তাদের সাহস আমার চেয়ে কিছু কম? ভুল। মইস্তো বড় ভুল।

সারেং মিঞা হঠাৎ চুপ কইর্যে গেল।

হোসেনও চুপ কইর্যে ভাবতেচেল।

সারেং আবার বলল, এই দেশে যারা বরফ-ঢাকা পাহাড়ে উটতিচে, যারা ফুটবল খেলার মাঠে গোল দিতেচে, যারা যুদ্ধে দুশমনকে ঢিট করতিচে শুধু তাদেরই ফোটোক ছাপা হয় আখবরে। দেশ সুদ্ধু লোকে 'আহা! আহা!' করে শুধু তাদেরই মালা পরায়। আর যে হারামজাদা নেতাগুলোন পেতিদিন মিথ্যের বেসাতি কইর্যে, লোক ঠকায়ে, নিজেদের পকেট ভারী কইরতেচে, তাদের ছবি নাকি রোজই দেকানো হয় টি. ভি. তে; রেডিওতে। সেই কামিনাদেরই গলার আওয়াজ মানুষ-খেকো বাঘের আওয়াজেরই মতো গম্‌গম্‌ করে। ফরেস্ট-ডিপার্টের আমলাদের ফোটোকও ছাপা হয়। যারা ই-মনুষ্যিদের কাছ থেকি চিরদিন ভয় দেখায়ে মাছ, মধু, কচ্ছপের ডিম, হরিণের মাংস, কেইড়্যে খেয়ি এল তাদেরই বড়সায়েবেরা ইঞ্জিরিতে সোঁদরবনের উপরে তাবড়-তাবড় বক্তিমে লেকেন বইল্যেও শুইনতি পাই। আর যে মনুষ্যিরা খালি গায়ে, ধুতি-লুঙি কোমরে জড়ায়ে কাঁধে একখান গামছা ফেইল্যে নে, শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতি পাবে

এই পেত্যাশাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বচরের পর বচর নিজেদের জীবন পেতিমুহূর্তে তুচ্ছ কইর‍্যে এই সোঁদরবনের গভীরে পেরান দিতিচে তাদের কথা কেউই বলে না, নেকে ত নাই। হয়ত জানেও না।

তারা তো বীর লয়! তুই তাদেরই একজন হইয়ে উঠতি পারলি তো জানলি জিন্দগীতে হওয়ার মতো কিছু এট্টা হলি। ইনসানিয়াৎ এর চেয়ে বড় কিসিম্ আর কী থাকতি পারে। সহজ-সুখী জীবনে সুখ থাকতি পারে কিন্তু সেই ভাতে হিম্মৎ-এর গন্ধ লাই হে বাজান। ঘামের গন্ধ অধিকাংশ ভাতেই কম-বেশি থেকেই যায় হয়ত কিন্তু রক্তের গন্ধ সব ভাতে থাকে না। তা খুব কম ভাতেই থাকে।

হোসেন চুপ করে রইলো।

সারেং মিঞা বললো, যে গেরামে সি জইন্ম নিলো, যে ঘরে সে বড় হইয়ে উটলো, যে আব্বা-আম্মীর কোলে সে তুলহার-পেযার পেইল্যে, সি ত তার বিনা-চিষ্টাতেই পাওয়া। রাজা প্রতাপাদিত্য, মগ, পর্তুগীজ, ইংরেজ, এরা যে সোঁদরবনে রাজত্ব কইর‍্যে গেইলেন তা কি নিজের বাড়ির বাকুলে বইস্যে কইরলেন? না, নিজের মাগ-এর কোলে শুয়ে? যে মর্দ, সারা তুনিয়াই তার খেলার মাঠ। তুনিয়ার সব ফসলে তার অধিকার; তুনিয়ার সব আওরৎ-এর উপরেই তার দাবী। তোর গেরামের ন্যাকা-খোকা না হইয়ে থেকি মরদের বাচ্চা হইয়ে ইদের ইকজন হইয়ে যা হোসেন। যেমন হতি চেইতেছিস। খুদাহ্ তোরে দোয়া দিবেন। পরবরদিগারের দোয়াও থাইকবে তোর উপর।

তারপর একটু চুপ করে গিয়ে, তু-টান তামাক খেইয়ে নে আবার বলল, আজ চাচারে কতায় পেইয়েচে রে। ভাত তো সব মনুষ্যিই খায়, নিজের সংসার ত সব উজবুকেই চাইল্যে নেয়, যে মানুষ অন্য দশজনের বোঝাও উটোতে পারে সেই না ইনসান-এর মতো ইনসান! সেই তো খিদমদগার খুদাবন্দ-এর।

হোসেন তবুও চুপ কইর‍্যে রইলো।

সারেং বলল, কি হলো? ফয়সালা কি কইরলে তাই বলো।

থাইকবো। হোসেন বলল।

শব্দটা তার মুখ থেকি ছিটকে বেইরোল।

আয় বাজান। আমার কাছে আয়!

বলেই, হোসেনকে তার বুকে টেনে নিয়ে সারেং মিঞা তার চুল এলোমেলো করে দিয়ে, তারে পেয়াব কইর‍্যে দিল।

তারপর বইললো, কাল আমি কলিমুদ্দিকে সকালেই ডেইক্যে বইলব। তুইও যাবি ওর সঙ্গি বাঘ নে ফরেস্ট অফিসে হোসেন। খাঁচার-পাখিকে আমি দাঁড়ে বইস্যে নে' এতোদিন সইঙ্গে সইঙ্গে রেইক্যে দানা দেছিলাম। কাল থেকি তুই নিজের দাবীতেই বেঁইচে থাকবি। খাঁচার-পাকিকে বনের-পাকি কইর‍্যে দিলম আমি।

এরপর সারেং মিঞা নিভে যাওয়া হুঁকোটাকে নতুন কইর‍্যে ধরাযে নেল।

তামাকের হুরুৎ-ভুরুৎ শব্দের সঙ্গি সঙ্গি, হোসেনের মনি হল সারেং মিঞার গলা থেকি অন্য কারো স্বর যেন ভেইসি আসতিচে।

দু টান মেইর‍্যে সারেং বললো, তোরে একটা কুড়াল আর একটা শড়কি দে যাব আমি। শড়কিটার ডাণ্ডাটাকে ছোট কইর‍্যে নিতে হবেক। হাতের শড়কি ছুইড়্যে ফেইলবি না সোঁদরবনে কক্কনো, সেদিন যেমন কলিমুদ্দি কইরেচেল। শক্ত করি ধইরে থাকবি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বাঘ তোকেই নিতে আসুক, কী অন্যকেই, তার ঘাড়ের মদ্দি বা বুকের মদ্দি বা মুখের মদ্দি ফলাটারে পুরো ঢুইক্যে দেই সারা শরীলটার ওজন দে' তার উপর উইঠ্যে দাঁড়াবি। শড়কি পুরো ঢুইক্যে যাবার পর এক লাপে সে জাগা ছেইড়ে সইর‍্যে যাবি, কী, গাচে উট্যে যাবি। শড়কিতে-গাঁথা বাঘ নিজেই সইরে যাবে। তবে খুব সাবধানে নামবি গাছ থেকি। পেয়োজন হলি সারারাতও গাছে থেইক্যে যাবি।

হোসেন বলল, হুঁ।

লেঃ। টোঙির মদ্দি ঢুইক্যে শুইয়ে পড় এবার। আমার মস্ত চিন্তা গেল একটা। ওরা যে কত খুশি হবে, তা নিজেই দেইকবি।

॥ ১৩ ॥

পরদিন আলো ফোটার সঙ্গি সঙ্গি কলিমুদ্দিকে ডেইক্যে সারেং মিঞা খপরটা দিল।

হৈ-হৈ পইড়্যে গেল সব ডিঙ্গিতে। সব নৌকোয়। যি-সব ডিঙ্গি ও নৌকো বাঘ দেখতি আসতিচেল, তাদের কাচেও খপরটা পৌঁচে গেল। হোসেন যেন বাঘের চেয়িও বড় খপর, এমনই ভাব সকলের।

সবাই হোসেনের দিকে আঙুল তুইল্যে বইলতে লাইগলো, এই সেই!

কলিমুদ্দি তার নাম দে দিল নতুন—হোসে-ফান। তা নামের মানে কিচু হল্যো না হল্যো তা নে মাতা ঘামাতি যায় কে?

তারপর তারে কাইচে টেনে কানে কানে বইলল, কলিমুদ্দি, এরফানের বিবি ফতিমা এরফানের চেয়েও ঢের বেশি ফর্সা আর হুরীর মতই সুন্দরী। তুই আমার বহরের লতুন বেটা হইয়ে এলি। লতুল সৈন্য। লতুল লড়াই। খুদাহর দোয়ায় তোর ভালই হবেক। সব দিক দে খুশি হবি তুই। তবে সময়কে সময় দিতে হবে।

রেঞ্জ-অফিস থেকি ফিরতি-ফিরতি বিকেল শেষ হইয়্যে গেল। চেষ্টা কইরেচেল জোয়ারে যেয়ে ভাঁটিতে ফেরার, তবুও পতও তো কম লয়। ওরা নৌকো বা ডিঙ্গি নে যায়নি। আট-দাঁড়িতে বাওয়া ছিপ নৌকো নে গেচিল একখান। তবুও সারাদিন লেইগ্যে গেল। যেছিল অবশ্য আলো ফোটার পর-পরই।

রেঞ্জার সাহেব আরো আটটি টোটা দেচেন সারেং মিঞাকে। আর দেচেন কিছুটা "খাম্বীরা" তামাক। খবর পাঠানো হইয়েচে

কইলকেতায় যে, চামটার কুখ্যাত মানুষ-খেকোর ইন্তেকাল হইয়েচে।

মেঘ কইরে এইসেচে আজ। অসময়ের মেঘ। ঝামটি পোঁতা নেই এমন এক শিষ-খালের মুকে ওরা এবং আরও তিনচার বহুর রাতের মতো ডিঙ্গি বাঁধল। নৌকোগুলোন নোঙর করি ভাল করি টেইনে দেকে নিতে হয় বারবার কইরে, পাচে নোঙর জোয়ারে হেঁটি চইল্যে যায়। নোঙর করার পরেও অবশ্য পারের মোটা গাছের সঙ্গে দড়ি দে' বেঁধে রাখতি হয় নৌকো। "ডবল-সেফটি"। কলিমুদ্দি বলে।

আজ সারেং মিঞাকে রান্না করতি দেয়নি অন্যেরা। কাঁকড়ার ঝোল রেঁইধেছিল কলিমুদ্দিরা ঠেইসি লঙ্কা-প্যাজ-রসুন দে। খাওয়া হইয়ে গেলে সকলেই শোবার তাল করতিচে। কাল থেকি একটু নিশ্চিন্তে যার যার কাজে লাগতে পারবে আবার। আবার নতুন করি পূজো হবে বনবিবির, বাবা দক্ষিণ রায়েব ; বড়খাঁ গাজীর। কবুতর ছেইড়্যে দেবি বনে, মুরগী জবাই হবে। দেয়াসীরা আবার মন্ত্র পড়বে নতুন করে তাদের বিশ্বাসে ভর কইরে। কিন্তু সম্পূর্ণই নিজ নিজ নসীব আর খুদাহর দোয়ার উপর ভরসা কইর্যেই গরাণ ফুলের মধু খেইয়ে যেই মৌমাচি উড়বে অমনি আবারও কোঁচড় ভইরে ফরেস্ট ডিপার্টের আছাড়ি-পটকা নে মউলেরা বাঘের হাঁ-করা মুকের দিকে এইগ্যে যাবে। ভাতের স্বাদ বড় মিষ্টি। বিবির ডাগর চোখ আর দুটি ডাল-ভাতের পেত্যাশা, কচিকাচাগুলোনের রিনরিনে গলার স্বর কানে আর চোখে ভাসবে তখন ওদের। চিরন্তন পুরুষ মানুষের মতন তার বিবি-বাচ্চার ভালর জন্যে নিশ্চিত-মৃত্যু উপেক্ষা করে তারা পায়ে পায়ে আবার এগোবে মৌচাকের দিকে। আবারও যম তাদের পিছু নেবে।

কাঠুরেও আবার করাত বা কুড়ুল নিয়ে নামবে ডাঙ্গায়। তার বা তাদের করাত-চালানোর বা কুড়ুল-ফেলবার শব্দের তালে তালে ডোরাকাটা করাল-মৃত্যু পা ফেলে-ফেলে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে ওদের পেচন দিক দিয়ে চুপি-সাড়ে। যাতে, কাছে এইসি কোণাকুণি ঝাঁপিয়ে

পড়তি পারে ঘাড়ে।

জেলেরা, এরফান-এরই মতন, আবারও শিষখালে মাচ ধরবে। মাছরাঙা, হীরে-ছিটিয়ে দ্রুত-পাখায়, দ্রুত-বলা কতায় সকালের জলজ প্রকৃতিকে মুখর কইরে দেবে। নিস্তব্ধ দুপুরে আবারও জোয়ারি পাখি ডাকবে পুত্‌-পুত্‌-পুত্‌-পুত্‌ করে। কোমর-ঝোঁকানো উবু-হওয়া একজনকে পেলে বাঘ আবারও ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে।

ফরেস্ট-ডিপার্টের পিটেল বোট আসবে আবারও। ঋতুভেদে মধুটা, মাছটা, কাঁকড়াটা, কাছিমের-ডিমটা যা পাবে তাই নিয়ে যাবে। লোক-দেখানো ধমক-ধামক দেবে নিজেদের বিবেক এবং নিজেদের ক্ষমতার জানান দিয়ে। তারপর বিড়িটা, তামাকটাও নিয়ে পুট-পুট-পুট-পুট করে আওয়াজ করে সাদা পিটেল-বোটে করে জলে ঢেউ তুলে চলে যাবে আরও বহুযুগ ধরে এদেশীয় সরকারী কার্যকলাপের পরাকাষ্ঠা দেকিয়ে।

এমনি করেই কাটবে, একটি, একটি, একটি করে এদের সাংঘাতিক মৃত্যুর করাল ছায়ায় কালো-করা দিন। তবুও এরা হাসবে, গান গাইবে, বাঁশি-বাজাবে, স্বপ্ন দেখবে ভবিষ্যতের, তামাক খেতি খেতি: মিষ্টি ভাতের গন্ধে তাদের দু-নাক ভরি যাবে। তাদের গ্রামের রান্নাঘরে, হাঁড়িতে-ফোঁটা ভাতের মধ্যের এক-একটি ঘরের সুখছবি, অন্ধকার আকাশে তারার মতন ফুটে উঠবে বলিরেখাময় কপালের রোদে-জলে পোড়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মুখে। একটি একটি করে' কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার আকাশের তারার মতন।

স্বপ্নটাই জীবন না জীবনটাই স্বপ্ন মনে থাকবে না আর ওদের কারও।

সারেং মিঞা তামাক খাচ্চিল। তার "খাম্বীরা" তামাকের সুগন্দ অন্ধকার নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছিল জল আর ঐ জোয়ার-ভাঁটার বনের মিশ্র-গন্দের সঙ্গে। কুমীর শব্দ করছিল পাশ-খালে। বড় ভেটকি মাঝে মাঝে ঘাই মেরে জল চলকে গুবুৎ আওয়াজ করে অন্ধকার সুন্দরবনের রাতের অপার্থিব নিস্তব্ধতা মথিত করে দিচ্ছিল।

এরা সবাই ঘুমোলে, সারেং মিঞা ডিঙ্গি খুলে নে' পাইলে যাবে আজ। হোসেন তার জিনিসপত্র নে' খাওয়া-দাওয়ার আগেই কলিমুদ্দিদের বহরে গিয়ে উইটেচে! যোগেন দাস যে এসে এইকানেই ভিড়েচে এবং বাকি দিনগুলোন সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে একথা জেনে ভাল লাগচিল সারেং-এর। যোগেন নিজেও ভাল শিকারী এবং ওর কাছেও বে-পাশী বন্দুক আছে। তবে মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুক। একনলা। ইদিককার মানুষের বিশ্বাস একনলা বন্দুকেই ভাল নিরিখ হয়। শিকারী ও বন্দুক সারেং মিঞা অনেকই দেখেচে। সে জানে যে কতাটা ভুল।

পূবের আকাশে কালো মেঘ জমছে। এমন রাতেও সেই কালো আকাশের কোণে কালোতর মেঘকে বোঝা যাচ্চে। পূব-দিগন্তে তারারা মরে গেচে।

কিছুক্ষণ হল পিঠেম বাতাস ছেড়েচে একটা। ভালই হয়েছে সেই। হাওয়ায় ভর করি মাঝরাতের ভাঁটির টানে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবে সারেং মিঞা। ছোট-বালি, বড়-বালি, ভাঙ্গাডুনি, লোথিয়ান, মায়া দ্বীপ। আরও কত শর্ষে-দানার মত দ্বীপ আছে, বড় ম্যাপে সে সবের কোনো হিসেব থাকে না। কত মগ-দস্যুরা, পর্তুগীজ, ইংরেজ, দিশি রাজাদের বহর সিখানে নোঙর করেছে একদিন। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে এই সব দ্বীপে অত্যাচার করেছে তারা, পরে চালান দিয়েচে ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণের বন্দরে। পশ্চিম দেশে। কত ভাঙা দেউল আছে, প্রাসাদ, তোষাখানা, কুবেরের ধন; বড়-বড় কালকেউটে আর শঙ্খচূড়ের পাহারাতে। ভাঙা মসজিদ আছে, যেখানে খুদাহ্ থাকেন নিরিবিলিতে। খুদাহ্ অবশ্য সব জায়গাতেই থাকেন। এমন কোন জায়গা আছে দুনিয়াতে যেখানে খুদাহ্ থাকেন না? থাকেন সর্বত্রই। তবে তাঁকে দেখে নেওয়ার চোখ চাই।

নাঃ। অনেকই দিন গৃহী মানুষদের সঙ্গে,—বিবি-বাল-বাচ্চার অথবা বিবি-বাল-বাচ্চা একদিন হবে এই স্বপ্ন বুকে করে বেঁচে-থাকা; ফুটন্ত-মিষ্টি-ভাতের গন্ধের স্বপ্নে, মসুর-ডালে কাঁচালংকা-কালোজিরে ফোড়ন দেওয়ার গন্ধের স্বপ্নে, বিবির সোহাগের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থেকে দুর্জয়

সাহস আর দুর্মর স্বপ্ন-দেখা মানুষদের সঙ্গে কাটানো হল।

এবার সে যাবে। সারেং মিঞা যাবে এবার।

মস্ত একটা কুমীর আছে বড়বালির মোহানাতে। তার বয়স সারেং মিঞার বয়সের মতই হবে। তবে, তাকে যদি কোনো শিকারী গুলি করে না মারে অথবা কোনো দুর্দান্ত বাঘের সঙ্গে শিকার অথবা জলের দাবী নিয়ে বেঁধে-যাওয়া হটাৎ হটাৎ যুদ্ধে সে ফওত্ যদি না হয়ে যায় তবে সারেং মিঞার ইন্তেকাল-এর অনেক দিন পর অবধিও সে বেঁচে থাকবে। সেই কুমীরটার সঙ্গে অনেক কথা হয় সারেং মিঞার। মেঘ করে আসে যখন বৃষ্টির আগে আগে, সেই কুমীর যখন জলের ঠিক নীচে ভেসে ওঠে, তার কালো, দীর্ঘ শরীরের আভাস যখন জলের উপরে পড়া মেঘের কালো-ছায়ার সঙ্গে মিলে যায় তখন সারেং মিঞা তার সঙ্গে আবারও অনেক কথা বলবে।

কিন্তু কুমীর বা বাঘ বা বোকা বা শুধুই টাকা-চাওয়া সামাজিক মানুষদের, কীড়ে-মাকড়ের মত অগণ্য মানুষের "পালের গোদা" হতে চাওয়া মানুষের সঙ্গে কথা বেশি বলা যায় না। তাদের সমস্ত জীবনই একটি বৃত্তর মধ্যে আবদ্ধ। এক জ্বলন্ত আগুনের বৃত্তর মধ্যে ওদের সকলেরই বাস। মুক্তির উপায় নেই ওদের। শুদ্ধির উপায় নেই। বৃত্তের বাইরে বেরুবার উপায় নেই। হয়তো কোনো ইচ্ছাও নেই। কুমীর কিংবা বাঁদর কিংবা স্যালামাণ্ডার-মাছ এদের কারো সঙ্গেই বেশি কথা বলার নেই। কেমন আছো? ভালো আছি। কি খেলে? কি পরলে? কোন পুরস্কার পেলে? দিশি না বিদিশি? কী করে পুরস্কার পেলে তা শুধোনো যায় না কুমীর কিংবা পাঁকাল-মাছ কিংবা স্যালামাণ্ডার কিংবা মানুষকে।

যারা জানোয়ার নয়, তারা লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে। বাঘ ঘঁাক করে। কুমির শিঁ-শিঁ করে আওয়াজ করে, মাছ লেজের ঝাপটাতে জল চলকে দিয়ে পকাৎ আওয়াজ করে বলে যায়। কিন্তু লজ্জাহীন অথচ ন্যায্য মূল্যে না-কেনা দম্ভে, দাম্ভিক-মানুষ রেগে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, তার মানে? কী বলতি চাও হে তুমি সারেং মিঞা?

সারেং মিঞা কিছুই বলতি চায় না। বলেও না।

এদের সবাইকেই জলের নিস্তরঙ্গ আয়নায় তাদের মুখ দেখতি বলে। তাদের সৎ হতি বলে। খুদাহ্‌র কথা, আখরত্‌-এর দিনের কথা মনে রাখতি বলে আর বলে দোজখ্‌-এর দরজা দিয়ে যখন ঢুকবে, ঢোকার পরে যখন দেকবে দোজখ্‌-এর অন্দরী-বাহিরি সব দরজাই বন্ধ, তখন খুদাহ্‌র কথা মনে হবে তোমাদের। মনে হবে কুমীরের, বাঘের এবং মানুষের ত বটেই শুধুই নখে-দাঁতে পেট ভরানো ছাড়া, শুধুই ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়া বিবি-বাচ্চার খিদ্‌মদ্‌গারী করা ছাড়া, ফন্দি-ফিকির, চেষ্টা-চরিত্তির করে নিজেকে উচ্চাসনে বসানোর হীন-চেষ্টা ছাড়াও প্রত্যেকের জীবনে করবার মতো অনেকই জিনিস থাকে। মানুষদের ত বটেই।

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কোটি-কোটি মানুষ সোঁদরবনের ভাঁটি-দেওয়া কাদায় থিক-থিক-করা অগণ্য উভচর স্যালামাণ্ডারেরই মত থিক থিক করছে কিন্তু কেন তারা মানুষ হইয়ে এসেচেল, একানে মানুষের করণীয় কর্তব্য কি? এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের কারোই নেই। তারা, মানে কুমীর কী বাঘ নয়, সেই মানুষেরা প্রকৃতার্থেই "উভচর"। অতি স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও এখনও সততার বেলাভূমিতে তাদের বাস, অধিকাংশ সময়টুকুই অসততার ভাঁটি-দেওয়া পলিতে পাঁক-মাখা ঘিন্‌ঘিনে অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা।

না। ওদের কারো প্রতিই কোনোরকম রাগ বা ঘৃণা বা অন্য কোনো রকম অনুভূতিই নেই সারেং মিঞার। তবে হ্যাঁ, অনুকম্পা আছে। তারা জানে না। মানুষের জীবনের মানে। খুদাহ, যেন তাদের ক্ষমা করে দেন।

তামাক শেষ হলো। পিঠেম বাতাসও জোর হলো। পূর্বী মেঘ ভিনদিশি মেয়ের ভিনদেশী উড়াল চুলের গন্ধ বয়ে ভেসি আসচে।

পিঠেম হাওয়া আরও জোর হল। পাটাতনের উপরে লুঙিটা খুলে রেখে দিয়ে জলটুকু সাঁতরে যেয়ে গর্জন গাছে বাঁধা ডিঙ্গির রশিটা খুলে রাশি ধরেই সাঁতরে এল সারেং মিঞা ডিঙ্গিতে। নোনাজল ভেজা উলঙ্গ-শরীরে

পূর্বী-হাওয়া নরম-হাত বোলাতে লাগলো। এক দারুণ অনুভূতি হল সারেং মিঞার। পুরুষের জীবনের সব অভিজ্ঞতার শরিকই হয়েচেলো সে একসময়ে। সে জানে, নারীর পরশের সুখ। বিশেষ করে, উদোম-শরীরে উদোম-নারীর পরশের সুখ।

সারেং মিঞা হাসল, শব্দ না করে। পশ্চিমাকাশের তারারা জল থেকি উটে-আসা সেই নগ্ন-আদিম আদম-এর দিকে স্নিগ্ধ স্নেহময় চোখে চেয়ে রইল।

আর দেরী নয়। সারেং বলল, নিজেকে। আর দেরী নয়!

এই ভীড়ের, কিছুক্ষণ পরে-হওয়া ভোরের বাঁধন কাটিয়ে নিজের দিকে, ভেতরের দিকে নিজেকে খুঁজতে যাওয়া বড় কঠিন হে। পদে-পদে বাধা। এই সুনসান রাতে, সব মানুষ যখন ঘুমুচ্ছে, অভ্যাসের ঘুম, শরীরের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির-ঘুম, রতি-ক্লান্তির-ঘুম, অগ্নিবলয়ের মদ্দ্যি বড় সহজ-যুগের-ঘুম, তকনই ভেইসে পড়। পালিয়ে চল, সারেং। চলো। চলো। চলো। তুমি যে সারেং মিঞা।

নৌকো খুলে দিল সারেং মিঞা সমুদ্রের মোহানার দিকে।

এখন যেন মনে হচ্ছে সারেং-এর যে, বাগচি-বাবুর ব্যক্তিগত মোটর লঞ্চ 'লীলা'র উপরের কেবিনে লঞ্চের 'সুকান' ধরি বসে আছে। এঞ্জিনম্যান নটবর সেকেণ্ড গিয়ারে দিয়ে রেখেচে এঞ্জিন। বেশি শব্দ নাই। থাকলিও শব্দটা ঘোর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝড়ের শব্দর মধ্যে যেমন পাখির আর্তচিৎকার চাপা পড়ে যায়, তেমনই চাপা পড়ে গেছে। শুধু শব্দরই ভার নেই; নিস্তব্ধতারও আচে। সোঁদরবনে যাঁরা গেছেন, থেকেচেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাঁরাও জানেন এই কতা।

জলের উপরে তারাদের ছায়া পড়েছে। দুপাশের জঙ্গলের অন্ধকার ছায়ারা অন্ধকারতর হয়ে অন্ধকার জলের দুপাশে সার-সার প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমাকাশের জ্বলজ্বলে তারাটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। তার কি নাম, কে জানে? এই নামের অভিশাপ আরেক

অভিশাপ। মানুষ, পশু, পাখি, গাছ এমনকি তারা, সকলেই এই অভিশাপে অভিশপ্ত।

সারেং মিঞা ভেসে চলেচে অন্য এক দেশে। যেখানে কারোই নাম লাই, নামের মোহ লাই, নামের জন্যে কামড়া-কামড়ি, খেয়োখেযি লাই ; শুদ্ধতা, শুভবোধ, ন্যায়, ভব্যতা, চক্ষুলজ্জা সব যেকানে নামেব আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার মত্তহস্তীর পদদলনে পিষ্ট হয়ে গেচে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বন্ধুতা, ভালোবাসা, সেই দেশ সারেং মিঞার দেশ নয়।

পিঠেম-হাওয়াটা আবো জোব হল। পালটা তুলেই দিল এবারে সারেং মিঞা। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেই তর তর্ করে এগিয়ে চললো সারেং-এর ডিঙ্গি।

হালে শক্ত কবে হাত বেখে বসে রইল সারেং।

বাচ্চা-বাবুর কাছে সর্কবিগলি ঘাটে চাকবী করাব সময় শুক্লাজাব সঙ্গে পাটনাতে গিয়ে একটি সিনেমা দেকেচেল। সেই সিনেমার একটি গানের কথা মনে পড়ে গেল এই সময়ে। কেন, কে জানে।

"সজনবে ঝুট মত বোলো
খুদাকি পাস যানা হ্যায়,
না হাতি হ্যায় না ঘোডা হ্যায়
উঁহা তো পায়দলহি যানা
সজনবে ঝুট মত্ বোলো···

ভারী ভাল লেগেচিল গানটা।

আলো ফুটতে দেরী আছে এখনও অনেক। কিন্তু ফুটবে। অন্ধকারের আলোকে নইলে চলে না, আলোর অন্ধকার নইলেও। নতুন পৃথিবীর নতুন বিজ্ঞানীরা বড়-বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচেন। তাঁরা তাদের মায়ের, এই প্রকৃতির, এই পৃথিবীর শরীর মনের কোনো রহস্যকেই আর রহস্য রাখতে চায় না। এই মূর্খরা বড় বেশি জেনে ফেলেচে, বড বেশি জানতে চাইচে। আর যতই জানচে ততই তাদের স্পর্ধা আর গর্বর সব সীমাও ছাড়িয়ে যাচ্চে।

সারেং মিঞা অশিক্ষিত মাঝি। সে কী করে বোজাবে এদের যে

রহস্যই জীবন। স্বপ্নই জীবন। সবকিছুই 'জেনে ফেললি কোন্ অজানাকে জানার দুর্মর-আশা নিয়ে বাঁচবে তারা! ধীরে দোস্তরা; ধীরে। তোমাদের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার রাশ একটু হালকা যদি না করো তবে খুদাহ বদলা নেবেন তোমাদের উপরেই। দুনিয়ার মেয়াদ কমিয়ে দেবেন। নিজেদের মূর্খামির পাপে নিজেরাই চাপা পড়ে মরবে, ভেসে যাবে, ভূমিকম্পে, বন্যায়, পুড়ে মরবে খরায়; জমে যাবে শৈত্য-প্রবাহে। তোমরা ভেবেছোটা কি হে মিঞা? তোমরা কে বট হে! যারা নিজের মাকে ন্যাংটো করে তার শরীরের রহস্য জানতে চায়, তাদেব খুদাহ্ কখনও ক্ষমা করতে পারেন? তওবা। তওবা।

ডিঙ্গি ভেসে চলেছে। পেছন থেকে ভাঁটির জল তাড়া দিচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ করে। চলো মিঞা, চলো। পেচন থেকে পিঠেন বাতাস হাঁক দিচ্ছে, চলো মিঞা, চলো।

এরা সকলেই মিঞার চেনা জানা। এরাই বন্ধু। এই আকাশ, এই বাতাস, এই নদী, এই জল, এই বন-বনান্তর; দূরের-দিগন্তে-মেশা মোহানা, শান্ত, ভুধলি বালির চর, একলা পাখির স্বর; এই সব নিয়েই চলে যায় সারেং মিঞার। নিজেকে বুঝতে, নিজেকে জানতে, কেন এসেছিল এখানে, কেন মানুষ হয়ে এসেছিল, কোথায় তার আসলে যাবার ছিল। কোন ভুল-চড়াতে এসে ঠেকে গেছে এইসব জানতে এসেছে সে।

এবারে আর ফিরে যাবে না। শহর, বনের, কল-কারখানাব, সোঁদরবনের সব মানুষ যার যার পেটের ধান্দায়, সুখের ধান্দায়। আরো সুখ, আরো টাকার ধান্দায় নিজেদের আগুনের মধ্যে আধপোড়া করুক, সবজান্তা হোক।

তাদের কারোকেই প্রয়োজন নেই সারেং-এর।

॥ শেষ ॥